বিশ্বময় ইসলামের পুনর্জাগরণ

প্রথম খণ্ড

কাজী মুহাম্মদ নিজামুল হক

www.pathagar.com

বিশ্বময় ইসলামের পুনর্জাগরণ

(প্রথম খণ্ড)

কাজী মুহাম্মদ নিজামুল হক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
(পরিচালনায় বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট)
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৪২

১ম প্রকাশ

জিলকদ	১৪২৫
পৌষ	১৪১১
ডিসেম্বর	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
(পরিচালনায় বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট)
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BISHAWMOY ISLAMER PUNORJAGORON by Quazi Muhammad Nizamul Hoque. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 120.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমার কথা

সপ্তম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম এক অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে আরবের মরুভূমি থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় বিশ্বের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মযলুম মানবতা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য ভুলে গিয়ে তারা বিশ্বব্যাপী এক উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়ার অখণ্ড শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে বিবেচনা করতে থাকে। ফলে সারা দুনিয়ায় ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। উমাইয়া খেলাফত থেকে শুরু করে উসমানীয় খেলাফত পর্যন্ত মুসলমানদের এ রাজনৈতিক শক্তিকে তদানিন্তন শাসকবর্গ "খেলাফত" প্রতীকের আবরণে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়।

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বৃটিশদের উত্থান শুরু হয় এবং তারা অনুন্নত বিশ্বে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করে। এ সময় মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে পর্তুগীজ, ডাচ, বৃটিশ ও ফ্রান্সের প্রভাব বলয়ে অথবা তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড়ে আবদ্ধ হতে থাকে। এতে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ঐক্য ও সংহতির দেয়ালে মারাত্মক ফাটল সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় খেলাফত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং সর্বশেষ ১৯২৪ সালে মুসলিম বিশ্বের কুলাংগার কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক 'খেলাফত' উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী মুসলিম ঐক্যের প্রতীক চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে অনেক মুসলিম দেশ সংখ্যালঘু তথা অমুসলিম দেশে পরিণত হয়। এভাবেই বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা মুসলিম দেশ এবং অমুসলিম দেশের অধিবাসী হিসেবে ব্যাপকভাবে বিভাজিত হয়ে পড়ে।

ইতিহাসের একজন অনুসন্ধিৎসু ও উৎসাহী পাঠক হিসেবে মুসলমানদের এ উত্থান ও পতন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং মুসলমানদের অবস্থা জানার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ইসলামের ইতিহাসের সোনালী অতীত ও চলমান ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়িয়েছি বিগত প্রায় দু'যুগ ধরে। এ সময়ে মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহে ইসলাম ও মুসলমানদের যে চিত্র স্মৃতির ক্যানভাসে

www.pathagar.com

এসে ধরা দিয়েছে তারই অংশ বিশেষ পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে ১৯৭৯ সাল থেকেই জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাসমূহে লেখালেখি শুরু করি। ইতোমধ্যেই মুসলিম ও অমুসলিম দেশের উপর প্রায় একশটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্ত লেখার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা এবং ইসলাম প্রচার প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা ও এ ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর দৃষ্টি ভঙ্গি এবং অমুসলিম দেশসমূহের প্রতিকূল পরিবেশ ও নির্যাতিত মুসলমানদের করুণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

একজন প্রাজ্ঞ বুদ্ধিজীবী বলেছেন, "ইতিহাস কোনো কল্পকথা নয় বরং ইতিহাস হচ্ছে বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনার তথ্যভিত্তিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ। ইতিহাসের ভিত্তি তাই অতীতের বাস্তবতা। ইতিহাস অতীতের ঘটনাক্রমের পরম্পরার কার্যকারণ অনুসন্ধান পূর্বক অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ ঘটায়, বর্তমানকে অর্থপূর্ণ করে তোলে এবং আগামীর যথার্থ দিকনির্দেশনা দেয়।.... ইতিহাসবিদের প্রধান দায়িত্ব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার অনুসরণে সত্যকে উন্মোচিত ও প্রতিষ্ঠা করা। ... প্রকৃত ইতিহাস গবেষণা পরিচালিত হয় অনুসন্ধানের ত্রি-মাত্রিকতায়, যথা-(১) অনুসন্ধানী ঘটনা আদৌ ঘটেছিল কিনা তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে তা সঠিকভাবে নিরুপণ করা ; (২) ঘটনা কেন ঘটেছিল এবং কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে ঘটেছিল তার সামগ্রিক কার্যকারণ নিরুপণ করা এবং (৩) প্রতিটি ঘটনার স্বাতন্ত্রিক ও সমন্বিত মাত্রা, প্রভাব ও ভূমিকা নির্ণয় করা।" এ প্রেক্ষাপটেই বক্ষ্যমান নিবন্ধগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রকাশিত লেখাগুলোর সমন্বয়ে একটি ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশের কোনো ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না। কিন্তু ২০০২ সালের জানুয়ারী মাসেরই কোনো এক সময় হঠাৎ একটি পরিচিত কণ্ঠ আমার মোবাইল ফোনে বেজে উঠে। তিনি অনুরোধ করলেন প্রকাশিত লেখাগুলোর একটি পাণ্ডুলিপি তাঁর নিকট পাঠাতে। আমি তাঁকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানালাম যে, আমার মত কাঁচা হাতের লেখা নিয়ে একটি ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হোক এটা আমি চাই না। প্রত্যুত্তরে তিনি জানালেন যে, তিনি আমার লেখাগুলো পড়েছেন এবং তাঁর ভালো লেগেছে। তিনি আরো জানালেন প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো নিয়ে একটি বই প্রকাশ করা যেতে পারে। এরপর অনেক দিন গড়িয়ে গেল, পাণ্ডুলিপি পাঠানো হলো না। পুনরায় পাণ্ডুলিপি চেয়ে পর পর বেশ ক'বার তিনি টেলিফোন করেন।

www.pathagar.com

আমার এ পরম শ্রদ্ধাভাজন ও অগ্রজ প্রতিম প্রখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবী মুহ্তারাম মাওলানা এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার সাহেবের অনুরোধে একান্ত বাধ্য হয়েই পাণ্ডুলিপিটি তাঁর নিকট প্রেরণ করি। গত জুলাই '০২ মাসে তিনি জানালেন পাণ্ডুলিপিটি আধুনিক প্রকাশনীর রিভিউ কমিটি অনুমোদন করেছে। রিভিউ কমিটির অনুমোদনের পর বইটি দ্রুত ছাপানোর ব্যাপারে আমার অপর এক পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট-এর চেয়ারম্যান মুহ্তারাম মকবুল আহমদ সাহেব ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁদের দু'জনের একান্ত আগ্রহেই বইটি প্রকাশের মুখ দেখলো। এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। এ পাণ্ডুলিপিটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রুফ দেখে আমাকে সহযোগিতা করেছেন অনুজ প্রতিম আবুল কালাম আযাদ। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না। তার শ্রম আমার সাথে থেকে গেলো।

এ বইয়ে মুসলিম ও অমুসলিম দেশের উপর মোট ষাটটি প্রবন্ধ সংযোজিত হলো। ভবিষ্যতে মুসলিম দেশসমূহের উপর একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা আছে। পরবর্তী সংস্করণকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষে পাঠকদের যে কোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। বইটি প্রকাশের জন্য আধুনিক প্রকাশনীকে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

মুসলিম উম্মাহর গৌরবোজ্জল এ ইতিহাস পাঠে হেরার রাজ তোরণমুখী মিছিলের প্রত্যয়দীপ্ত সাহসী সাথীরা যদি সামনে চলার ক্ষেত্রে সামান্যতম প্রেরণা পায় তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আল্লাহ আমার এ শ্রমটুকু কবুল করুন এবং জান্নাতে এর বিনিময় দান করুন।

কাজী মুহাম্মদ নিজামুল হক

ঢাকা

০১ ডিসেম্বর, ২০০৪ ইং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী পিতা

ও

স্নেহময়ী মায়ের উদ্দেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. মক্কা আল-মুকাররমা ঃ রাসূল (স)-এর জন্মভূমি ---------- ১৫
২. মুসলিম স্পেন ঃ একটি হারানো স্বর্গের নাম ---------- ২৩
৩. ইস্টার্ন তুর্কীস্থান ঃ রক্তাক্ত মুসলিম জনপদ ---------- ৪০
৪. দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম ঃ গৌরবোজ্জল সোনালী অতীত ---------- ৬০
৫. শতাব্দীর শিকার ঃ বর্মী মুসলমান ---------- ৭১
৬. রুশ শাসনাধীনে তাতার মুসলমান ঃ একটি সমীক্ষা ---------- ৮৪
৭. পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার জন্য তাতার মুসলমানরা সংগ্রাম করছে ---------- ৯৫
৮. বুরুন্ডিতে ইসলাম ও মুসলমান ঃ একটি সমীক্ষা ---------- ৯৮
৯. মুজাম্বিকে ইসলাম ও মুসলমান ---------- ১১১
১০. ক্যারিবীয় অঞ্চলে ইসলাম ও মুসলমান ঃ
একটি সংক্ষিপ্ত চালচিত্র ---------- ১২২
১১ . ফ্রান্সে ইসলাম ও ইসলামী সংগঠনের ভূমিকা ---------- ১২৭
১২. বৃটেনে মুসলমান ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ---------- ১৩২
১৩. যুক্তরাজ্যে ইসলাম ঃ মসজিদ কাউন্সিলের ভূমিকা ---------- ১৪০
১৪. বৃটেনে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে ইসলামী সংগঠনগুলোর ভূমিকা ১৪৯
১৫. বৃটেনে ইসলাম ও মুসলমান ঃ শিক্ষা বিস্তারে তাদের ভূমিকা -- ১৬০
১৬. আল-হিজরা ইসলামিক স্কুল ঃ
বৃটেনে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের পথিকৃত ---------- ১৬৬
১৭. বৃটেনে ইসলাম ও মুসলমান ---------- ১৭১
১৮. জার্মানীতে ইসলাম ও মুসলমান ---------- ১৭৯
১৯. আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলমান ঃ
শিক্ষা বিস্তারে তাদের ভূমিকা ---------- ১৮৪
২০. ক্রিমিয়ান তাতার মুসলমান ঃ হারিয়ে যাওয়া
একটি জাতির ইতিকথা ---------- ১৯৫
২১. দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলন ---------- ২০৩
২২. পশ্চিম বঙ্গে মুসলমান ঃ অধিকার বঞ্চিত মানুষের কিছু কথা -- ২১৪
২৩. ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুসলমান ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ---------- ২২৮
২৪. ভারতীয় মুসলমানরা ধর্মীয় বিশ্বাস ও
আইডেন্টিটি সংরক্ষণের সংগ্রামে নিয়োজিত ---------- ২৩৮
২৫. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ
স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর অমর কীর্তি ---------- ২৫৩
২৬. কানাডায় ইসলাম ঃ সংক্ষিপ্ত চালচিত্র ---------- ২৫৯
২৭. হল্যান্ডে ইসলাম ও মুসলমান ---------- ২৬৩

www.pathagar.com

২৮. ভিয়েনায় ইসলাম ঃ ইসলামিক সেন্টারের ভূমিকা ---------- ২৬৭
২৯. নিউজিল্যান্ডে ইসলাম ও মুসলমান ঃ উৎসের সন্ধানে ---------- ২৭৪
৩০. আর্জেন্টিনায় ইসলাম ঃ শত বছরের চালচিত্র ---------- ২৮২
৩১. আইভরি কোস্টে ইসলাম ঃ কিছু কথা ---------- ২৮৭
৩২. গায়েনায় ইসলাম ঃ একটি সমীক্ষা ---------- ২৯১
৩৩. লাইবেরিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের চালচিত্র ---------- ২৯৪
৩৪. কেনিয়ায় ইসলাম ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভূমিকা ---------- ২৯৮
৩৫. মংগোলিয়ায় ইসলাম ঃ শত বছরের চালচিত্র ---------- ৩০৭
৩৬. মেসিডোনিয়ায় ইসলাম ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে
সেখানেও ষড়যন্ত্রের জাল ---------- ৩১২
৩৭. তানজানিয়ায় ইসলাম ঃ অতীত ও বর্তমান ---------- ৩১৭
৩৮. বেলিজে ইসলাম ঃ উৎসের সন্ধানে ---------- ৩২২
৩৯. ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ঃ অতীত ও বর্তমান ---------- ৩২৮
৪০. সুইজারল্যান্ডে ইসলাম ঃ অতীত ও বর্তমান ---------- ৩৩৪
৪১. বুলগেরিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান ---------- ৩৪০
৪২. হাবশা ঃ ইসলাম সমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্র ---------- ৩৪৩
৪৩. পোল্যান্ডে ইসলাম ঃ একটি সমীক্ষা ---------- ৩৪৯
৪৪. আলবেনিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা ---------- ৩৫৩
৪৫. কোরিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান ---------- ৩৬৭
৪৬. উগান্ডায় ইসলাম ঃ শত বছরের চালচিত্র ---------- ৩৭৫
৪৭. জার্মানীতে ইসলাম ঃ জ্যাকব দম্পতির ভূমিকা ---------- ৩৮৩
৪৮. জিবুতি ঃ হর্ন অব আফ্রিকা ---------- ৩৯১
৪৯. কসোভো ও মেটোহিয়ায় ইসলাম ঃ অতীত ও বর্তমান ---------- ৩৯৫
৫০. নাইজেরিয়ায় শরীয়া আইন ঃ
বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস ---------- ৩৯৯
৫১. বসনিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান ---------- ৪০৩
৫২. আজারবাইজানে ইসলাম ও মুসলমান ---------- ৪১১
৫৩. কাজাখস্তানে ইসলাম ও মুসলমান ---------- ৪১৫
৫৪. উজবেকিস্তানে ইসলাম ও মুসলমান ---------- ৪২০
৫৫. মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান ---------- ৪২৫
৫৬. কমোরো দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম ও মুসলমান ---------- ৪৩৫
৫৭. থাইল্যান্ডে ইসলাম ও মুসলমান ---------- ৪৪১
৫৮. অস্ট্রেলিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান ঃ
শিক্ষা বিস্তারে তাদের ভূমিকা ---------- ৪৫০
৫৯. সিঙ্গাপুরে ইসলাম ঃ জামেয়া সিঙ্গাপুরের ভূমিকা ---------- ৪৫২
৬০. এক নজরে মুসলিম বিশ্বের পরিসংখ্যানগত তথ্য ---------- ৪৫৮

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মক্কা আল-মুকাররমা ঃ রাসূল (স)-এর জন্মভূমি

মক্কা পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি। এ শহরটি পাহাড় ও পর্বতে ঘেরা। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, এ শহরটি পৃথবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গবেষকরা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বের সকল অঞ্চলের মানুষের কাছে এর দূরত্বের ব্যবধান সমান করতে চেয়েছেন। মক্কা নগরী ২১.৫০° অক্ষাংশে, ৪০° দ্রাঘিমা এবং সমুদ্রের স্তর থেকে ২৮০ মিটার উচুঁতে অবস্থান করছে। এর আবহাওয়া উষ্ণ। বছরের ৭ মাস প্রচণ্ড গরম এবং ৫ মাস শীত। গরমকালে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪৮° ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং শীতকালে ৩০° ডিগ্রীর কাছাকাছি অবস্থান করে।

মক্কা নগরী একটি পরিপূর্ণ মরুভূমি। পুকুর ও নদীনালার কোনো অস্তিত্ব এখানে নেই। যেদিকে চোখ যায় শুধু পাথর আর পাথর। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গাছ ও ঘাস দেখতে পাওয়া যায়। মাটি খুড়ে খুব সহজেই পানি পাওয়া যায়। মক্কার জমি খুবই উর্বর। বর্তমানে পানি সেঁচের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। মক্কা শরীফ বলতে কা'বা শরীফ যে জায়গায় অবস্থিত সে জায়গাসহ পুরো শহর "হুদুদে হারাম" বা হারাম এলাকার সীমান্তের ভেতরকার সকল এলাকাকে বুঝায়। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে "হুদুদে হারামের" বাইরেও মক্কা নগরীর সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ সম্প্রসারিত অংশও এখন মক্কা নগরীর অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের পরই মক্কা নগরী তার অতীত পরিচিতি পরিত্যাগ করে নতুন পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের চোখে ধরা পড়ে। ঐতিহাসিকদের মতে মক্কা একটি সুগন্ধী পথ ছিল। প্রাচ্যে উৎপাদিত সুগন্ধী দ্রব্যসামগ্রী এ পথ দিয়েই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আসত। বড় বড় বাণিজ্য পথের সংযোগ স্থলে মক্কা নগরীর অবস্থানের কারণে বহির্বিশ্বে এর মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। প্রাচীনকাল থেকে মক্কাবাসীগণ নিকটবর্তী রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্যিক কাফেলাকে নির্বিঘ্নে চলাচল করার অনুমতি প্রদান করে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। এর ফলে তারা নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা লাভ করে। ঐতিহাসিকরা এ চুক্তিকেই নিরাপত্তা চুক্তি বলে অভিহিত করেছে।

www.pathagar.com

মক্কার আদিবাসীদের আদিপুরুষ মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)। মক্কার কুরাইশরা নিজেদেরকে হযরত ইসমাইল (আ)-এর বংশধর বলে দাবী করতো। মক্কা এবং তার আশপাশে অনেকগুলো গোত্র বসবাস করতো। এর মধ্যে দশটি গোত্র প্রসিদ্ধ ছিল। এগুলো হলো ঃ

১. হাশিম গোত্র
২. উমাইয়া গোত্র
৩. নাওফাল গোত্র
৪. বুহরা গোত্র
৫. আসাদ গোত্র
৬. তায়ম গোত্র
৭. মাখযুম গোত্র
৮. আদী গোত্র
৯. জুমাহ্ গোত্র
১০. সাহম গোত্র।

উত্তর হিজাজের অধিবাসী কু'সায় নামক একজন দলনেতা শক্তি প্রয়োগ করে খুজাআ গোত্রের নিকট থেকে মক্কার কর্তৃত্ব লাভ করেন। মক্কায় বসবাসকারী প্রসিদ্ধ দশটি গোত্র থেকেই লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। যেসব গোত্র থেকে লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেসব গোত্রগুলো ইসলামের কারণেই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তায়ম গোত্র হযরত আবু বকরের কারণে এবং আদী গোত্র হযরত ওমর-এর কারণে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে। এ সময় মক্কায় কোনো সুষ্ঠু প্রশাসনিক নীতিমালা কার্যকর ছিল না। মৈত্রী চুক্তি, বাণিজ্যিক চুক্তি ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য নিম্নমানের একটি দফতর এ সময় কর্মরত ছিল। পরবর্তীকালে বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য একটি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। মদীনার কবি হাস্‌সান ইবনে সাবিত-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, এ সময় মক্কায় আমলাদের কয়েকটি পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু পদের সংখ্যা এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছুই জানা যায়নি। মক্কার অধিবাসীরা প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ছিলেন। তাই কেউ কেউ মক্কাকে "বণিক সাধারণতন্ত্র" বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মক্কার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি "পরামর্শ পরিষদ" গঠন করা হয়। গোত্র প্রধানদের সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠন করা হয়। এটি একটি

www.pathagar.com

নিয়মতান্ত্রিক সংস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কখনো কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে পরামর্শ পরিষদের অধিবেশন ডাকা হতো। কা'বা ঘরের অংগনে বা কা'বাঘর সংলগ্ন পারিবারিক বা গোত্রীয় মিলনায়তনে পরামর্শ পরিষদের অধিবেশন বসতো এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান পেশ করা হতো।

হিজরতের পূর্বে মক্কায় কোনো সামুদ্রিক বন্দর ছিল না। মাঝে মধ্যে কোনো বিদেশী জাহাজ মরুভূমির সৈকতে শু'আয়রা উপসাগরে নোঙর করতো। এখানেই এক সময় একটি বাইযানটাইন জাহাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের কাঠ দ্বারা কা'বাগৃহ পুনঃ নির্মাণ করা হয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে মক্কায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের উপর কাফেরদের অমানুষিক ও পৈশাচিক নির্যাতন শুরু হয়। এ নির্যাতনের মাত্রা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নওমুসলিমদের একটি দলকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে নির্দেশ দেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে যাঁরা প্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন তারা এ সমুদ্র বন্দরটি ব্যবহার করেন। এ সময় দুটি বিদেশী বাণিজ্যিক জাহাজ এ বন্দরে এসে ভিড়ে। মুসলমানরা এ দুটি জাহাজে করেই আবিসিনিয়ায় পাড়ি জমায়। হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলে জেদ্দা সামুদ্রিক বন্দরের মর্যাদা লাভ করে।

ইসলামের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কা নগরী। বর্তমানে ইসলাম এবং মক্কা দুটি শব্দ একাকার হয়ে গেছে। একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একের ভিতর দিয়ে অপরের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। মক্কা নগরীতে পবিত্র কা'বাঘর অবস্থিত। কা'বা মানে মুসলিম উম্মাহর কেবলা। এ কেবলামুখী হয়েই বিশ্বের একশত চল্লিশ কোটি মুসলমান নামায আদায় করে থাকে। কাজেই মক্কা মুসলমানদের জন্য পবিত্রতম স্থান। পবিত্র কালামে পাকে সূরা আল বাকারার ১২৬ আয়াতে মক্কাকে هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا "The city of safety" অর্থাৎ "শান্তি ও নিরাপত্তার শহর" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের কারণেই মক্কা নগরী এ মর্যাদা লাভ করেছে। এ পবিত্র নগরীতেই মানবতার প্রিয়তম বন্ধু একটি প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

পবিত্র মক্কা নগরীর পরিচয় কালামে মজীদে আল্লাহ পাক এভাবে তুলে ধরেন ঃ

"Makkah is the city of peace, the secured city, the city of clemency, the city of protection and the safe city."

অর্থাৎ "মক্কা শান্তির শহর, নিরাপত্তার শহর, অনুকম্পার শহর এবং সংরক্ষণ ও নিরাপদ শহর।"

ইসলাম পূর্ব যুগেও মক্কা একটি বিখ্যাত শহর ছিল। তিনটি প্রধান কারণে তখন মক্কা নগরী প্রসিদ্ধ ছিল। কারণগুলো হলো ঃ

১. হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা

২. ব্যবসা-বাণিজ্য ও

৩. কবিতা চর্চা

ইসলাম পূর্বযুগেও আরবরা মক্কা নগরীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে মক্কা নগরীর গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। মক্কা নগরীর গুরুত্ব বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো ঃ

১. মসজিদে হারাম মক্কায় অবস্থিত।

২. মসজিদে হারামে কা'বা ঘর অবস্থিত।

৩. রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

৪. আল্লাহ্ তাআলা মক্কা নগরীকে নিরাপদ, শান্তি এবং নিরাপত্তার শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. মুসলমানরা কা'বামুখী হয়ে নামায আদায় করেন যা মক্কা নগরীর মসজিদে হারামে অবস্থিত।

৬. হজ্জ ও ওমরাহ পালনের জন্য মুসলমানরা মক্কায় আগমন করে থাকেন।

কা'বাঘরের জন্য মক্কা নগরীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর প্রথম ঘর কা'বা শরীফ মক্কা নগরীতে প্রতিষ্ঠা করেন। কা'বাঘরকে আল্লাহ্ তাআলা মানবতার জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি এবং অনুসরণ যোগ্য করে গড়ে তুলেছেন।

কা'বাঘর তৈরী করে আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কা'বাঘরের খাদেম নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁকে এ ঘরের যত্ন নেয়া,

www.pathagar.com

সেবা করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং সর্বোপরি মূর্তিপূজা থেকে এ ঘরের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেন। যাঁকে কা'বা ঘরের খাদেম নিযুক্ত করা হয় তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হন। এ সম্মান আল্লাহ্ প্রদত্ত। খাদেমের দায়িত্ব হলো কা'বাঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, এর নিরাপত্তা বিধান করা এবং হজ্জের জন্য আগত ব্যক্তিদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করাও অবশ্য কর্তব্য। হযরত ইবরাহীম (আ) একজন খাদেম হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) সর্বদাই আল্লাহ্ তাআলার নিকট এ ঘরের শান্তি, নিরাপত্তা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রার্থনা করতেন। তিনি রাব্বুল আলামীনের নিকট এ প্রার্থনাও করতেন যে, রাব্বুল আলামীন যেন মক্কা নগরীকে সকল প্রকার সন্ত্রাসী কার্যক্রম, মূর্তিপূজা, শিরক ও অনৈতিকতা থেকে রক্ষা করে এ শহরকে ইবাদাত, আনুগত্য ও স্রষ্টার নিকট বাধ্য থাকার স্থানে পরিণত করেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে পাকে এভাবে তুলে ধরেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ ـ البقرة : ١٢٦

"আর যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ শহরকে আপনি নিরাপদ করুন এবং এর অধিবাসীদেরকে রিয্ক দান করুন ফলমূল দিয়ে, যারা তাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৬

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনার জবাবে রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○ ـ البقرة : ١٢٥

"একথাও স্মরণ কর, আমরা এ ঘরকে (কা'বাকে) জনগণের জন্য কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান রূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং

www.pathagar.com

লোকদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, ইবরাহীম যেখানে ইবাদাতের জন্য দাঁড়ায় সেই স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাযের জায়গা রূপে গ্রহণ কর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৫

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে পুনঃ নিশ্চয়তা দান করে বলেন যে ঃ

أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا ـ

"এটা কি সত্য নয় যে, আমরা এক শান্তিপূর্ণ হারামকে তাদের জন্য আবাসস্থল বানিয়ে দিয়েছি, যেখানে সবরকমের ফল-ফসল চলে আসে আমাদের পক্ষ হতে রিয্ক হিসেবে?"–সূরা আল কাসাস ঃ ৫৭

পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে মানুষ বাস করছে সমস্যা সংঘাত আর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে। কোথাও মানুষের জীবন ও সম্পদের স্বাভাবিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি নেই। সর্বত্রই মানুষকে বিভিন্নমুখী সমস্যা মুকাবেলা করেই বেঁচে থাকতে হচ্ছে। দুনিয়ায় মানুষের শান্তিতে বসবাস করার পূর্বশর্ত হলো জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। কিন্তু এ নিরাপত্তা কে দেবে? মানুষ মানুষের জীবন ও সম্পদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। পবিত্র মক্কা নগরীতে বসবাসকারী মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল করীমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ط ـ

"এরা কি দেখে না, আমরা একটি শান্তিপূর্ণ হেরেম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের চারদিকেও লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়?"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ৬৭

ইসলামপূর্ব যুগে মক্কা নগরীতে বসবাসকারী অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কা'বা ঘরের সম্মানার্থে তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করেন এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং দেখা গেল পবিত্র কা'বাঘরের উছিলায় রাব্বুল আলামীন আবহমানকাল থেকেই মক্কাবাসীর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করে আসছেন। মক্কা নগরীই পৃথিবীর একমাত্র জনপদ সেখানে মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা এবং ক্ষুধার্ত মানুষের আহারের ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকেই করা হয়েছে। সূরা ফীলে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন কিভাবে তিনি

www.pathagar.com

আবরাহার হস্তী বাহিনীর আক্রমণ থেকে কা'বাকে রক্ষা করেছেন। সূরা ফীল প্রমাণ করেছে যে, কা'বা এবং পবিত্র মক্কা নগরীর নিরাপত্তা বিধান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বরং আল্লাহ্ তাআলাই এর নিরাপত্তা বিধান করে থাকেন। সুতরাং যে জনপদের নিরাপত্তা বিধান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে করা হয় সে জনপদে বসবাসকারী মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাও আল্লাহ্ তাআলার উপরেই ন্যস্ত।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ পবিত্র মক্কা নগরীতে আগমন করে। এর একমাত্র কারণ আল্লাহর প্রতি মানুষের অগাধ ভালবাসা। এখানে কোনো মানুষ তার রাজনৈতিক দর্শন বা আদর্শ প্রচার করতে আসে না। শুধুমাত্র আল্লাহর প্রেমই মানুষকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পবিত্র মক্কা নগরীতে টেনে নিয়ে আসে। মক্কা নগরীতে আগমনকারী প্রতিটি মানুষ হৃদয়ের সবটুকু অনুভূতি আর উচ্ছাস মিশিয়ে ঘোষণা করে ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ۔

"হে আল্লাহ! আমি হাযির। আমি তোমার ডাকে হাযির। আমি তোমার দরবারে হাযির আছি, তোমার কোনো শরীক নেই। এটা সত্য যে, প্রশংসা ও শোকর পাবার অধিকারী তুমি। দান ও অনুগ্রহ করা তোমারই কাজ। তোমার প্রভুত্ব-কর্তৃত্বে কেউ শরীক নেই।"

মক্কা নগরীতে আগমনকারী প্রতিটি মানুষই তার আত্মমর্যাদা ও অহংবোধের কথা ভুলে যায়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সমকক্ষ বলে মনে করে এবং একে অপরের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। এভাবেই পবিত্র নগরীর আবহাওয়া আগত প্রতিটি মানুষকে সোনার মানুষে পরিণত করে। এ মানুষগুলো যখন স্বদেশে ফিরে যায় তখন সেখানকার কলুষিত পরিবেশ তাদেরকে আবার পূর্বাবস্থায় টেনে নিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আবার বিপথগামী হয়ে পড়ে। এভাবেই প্রতিটি জনপদ মক্কার আদলে গড়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আমরা আশা করবো পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে বসবাসকারী মুসলমানরা আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশ মতো চলবে এবং স্ব স্ব জনপদকে পবিত্র নগরী মক্কা আল-মুকাররমার মতো মানুষের জন্য কল্যাণকর জনপদে

www.pathagar.com

পরিণত করার লক্ষে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালাবে। আগামী দিনের প্রতিটি মুসলিম জনপদ পবিত্র নগরী মক্কা আল-মুকাররমার আদলে গড়ে উঠুক এবং মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক আজকের দিনে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র ঃ

১। দ্যা মুসলিম ওয়াল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা)।
জুলাই-আগস্ট, ১৯৯৬ ইং

২। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ঃ ১৯৮২

৩। মক্কা শরীফের ইতিকথা ঃ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

www.pathagar.com

মুসলিম স্পেন ঃ একটি হারানো স্বর্গের নাম

স্পেন সম্রাট রডারিক—একজন যালিম ও অত্যাচারী শাসক। যালিম রডারিকের নির্মম অত্যাচারে স্পেন মহাশশ্মানে পরিণত হতে চলছে। তার অত্যাচারে ক্ষীণপ্রাণ স্পেনবাসী কাতরে মরছে। আর এ কংকালসার মানুষের মরণ মিছিলের উপর দিয়ে চলছে অত্যাচারী রডারিকের বিজয় রথ। আর এ বিজয় রথের চাকায় পিষ্ট হচ্ছে সাধারণ প্রজাকুল। তাদের রক্তে লাল হচ্ছে স্পেনের পিচঢালা রাজপথ। প্রজাকুলের বুকের পাঁজর ভেঙে খান খান হচ্ছে রথের প্রতিটি চাকায়। চারদিকে শুধু আর্তনাদ আর হাহাকার। সারাদেশে নেমে আসছে অমানিশার গাঢ় অন্ধকার। নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতা মুক্তির প্রহর গুণছে। কিন্তু কিভাবে ? কোথা থেকে আসবে ত্রাণকর্তা ? সর্বত্র একই প্রশ্ন। এমনি এক মুহূর্তে বীর মুসলিম সেনাপতি মূসা ও তারিকের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী উত্তাল সমুদ্রের উত্তাল উর্মিমালার ন্যায় বাধা বন্ধনহীনভাবে ছুটে আসছে স্পেনের দিকে।

৭১১ খৃস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ শক্তি প্রয়োগ করে স্পেন দখল করে নেয়। অত্যাচারী সম্রাট রডারিক পরাজিত ও নিহত হয়। বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি মূসার নির্দেশে ঘোষণা করা হলো—স্পেনবাসী আজ স্বাধীন ও মুক্ত। এখানে প্রতিটি লোক বিজয়ী আরবদের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ঘোষিত হলো মানবতার বিজয় গান। থেমে গেল নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ আর হাহাকার। খতম হলো মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব। শুরু হলো খোদায়ী শাসন। এভাবেই স্পেনে মুসলিম শাসনের যাত্রা হলো শুরু।

ভূমধ্য সাগরের উত্তাল তরংগমালা পাড়ি দিয়ে সেনাপতি তারিকের জাহাজ এসে হিস্পানিয়ার তীরে ভিড়েছে। সেনাপতি তারিক সকল মুজাহিদ সৈনিকসহ তীরে নেমে পড়লেন। নির্দেশ দিলেন জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিতে। সকল জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্য সেনাপতি নির্দেশ দিলেন। সেনাপতির নির্দেশে যুদ্ধ জাহাজগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। জ্বলে ছাই হয়ে গেল যুদ্ধ জাহাজগুলো। মুসলিম সেনাবাহিনীর পেছনে উত্তাল সমুদ্র আর সামনে শত্রু বাহিনী। মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি। এ অবস্থায় সেনাপতি তারিক ঘোষণা করলেন, "বীর মুজাহিদ,

www.pathagar.com

নওজোয়ান ভাইসব ! তোমাদের পশ্চাতে উত্তাল সমুদ্রের উর্মিমালা এবং সম্মুখে রডারিকের সৈন্যবাহিনী। এ যেন একদিকে মনুষ্য শক্তির প্রবল পরাক্রম অন্যদিকে প্রকৃতি শক্তির অলংঘনীয় প্রতিরোধ। এখন তোমাদের পিছু হঠবার কোনো সুযোগ নেই। সামনে এগিয়ে যেতে হবে—দুর্বার অস্ত্রাঘাতে শত্রু সৈন্যের সকল প্রতিরোধ ব্যূহ ধুলায় মিশিয়ে স্পেনের মাটিতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে হবে।"

মহাবীর তারিকের এ হৃদয়গ্রাহী ঘোষণার পর মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী সমস্বরে ঘোষণা করলো, "আমীরুল জুনুদ ! আমরা ফিরে যাব না। আমরা এ রাজ্য দখল করে এখানে কালেমার পাতাকা উড্ডীন করবোই।" সমবেত কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনী সহকারে মুসলিম বাহিনী সামনের দিকে এগিয়ে চললো। সামনে একটি উঁচু পাহাড়। সেনাপতি তারিক পাহাড়ের নাম রাখলেন—জাবালুত্তারিক বা তারিকের পাহাড়। তিনি একজন সৈনিককে নির্দেশ দিলেন পাহাড়ের চূড়ায় ইসলামী পতাকা উড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়ার জন্য। সেনাপতি তারিকের নেতৃত্বে এভাবেই স্পেনের মাটিতে সর্বপ্রথম ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়।

স্পেনে মুসলিম শাসনের ফলে ব্যাপকভাবে ইসলামী ও আরবী সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়। ফলে স্পেনিশ সংস্কৃতি ইসলামী ও আরবীয় সংস্কৃতির দ্বারা ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে। স্পেনের যে অঞ্চলে স্পেনিশ সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতি দ্বারা ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সে অঞ্চলটি 'আন্দালুসিয়া' নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। স্পেনের আল হামরাহ রাজপ্রাসাদ ও কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় আজো মুসলিম ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। আল হামরা রাজপ্রাসাদ ও কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় আজো পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। গ্রানাডার মনোহর পরিবেশ, অপরূপ সৌন্দর্যরাজী ও বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য সেদিনের মতো আজো পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বিশ্বের একশত চল্লিশ কোটি মুসলমান আজো মুসলিম স্পেন, কর্ডোভা, গ্রানাডা ও আল হামরা রাজপ্রাসাদের জন্য গর্ববোধ করে। স্পেনে মুসলমানদের আগমনের ফলে স্পেন ইউরোপের মধ্যযুগীয় বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা পায় এবং স্পেনীয় সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতির সাথে একাকার হয়ে যায়। এভাবেই স্পেন মানব সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্পেনে ইসলামের আগমন এবং মানব সভ্যতার বিকাশের ফলে মধ্যযুগীয় রীতিনীতি, আচার আচরণ ও বিশ্বাস চিরদিনের জন্য অপসৃত হয়।

www.pathagar.com

স্পেনে মুসলিম শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো। ৭১১ খৃস্টাব্দ থেকে ১০৩৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আরব মুসলমানরা স্পেন শাসন করে। এ সুদীর্ঘ শাসনকালকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

প্রথমতঃ ঔপনিবেশিক শাসন (৭১১-৭৫৬)

এ সময়ে উমাইয়া শাসকরা দামেস্ক থেকে সরাসরি স্পেন শাসন করতেন। তাঁরা তিউনিসিয়ার ক্যারাওয়ান শহরে প্রশাসনিক অফিস বা সেন্টার চালু করে। সেখান থেকে স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসনের দৈনন্দিন কার্যাদি পরিচালনা করা হতো। ক্যারওয়ান শহর ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় আরবদের প্রথম রাজধানী। এ ঔপনিবেশিক শাসন মাত্র ১৪৫ বছর (৬১১-৭৫৬ খৃঃ) পর্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, রাসূলে করীম (স)-এর ওফাতের ৮০ বছর পর মুসলমানরা স্পেন জয় করে।

এ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বহু স্পেনবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। এ সমস্ত ধর্মান্তরিত মুসলমানদেরকে ডাচ ঐতিহাসিকরা 'রেনিগ্যাডস' বা স্বধর্মত্যাগী বলে অভিহিত করতো। উমাইয়া শাসকদের ঔপনিবেশিক শাসনামলে স্পেনকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়।

অঞ্চলগুলো হলো ঃ

(ক) জারাগোজা
(খ) মারসিয়া বা টুডসির
(গ) সেভেলী

সেভেলীতে কাউন্ট বা আর্ল পত্নী বসবাস করতো। আরবরা তাকে 'সারা আল কুতিয়া' নামে ডাকতো। একদিন সারা আল কুতিয়া একটি জাহাজ ভাড়া করে ছোট দুভাই সহ সেভেলী থেকে প্যালেস্টাইনের আসকালন শহরে এসে উপস্থিত হন। পরে তিনি দামেশক হয়ে সিরিয়া আগমন করেন। সিরিয়া এসে তিনি একজন আরব যুবককে বিয়ে করেন। কালক্রমে তার পরিবার বড় হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে আল কুতিয়া একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তার লেখা "কনকুয়েস্ট অব আন্দালুসিয়া" একটি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ।

৭৫০ খৃস্টাব্দে দামেশকে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটে এবং আব্বাসীয় শাসনের যাত্রা শুরু হয়। উমাইয়া শাসনের অবসানের কথা আন্দালুসিয়ায় পৌঁছতে ছয় বছর সময় লাগে। আমীর প্রথম আবদুর রহমান

www.pathagar.com

আন্দালুসিয়ায় আগমন করলে আন্দালুসিয়াবাসী নতুন শাসকদের কথা জানতে পারে। আমীর আব্দুর রহমান একজন প্রখ্যাত শাসক ছিলেন। তিনি ৭৫৬ সাল থেকে ৭৮৮ সাল পর্যন্ত আন্দালুসিয়া শাসন করেন।

উমাইয়া শাসন ও কর্ডোভা (৭৫৬-৯২৯)

প্রাথমিক ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর বিখ্যাত রাজকুমার আব্দুর রহমান কর্ডোভায় স্বাধীনভাবে শাসন কার্য পরিচালনা শুরু করেন। আবদুর রহমানের শাসনকার্য শুরুর পূর্বে ৭১১-৭৫৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া শাসকরা দামেশক থেকে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করতো। কিন্তু যুবরাজ প্রথম আবদুর রহমানের শাসনামলে কর্ডোভায় স্বাধীন শাসনকার্য শুরু হয়।

৭৮৮ সালে আব্বাসীয়রা উমাইয়া শাসকদের পরাজিত করে দামেশকের শাসনক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতায় এসেই তারা রাজধানী দামেস্ক থেকে বাগদাদ স্থানান্তর করে। নতুন শাসকরা তাদের ক্ষমতাকে নিষ্কন্টক করার জন্য উমাইয়া যুবরাজদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এ দুঃসংবাদ শুনার পর যুবরাজ আবদুর রহমান মরক্কো পালিয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি মরক্কো থেকে নৌ-পথে স্পেন পালিয়ে যান এবং সেখানে তিনি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। যুদ্ধ শেষে তিনি কর্ডোভায় নিজস্ব সরকার কায়েম করেন। তিনি ৩২ বছর কর্ডোভা শাসন করেন। তাঁর শাসনামলে সংযুক্ত স্পেন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে।

আবদুর রহমান ৭৮৮ সালে মারা যান। মৃত্যুর দু'বছর পূর্বে ৭৮৬ সালে তিনি কর্ডোভার ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মাণ করেন। কর্ডোভা আজো আবদুর রহমানের অমর কীর্তিসমূহ ধারণ করে আছে।

উমাইয়া শাসনামলে ইবনে উমর ছিলেন জারা গোজার শাসনকর্তা বা গভর্নর। তিনি ছিলেন প্রথম আবদুর রহমানের চাচাত ভাই। তিনি একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে প্রথম স্পেনে আগমন করেন।

৮৪৫ সালে প্যাগান ভিকিংস পর্তুগীজ এবং স্পেনীয় উপকূলে আক্রমণ করে। দ্বিতীয় আবদুর রহমান অত্যন্ত সফলতার সাথে এ আক্রমণ প্রতিহত করেন। পরাজিত সৈনিকদের একটি অংশ সেভেলীর নিম্নাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তারা সেখানে ডেয়ারী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে। এ সমস্ত ডেয়ারী ফার্ম থেকে প্রচুর দুধ ও মাখন উৎপাদন করা হতো। এ নর্সম্যান বা স্ক্যান্ডিনেভিয়াবাসীরা আরবী সাহিত্যে 'মাজুজ' বা ম্যাগী নামে সমধিক পরিচিত। তারা ছিল অগ্নিপূজক।

www.pathagar.com

উমাইয়া শাসনামলে স্পেনই ছিল ইউরোপের একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানরা প্রচুর রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এ রাজনৈতিক ক্ষমতাবলেই মুসলমানরা স্পেনীয় উপকূল অঞ্চলে শতাব্দীব্যাপী উপদ্রব সৃষ্টিকারী নর্সম্যানদের কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে স্পেনে পারস্য সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদ থেকে জিরয়াব নামক একজন পার্সিয়ান গায়কের স্পেনে আগমনের মধ্য দিয়ে স্পেনে পারস্য সংস্কৃতির প্রভাব শুরু হয়। এ প্রভাব সাংস্কৃতিক অংগন থেকে পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়। জিরয়াব ছিলেন খুব সৌন্দর্যপ্রিয়। তিনি বিভিন্নভাবে চুল কাটাতেন। ফলে তার চুলের কাটিং দেখে যুবকরা তার অনুসরণ করতে থাকে। ফলে পুরো কর্ডোভায় জিরয়াব স্টাইল নামে চুল কাটার একটি নতুন স্টাইল বা ফ্যাশন শুরু হয়। এ ক্ষুদ্র একটি ঘটনা প্রমাণ করে যে, স্পেনবাসী কিভাবে বাইরের সংস্কৃতিকে দ্রুত আত্মস্থ করতে সক্ষম ছিল।

ইবনে মুসাররা নামক একজন যুবক সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের জন্য স্পেন থেকে আরব গমন করেন এবং স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর স্পেনে ফিরে আসেন। স্পেনে ফিরে এসে তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তার স্কুলের নাম 'ইখওয়ান আস সাকা' যা বাগদাদ এবং বসরায় অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল। ৯২৯ সালে তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে কর্ডোভাকে উমাইয়া খেলাফতের অধীনে আনা হয় এবং কর্ডোভায় খেলাফত শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় তৃতীয় আবদুর রহমান 'নাসির বিল্লাহ' নাম ধারণ করে খেলাফত শাসন শুরু করেন। তিনি ৯১২ সাল থেকে ৯৫৬ সাল পর্যন্ত কর্ডোভা শাসন করেন। ৭৫৬ সাল থেকে ১০৩৯ সাল পর্যন্ত কর্ডোভা শহর পশ্চিম ইউরোপের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর হিসেবে পরিচিত ছিল যা আজকের লন্ডন ও প্যারিস শহরের সাথে তুলনীয়।

উমাইয়া খেলাফত অবসানের একশত বছর পর ১০৩০ বা ১০৩৯ সালে কর্ডোভা সিটি কাউন্সিল এক ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে যে, আরব স্পেনের রাজধানী গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হবে যা জাহওয়ারিড পরিবার কর্তৃক বিগত দু' পুরুষ যাবত শাসন করে আসছে। জাহওয়ারিড পরিবারের শাসন একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বলবত ছিল। এ সময় মুসলিম স্পেন শিল্প ও সাহিত্যে ব্যাপক উৎকর্ষতা লাভ করে। মুসলিম স্পেন তার কলোনী শাসনের অবসানে

www.pathagar.com

নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম স্পেনের এ নতুন পরিচিতি হলো 'আন্দালুসিয়া'। আন্দালুসিয়াকে পশ্চিম ইউরোপের কুইন বা রাণী নামে অভিহিত করা হয়।

মরক্কো ও তিউনিসিয়ার জনগণের স্মৃতিতে আন্দালুসিয়া আজো অমর হয়ে আছে। আন্দালুসিয়ায় আরব মুসলমানদের একক শাসনাবসানে খৃস্টান ও মুসলমানদের যৌথ শাসন শুরু হয়। এ শাসন ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

ক. পেটি কিংস শাসনামল।
খ. মুর রাজ বংশের শাসনামল।
গ. আন্দালুসিয়ার মহান চিন্তাবিদদের শাসনামল।

পেটি কিংসদের শাসনামল (১০৩০-১০৯২)

ইবেরিয়ান পেনিন সিউল্যা বা ইবেরিয়ান উপদ্বীপ অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত পেটি কিংসদের শাসনাধীন ছিল। এ উপদ্বীপটি নিজস্ব নেতাদের দ্বারা শাসিত হোক এটাই ছিল দ্বীপবাসীদের আকাঙ্ক্ষা। শাসকরা খৃস্টান কি মুসলমান এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল না। এ সমস্ত পেটি কিংসরা তাদের শাসনামলে টলেডো, ভেলেনসিয়া, সেভেলী, বান্দাজুজ, গ্রানাডা প্রভৃতি এলাকায় প্রাদেশিক শাসন কায়েম করে।

এ শাসনামলের প্রথমদিকে 'তাইকা' পিরিয়ডে প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিশৃংখলা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ সময়ে সাংস্কৃতিক অংগন ছিল খুবই গৌরবদীপ্ত। রোমান্টিক কবি ইবনে যায়দুন ও তার প্রিন্সেস ওয়ালাদা কর্ডোভায় এবং মুতামিদ ও তার কনর্সট বা স্ত্রী ইতামিদ এবং রোমেকিয়া সেভেলীতে এ সময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করে।

মুর রাজবংশের শাসনামল (১০৯২-১২২০) ঃ এ শাসনামলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শাসন কাল ১০৯২-১১৪৫ সাল পর্যন্ত। এ সময় মুরাবিটস শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন একজন ক্যাথলিক খৃস্টান। পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ তাকে স্পেনীয় ক্যাথলিক খৃস্টান বলেই অভিহিত করতো। মুরাবিটস নামের অর্থ হলো 'কুট্রেস' বা সুরক্ষিত দুর্গে বসবাসকারী ব্যক্তি। কুট্রেস বা সুরক্ষিত দুর্গগুলো পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল সীমান্ত এলাকায় নির্মাণ করা হয়। ১০৯২ সালে ইউসুফ ইবনে তাশফীন নামক একজন ক্যারিসম্যাটিক নেতার নেতৃত্বে পেটি কিংসরা স্পেনে আগমন করে। অবশ্য ইউসুফ ইবনে তাশফীন

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম ১০৮৬ সালে স্পেনে আগমন করেন। সেভেলীর সম্রাট মুতামিদকে 'ঝালাকা' যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য এ সময় তিনি স্পেন আগমন করেন। এ যুদ্ধে জয়লাভের পর পেটি কিংসরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তারা নিজেদেরকে ভালো মুসলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

সাংবিধানিকভাবে মুরাবিটস অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেন। কারণ তাদের আমীর বা প্রিন্স ইউসুফ ইবনে তাশফীন (১০৬৯-১১০৬) তাঁর সমসাময়িক প্রখ্যাত দার্শনিক আল-গাযালীর (১০৫৮-১১১১) সাথে পরামর্শ করে স্পেন সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করেন। স্পেন সম্রাটের পতনের পর মুরাবিটস অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

মুরাবিটস ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তিনি অশ্ব এবং উটের পিঠে চড়ে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি 'নাইট রাইডার' হিসেবে সমধিক পরচিতি লাভ করেন। তাঁর এ সুনাম ও সুখ্যাতি তারিক বিন যিয়াদের সুখ্যাতির সাথেই তুলনীয়। তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক ৭১১ সালে সর্বপ্রথম স্পেন বিজয়ের পর তাঁকে জাবালুত্তারিক নামে অভিহিত করা হয়।

১১৪৫ সালে মুয়াহিদদের রাজক্ষমতা দখলের মধ্যদিয়ে মুরাবিটসদের অর্ধশতাব্দী কাল শাসনের অবসান ঘটে। মুয়াহিদরা রাজক্ষমতা দখলের পর ৮০ বছর পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাদের শাসনকালে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, ত্রিপলীর সমগ্র পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ স্পেন তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১২২০ সালে সামেরা মরেনার যুদ্ধক্ষেত্রে নাভাস দিটোলোসায় তাদের সর্বপ্রথম কৌশলগত পরাজয় ঘটে। এ পরাজয়ের পথ ধরেই আন্দালুসিয়ায় পুনরায় খৃস্টানদের উত্থান ঘটে। ফলে ২৪ বছর পর ১২৩৬ সালে কর্ডোভা এবং ১২৪৮ সালে সেভেলীর পতন ঘটে। মুয়াহিদস শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে টুর্মাট অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শাসনামলে তাওহিদবাদী শিক্ষা অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। বাগদাদের নিযামিয়া কলেজের দর্শনের অধ্যাপক আবু হামিদ আল-গাযালীর শিক্ষায় তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত হন। অধ্যাপক আবু হামিদ আল-গাযালীর সংস্পর্শে এসে তিনি তাওহীদের যে শিক্ষালাভ করেন তা তাঁর জীবনকে এবং শাসনকার্যকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাই মুয়াহিদদের শাসনকালকে ইতিহাসে ইউনিটেরিয়ান শাসনকাল বলে অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

কোর্ট ফিজিসিয়ান আবু বকর ইবনে তোফায়েল (১২০২-১২৮৫) ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক ও দার্শনিক ব্যক্তি। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি মুয়াহিদ শাসনামলে মরক্কোর কোর্টে প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ করেন। সাহিত্যাংগন থেকে প্রশাসনিক কাজে ফিরে যাবার কারণে তিনি তাঁর মেধাবী ও আশ্রিত ছাত্র ইবনে রুশদকে গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটলের সাহিত্যকর্মকে আরবী সাহিত্যে রূপান্তর করার জন্য আহ্বান জানান। এ মহান কার্য সম্পাদনের জন্য ইবনে তোফায়েল মরক্কো ও দক্ষিণ স্পেনের সম্রাট (বাদশাহ) আবু ইয়াকুব ইউসুফের কাছ থেকে বড় ধরনের অর্থ মঞ্জুরী করান। এতে বুঝা যায় ইবনে তোফায়েল ও বাদশাহ আবু ইয়াকুব ইউসুফের সাহিত্যানুরাগ ছিল প্রবল। ইবনে তোফায়েলের অন্যতম সাহিত্যকর্ম ছিল Hayy ibn yagdhan (son of Alert)। এ গ্রন্থটি একটি ইয়াতিম শিশুকে নিয়ে লেখা—যে শিশুটি অনাদরে অবহেলায় বেড়ে উঠছে শ্রীলংকার কোনো দ্বীপে অথবা ভারত মহাসাগরের কোনো প্রান্তে অথবা মরক্কোর ক্যানরি দ্বীপে।

ইবনে তোফায়েলের অনুরোধে তাঁর ছাত্র ইবনে রুশদ কঠোর পরিশ্রম করে এরিস্টোটলের সাহিত্যকর্ম আরবী ভাষায় রূপান্তর করেন। তাঁর এ সাহিত্য কর্ম ১৩ শতকে ইউরোপে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এ শতকে ইউরোপের বুদ্ধিজীবী টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪) এবং দানস স্কটাস (১২৬৬-১৩০৮)-এর দর্শন ইউরোপে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ দার্শনিকরাও তখন ইবনে রুশদ এর সাহিত্য কর্মের সাথে পরিচিত হবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এ সময় টলেডোর একটি অনুবাদ স্কুলে ইবনে রুশদ এর সাহিত্য ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ শুরু হয়। এ সময়টা ছিল মুসলিম স্পেনের চিন্তাশীল দার্শনিকদের যুগ।

ইবনে তোফায়েলের মেধাবী ছাত্র ইবনে রুশদ এর সাহিত্যকর্মই ইউরোপে রেনেসাঁর প্রাথমিক উন্মেষ ঘটায়। ইবনে রুশদ এর সাহিত্য ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা ইবনে রুশদ এর প্রতিভার একটি বিরাট স্বীকৃতি। জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে মুসলমানদের এ উত্থান সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সীমানা ছাড়িয়ে তৎকালীন খৃস্টজগতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এ সময় আন্দালুসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে অনেক বুদ্ধিজীবীর জন্ম হয়। যাঁদের অবদান আজো সমানভাবে সমাদৃত।

www.pathagar.com

আন্দালুসিয়ার খ্যাতিমান ও সুবিদিত চিন্তাবিদরা মুসলিম শাসিত স্পেনের গৌরব। তাঁরা সেন্ট্রাল এশিয়া তথা বুখারার চিকিৎসা বিজ্ঞানী আবু সিনাকে অনুসরণ করেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আবু সিনা বা ইবনে সিনার প্রাধান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে অব্যাহত থাকে। বর্তমান শতকের শুরুতে স্যার উইলিয়াম অসলার চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে সিনার স্থলাভিষিক্ত হন।

মুসলিম শাসিত স্পেনে ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) একটি পরিচিত নাম। তাঁর পূর্বপুরুষের আদিবাস ছিল স্পেনের সেভেলী অঞ্চলে। কিন্তু স্পেনের খৃস্টীয় সরকার তাঁর পরিবারকে জোরপূর্বক সেভেলী থেকে বিতাড়ন করে। বিতাড়িত এ পরিবারটি তিউনিসিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সেভেলী থেকে বিতাড়নের আশি বছর পর তিউনিসে ইবনে খালদুনের জন্ম হয়। তিনি তিউনিসিয়ার জেতুনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। আজো সে বিশ্ববিদ্যালয়টি তিউনিসে বর্তমান রয়েছে। ইবনে খালদুন স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর স্পেনে ফিরে আসেন। ইবনে খালদুনই সোসিওলজিকে একটি সুষ্ঠু নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আনয়ন করতে সক্ষম হন। তাই তাঁকে সোসিওলজির প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'মোকদ্দমা' আজো জ্ঞান পিপাসুদের ঘরে ঘরে সমাদৃত। ইবনে খালদুনকে ফিলসফার অব হিস্ট্রী বা ইতিহাসের দার্শনিক হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।

ইবনে খালদুন তিউনিসে জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও একটি পুরাতন সেভেলিয়ান পরিবারেরই সদস্য ছিলেন। স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি যখন গ্রানাডা থেকে সেভেলী আগমন করেন তখন তিনি সম্রাট পিটারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট পিটার তাঁকে সেভেলীর পূর্ব পুরুষদের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে চাইলে তিনি তা এ বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, তিনি আর খৃস্টধর্মে ফিরে যেতে চান না এবং তাঁর ভবিষ্যত বংশধররাও খৃস্টধর্মে ফিরে আসুক তাও তিনি চান না। তাঁর সময়ে মরক্কোর অধিবাসী বিশ্ব পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৭) ১৩৫০ সালে গ্রানাডা সফর করেন এবং তাঁদের মধ্যে মত বিনিময় হয়।

মুয়াহিদদের শাসনামলে বিখ্যাত আর্কিটেক্ট আহমদ ইবনে বাসু স্পেনের সেভেলীর গিরাল্ডা শহরে একটি স্পেনিস স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। এটি গিরাল্ডা শহরের বিখ্যাত মসজিদের সর্বোচ্চ মিনার। এ মিনারটি রাবাতের হাসান টাওয়ার এবং মরক্কোর দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজধানী মারাকুসের 'কুতুবিয়া টাওয়ার' বা 'বুক টাওয়ারের' সাথেই তুলনীয়।

www.pathagar.com

গ্রানাডা ও তার ঐতিহাসিক আলহামরা ভবন

স্পেনে মুসলমানদের পতন শুরু হয় ১২৩১ সাল থেকে এবং ১৪৯২ সালে মুসলমানদেরকে স্পেন থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাসন দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১২৪৫ সালে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আল আমর নামে একজন পেটি বাদশাহ আরজোনা শহরের ওয়াদাল কুইবীর উপত্যকা থেকে গ্রানাডার নিকটবর্তী একটি বৃহৎ পর্বতের পাদদেশে এসে উপস্থিত হন। ক্যাসেলিয়ানদের লুণ্ঠনের ভয়ে তিনি এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সমস্ত ক্যাসেলিয়ানরা কিছুদিন পূর্বে কর্ডোভা ও সেভেলী দখল করে নেয়।

খৃস্টান স্পেন থেকে বিতাড়িত মুসলমানরা গ্রানাডায় এসে ভীড় জমায়। ফলে এ এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতে ক্যাসেলিয়ানরা ভীত হয়ে পড়ে এবং গ্রানাডা আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে। খৃস্টান স্পেন থেকে শরণার্থী হিসেবে আগত মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই হস্তশিল্প বিশারদ ছিল। ফলে তাদের কর্মতৎপরতার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রানাডা একটি শিল্প শহরে পরিণত হয়। মেডিটরিয়ানদের মাধ্যমে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রফতানী করার ফলে খুব সহজেই মুসলিম শাসিত গ্রানাডার শিল্প বিপ্লব সারা ইউরোপ ও ইতালিতে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম শাসিত গ্রানাডা একটি সাম্রাজ্য হিসেবে এ সময় মাত্র তিনটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। প্রদেশগুলো হলো—মালাগা, গ্রানাডা এবং আলমারকা। মুসলিম শাসিত এ রাজ্যটি এ সময়ে অত্যন্ত সুখে শান্তিতে ছিল। পাখিরা যেমন শাবকদের নিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দে আরামে বসবাস করে, গ্রানাডার প্রজাকুলও এ সময়ে ঠিক তেমনি এক স্বর্গীয় শান্তিতে বসবাস করতো। যেন সর্বত্রই শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। গ্রানাডার দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে ভূমধ্যসাগর এবং অপরদিকে মরক্কো ও আলজেরিয়া অবস্থিত। প্রায় দু'শত বছর পর্যন্ত এ রাজ্যটি তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি তিনটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের মুকাবিলায় যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করায় তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়। এ তিনটি বৃহৎ শক্তি হলো ঃ ক্যাসল, মরক্কো এবং আরাগাঁও। লিসান আদ্দিন ইবনে আল-খাতীব (১৩১৩-১৩৭৪) চৌদ্দ শতকের একজন নামজাদা, খ্যাতিমান ও প্রখ্যাত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এ সময় দেশ পরিচালনায় একদল সুশিক্ষিত, মার্জিত, রুচিশীল ও যোগ্য সিভিল সার্ভেন্টদের সমাবেশ ঘটে। দেশ পরিচালনায় তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। ফলে দেশটির

www.pathagar.com

আইন-শৃংখলা ইউরোপের যে কোনো দেশের তুলনায় অত্যন্ত উন্নতমানের ছিল। ইবনে আল-খতীব একজন জ্ঞানী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্য ও সৎ ছিলেন। এ সময় মুহাম্মদ নামে একজন লেখক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সম্রাটের অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। ইবনে আল খতীবের সমসাময়িক কালের লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইবনে খালদুন। তিনি এ সময় গ্রানাডা সফর করে সম্রাট ইবনে আল-খতীবের সাথে মত বিনিময় করেন এবং সম্রাটের দূত হিসেবে ক্যাসেল গমন করেন। ইবনে জামরাফ (১৩৩৩-১৩৯২) নামে এ সময় অপর একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি ছিলেন ইবনে খালদুনের প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি ছিলেন সম্রাট খতীবের রাজকবি এবং মন্ত্রী। তাঁর কবিতার অসংখ্য পংক্তিমালা আলহামরা ভবনের দেয়ালে উৎকীর্ণ করা হয়।

গ্রানাডা শহরটি এ সময় মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। গ্রানাডাকে পশ্চিম ইউরোপের যে কোনো শহরের চেয়ে সুন্দর শহর বলে তখন মনে করা হতো। ঐতিহাসিক আলহামরা ভবনটি ছিল পর্বতের ঢালু গাত্রে অবস্থিত যেখান থেকে সমগ্র গ্রানাডার দৃশ্য দেখা যেতো। আলহামরা ভবন আজো মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শনাবলী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বগৌরবে। মুসলমানরা গ্রানাডার টিনি রাষ্ট্রটিকে সবদিক থেকেই সুরক্ষিত অবস্থায় রেখেছিল। গ্রানাডার জনগণ কৃষি, শিল্প ও মেষ চালনায় বেশ সমৃদ্ধি অর্জন করে। ফলে দেশটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে। গ্রানাডা ছিল বিতাড়িত অসহায় মানুষের একটি আশ্রয়স্থল। গ্রানাডায় উৎপাদিত ডুমুর ফল ও শিল্পজাত কাপড় সমগ্র ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রফতানী করা হতো, যা আজকের গ্রীক ও তুরস্কের ডুমুর ফলের ব্যবসার সাথেই তুলনীয়। রফতানী পণ্য তালিকায় পরবর্তীকালে মাসকেটস বা হাত বন্দুকও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ হাত বন্দুক সরবরাহের মধ্য দিয়ে ইউরোপে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রানাডার জনগণের কারিগরী জ্ঞানেরও প্রসার ঘটে। এভাবেই মুসলিম গ্রানাডা একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় যা তখনকার শিল্পোন্নত দেশ ফ্রান্স ও ইতালীর সাথেই তুলনা করা যায়। এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য মালাগা ও আলমেরিয়া বন্দর ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখেই গ্রানাডা এবং আলমেরিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা প্রায় দু'শত বছরেরও অধিককাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

www.pathagar.com

১৩৫০ সালে মরক্কোর বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা গ্রানাডা সফর করেন। তিনি আফ্রিকা, ইউক্রেন, ভারত এবং চীনও সফর করেন। ইবনে বতুতা ছিলেন ইসলামী আইনের একজন স্নাতক। তাঁর এ শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের সমগ্র এলাকায় অবস্থিত যে কোনো মুসলিম দেশের বিচারপতির আসন অলংকৃত করার জন্য তিনি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন। পরবর্তীকালে তাঁকে চীনে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য তাঁকে ঝুঁকিপূর্ণ বিস্ময়কর সমুদ্রযাত্রায় বের হতে হয়। তিনি ভারত মহাসাগর, বংগোপসাগর ও মালাকা প্রণালী অতিক্রম করে পিকিং উপস্থিত হন। তাঁর এ সমুদ্রযাত্রা মার্কো পলোর সমুদ্রযাত্রার সাথেই তুলনীয়। ইবনে বতুতার পিকিং পৌছার চল্লিশ বছর পূর্বে মার্কো পলো এ ধরনের অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর সমুদ্রযাত্রার মধ্যদিয়ে পিকিং উপস্থিত হয়েছিলেন। ইতিহাস আজো এ দুটি সমুদ্রযাত্রাকে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিস্ময়কর সমুদ্রযাত্রা বলেই বিবেচনা করে আসছে।

ঐতিহাসিক আলহামরা ভবনের মটো হলো, God is the only victor বা আল্লাহ্ হলো একমাত্র বিজয়ী। গ্রানাডার শেষ সম্রাট আবু আবদুল্লাহ আল হামরা ভবনের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করতে না পেরে ব্যর্থতায় মহিলাদের ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন। কিন্তু তাঁর চোখের পানি আলহামরা ভবনের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি। আলহামরা ভবনের পতনের পর সম্রাট আবু আবদুল্লাহ ও তাঁর মাকে নির্বাসন দেয়া হয়। আল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল ওয়ায্যাম আল কসিকে ইতালীয় জলদস্যুরা ১৫২৫ সালে জাররা দ্বীপ থেকে অপহরণ করে এবং একজন শিক্ষিত-দাস হিসেবে তাঁকে পোপের নিকট বিক্রী করা হয়। অথচ ১৪৬৫ সালে গ্রানাডায় তিনি একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! একজন স্বাধীন নাগরিক, একজন সফল ব্যবসায়ী ও একজন সুসাহিত্যিককে পরিণত বয়সে কৃতদাস হিসেবেই জীবনযাপন করতে হয়। অফ্রিকার পরিচিতি নামক তাঁর সুলিখিত গ্রন্থ দীর্ঘদিন যাবত সচেতন পাঠকদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।

ইবনে খালদুনের সন্তানদেরও তিউনিসিয়া এবং আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যবর্তী সাগরে খৃস্টান জলদস্যুরা অপহরণ করে ইউরোপীয় বনিকদের নিকট কৃতদাস হিসেবে বিক্রী করে দেয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের এ আচরণ মানবতার বিরুদ্ধে একটি জঘন্য অপরাধ।

www.pathagar.com

মুডেজারেস বা তামেদ মুসলিম ক্রাফটসম্যানদের সময়-কাল

তামেদ মুসলিম ক্রাফটসম্যানরা তাদের কারিগরী জগতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তামেদ মুসলিম কারিগররা ক্যাসেল, নাভারী ও এরাগন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার পর কিভাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে তা জানা দরকার। কারণ এ সমস্ত খৃষ্টান দেশসমূহের মুসলমানদের রক্ষার জন্য কোনো মুসলিম সরকারের অস্তিত্ব ছিল না। তাদেরকে অষ্ট্রেলিয়ার বিজয়ী নৌযোদ্ধারা ফ্রান্সের নিকট জাহাজের রন্ধন শাখায় দাস হিসেবে বিক্রী করে দেয়। ন্যাভেরীতে এসে তারা বন্দুক তৈরি ও মেরামতকারী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তাদের এ কারিগরী জ্ঞানের কারণে তারা সেখানে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। তাদের তৈরী বন্দুক পশ্চিম ইউরোপে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। ১৫১২ সালে ক্যাসেল কর্তৃক ন্যাভেরীর পতন হলে এ মুসলিম কারিগরদের বিশেষ মর্যাদাও বিলুপ্ত হয়।

মাদ্রিদের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইমাম ডন ইসা ডি গ্যাবির ১৫শতকে স্পেন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। ইমাম গ্যাবিরের অনূদিত কুরআনের কপি এখন আর পাওয়া যায় না। ইউরোপের লাইব্রেরীগুলোতে অনুসন্ধান করে পবিত্র কুরআনের এ বিরল অনুবাদ কপিটি সংগ্রহ করা খুবই প্রয়োজন।

মুসলমানদের শিল্পীসুলভ দক্ষতা স্পেনের সাংস্কৃতিক অংগনকে ব্যাপকভাবে বিশালতা দান করতে সক্ষম হয়। মুসলিম স্থাপত্যবিদদের দ্বারা নির্মিত রাজপ্রাসাদ, গীর্জা ও বিলাসবহুল বাসভবন স্পেনকে এক জাঁকজমকপূর্ণ শহরে উন্নীত করতে সক্ষম হয়। এ সমস্ত রাজপ্রাসাদ, গীর্জা ও বিলাসবহুল বাসবভনগুলো আকর্ষণীয় হস্তশিল্প ও সুতারের সুন্দর সুন্দর কাজ ও টাইলস দ্বারা সজ্জিত করা হয়। সেভেলীর আলকাজার প্রাসাদটি মুসলিম কারিগরদের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। আলকাজার ভবনটি "লরেন্স অব এ্যারাবিয়া" ছবিতে ব্যবহার করা হয়। প্রাসাদটির অপূর্ব সৌন্দর্যই তাকে এ ঐতিহাসিক ছবিতে স্থান করে নিতে সহায়তা করে। কারণ তখনকার সময়ে অন্য কোনো প্রাসাদ আলকাজার ভবনের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। মুসলিম কারিগরদের এটি একটি অপূর্ব সৃষ্টি। কিং মুতামিদ এ প্রাসাদের মূল কাঠামো নির্মাণ করেন। ১৪ শতকের নিষ্ঠুর সম্রাট পিটার এ রাজপ্রাসাদের নতুন সংস্করণ করেন। স্পেনের মুসলিম

www.pathagar.com

স্থাপত্যশিল্প দেখার জন্য আজো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সৌন্দর্য পিয়াসী মানুষ স্পেনে এসে ভীড় জমায়।

স্পেনিস মুসলমানদের নির্বাসন কাল (১৪৯৯-১৬০৯)

ক্যাসেল এর রাণী ইসাবেলা ও গ্রানাডার সম্রাট ফার্ডিনান্ড ফ্রান্সিসকোর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের সাত বছর পর ১৪৯৯ সালে মুসলমানদেরকে স্পেন থেকে চিরতরে উচ্ছেদের জন্য নিষ্ঠুর নির্যাতন শুরু করা হয়। ধর্ম বিদ্বেষের কারণে ফ্রান্সিসকোর নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফ্রান্সিসকো ছিল তার সমসাময়িক কালের নিকৃষ্টতম গণহত্যাকারী ও বুক বার্নার। গ্রানাডা থেকে মুসলমানদের সকল স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যাকারী ফ্রান্সিসকো গ্রানাডার সকল লাইব্রেরী থেকে মুসলিম সাহিত্যিকদের লেখা সমস্ত বই সংগ্রহ করে জ্বালিয়ে দেয়। ইতিহাসে একমাত্র প্রাচীন চীনেই পুস্তক জ্বালানোর ঘটনা জানা যায়। এরা মানবতার দুশমন এবং সভ্যতার শত্রু। এরাই যুগে যুগে আসে হিটলার, লেনীন, স্ট্যালিন, রদোভান কারাদজিক ও বুশদের প্রেতাত্মা হয়ে। এদের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা সভ্যতার গতিকে করে স্তব্ধ এবং মানবতার বিকাশকে করে রুদ্ধ। মানবতা ও সভ্যতার বিকাশের স্বার্থে এদের রুখতেই হবে। ক্যাসেলিয়ান ও খৃস্টীয় সরকার মুসলিম নেতাদের হত্যা ও তাদের বাড়ীঘর ও সম্পত্তি জোরপূর্বক বিক্রী করে তাদেরকে দরিদ্রসীমার নিম্নতম স্তরে পৌঁছে দেয়। ফলে মুসলিম মহিলা ও শিশুরা অল্পদিনের মধ্যেই রাস্তায় রাস্তায় খোলা আকাশের নীচে বসবাস করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে গ্রানাডার বহু মুসলমানকে মরক্কো ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাসন দেয়া হয়। অনেক মুসলমান আমেরিকায় পাড়ি জমায়। সেখানে তারা রাজমিস্ত্রী, সুতার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়। তাদের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন মেক্সিকো, বলিভিয়া, গুয়েতেমালা ও কলোম্বিয়ায় আজো দেখতে পাওয়া যায়। নিষ্ঠুর খৃস্টান শাসকরা মুসলমানদের গলাটিপে এবং পিতলের গলাবন্ধনী দ্বারা শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের সময় তাদেরকে জোরপূর্বক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার অপচেষ্টাও চালানো হয়। ইতিহাসের এ বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি কলংকজনক অধ্যায় হিসেবে আজো টিকে আছে। এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের ফলে অনেক মুসলিম শিশুরা ইয়াতিম এবং মহিলারা বিধবা হয়। এ সমস্ত ইয়াতিম শিশু ও বিধবা মহিলাদের মধ্য থেকে দু' হাজার শিশু ও মহিলাকে গৃহভৃত্য এবং বাসার সেবিকা বা খানসামা হিসেবে গ্রানাডায় ১৫০২ সালে নিলামে বিক্রয় করা হয়। ভাগ্যহত এ সমস্ত ইয়াতিম শিশু ও

www.pathagar.com

বিধবা মহিলাদের আর্তনাদ সেদিন খোদার আরশকে কাঁপিয়ে তুললেও যালিমদের হৃদয়ে তার কোনো আঁচড় পড়েনি। অপরদিকে পুরুষদেরকে ফাঁসিরকাষ্ঠে ঝুলিয়ে এবং খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। নিহতদের প্রবাহিত পবিত্র রক্ত যাতে বিদ্রোহের দাবানল সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য পুরুষদেরকে ফাঁসিরকাষ্ঠে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। হায়রে ক্ষমতাদর্পী তথাকথিত পশ্চিমা সভ্যতা ধিক! শতাধিক তোকে !!

একটি বেদনাদায়ক ক্রোড়পত্র

খৃস্টান সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের (১৫৫৬-১৫৯৮) শাসনামলে স্পেনে বসবাসকারী অবশিষ্ট মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারী ও পুলিশী তদন্তে দেখা যায় মুসলমানদের সংখ্যা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেপরোয়াভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সময় মুসলমানরা গ্রানাডার দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা তাদের নেতা মুহাম্মাদ ইবনে উমাইয়ার নেতৃত্বে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদেরকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে থামিয়ে দেয়া হয়। ফলে গ্রানাডা ও স্পেনের অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে মরক্কো ও দক্ষিণ আফ্রিকায় জোরপূর্বক নির্বাসন দেয়া হয়। কিন্তু মুদেজীর মুসলিম কারিগররা মেক্সিকো এবং স্পেনের অন্যান্য ঔপনিবেশিক রাজ্যে পাড়ি জমাতে সক্ষম হয়। এ সমস্ত কারিগররা তাদের বিদায়ের সময় স্ত্রী-কন্যাদের সাথে নিয়ে যেতে পারেনি। ফলে তারা মেক্সিকো ও বলিভিয়ান নারীদের বিয়ে করে দাম্পত্য জীবন শুরু করে। স্থানীয় লোকদের সাথে বিতাড়িত মুসলমানদের আত্মীয়তার ফলে মুসলিম স্থাপত্যশিল্প ও কারুকাজ মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়নি। তাই আজো এ সমস্ত অঞ্চলের স্থাপত্যশিল্পে মুসলিম ঐতিহ্য প্রতিফলিত হচ্ছে।

মুসলিম উচ্ছেদের অংশ হিসেবে ১৬০৯-১৬১৪ সালের মধ্যে স্পেনের আরাগন রাজ্য থেকে মুসলমানদের সমূলে উচ্ছেদ করা হয় এবং এ অঞ্চলের মসজিদগুলোকে পাবলিক টয়লেটে রূপান্তরিত করা হয়।

এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পরিণাম

এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড ও পুস্তক পুড়ানোর মধ্য দিয়ে স্পেনবাসী তাদের জ্ঞানভাণ্ডার হারিয়েছে এবং তাদের অতীত গৌরবগাঁথা আজ মৃতপ্রায়। তারা আজ ধর্মযুদ্ধের কল্পকাহিনী নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটায়। মুর ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আজ তারা আলোচনা করে। কিন্তু তাদের নিষ্ঠুর

www.pathagar.com

অত্যাচার ও পুস্তক পুড়ানোর মধ্য দিয়ে মুরদের রচিত সাহিত্যকর্ম ভষ্মিভূত হয়। স্পেনীয় সাহিত্যে আজ আরবী শব্দের উপস্থিতি অত্যন্ত বিরল। ফলে স্পেনে ইসলামের অস্তিত্ব রহস্যাবৃত হয়ে আছে।

১৯৯২ সালে স্পেনবাসী তাদের তথাকথিত বিজয়ের শতবার্ষিকী উদযাপন করে। এ শতবার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের হারানো ঐতিহ্যকে খুঁজে পেতে চায়। কিন্তু তাদের অতীত অত্যন্ত লৌমহর্ষক। তাদের নিষ্ঠুরতা সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষণিকের মধ্যে দলিত মথিত করে দেয়। তাদের সেদিনকার গণহত্যার ঘটনাবলী আজো তাদেরকে কুঁড়েকুঁড়ে খাচ্ছে। নব্য স্পেনবাসী এ নিষ্ঠুরতার কথা শুনে আঁতকে উঠে। এ ধরনের নিষ্ঠুরতা স্পেনে ঘটতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করতে চায় না। ইতিহাস কিন্তু তাদেরকে সেই নিষ্ঠুর গণহত্যার কথা অপকটে বলে দিচ্ছে। কারণ ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না—ইতিহাস তার নিজস্ব গতি পথেই চলে। ইতিহাসের চাকাকে উল্টা পথে চালানো যায় না। মানবতার শত্রুরা ইতিহাসের চাকাকে বিভিন্ন সময় উল্টে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা কখনো সফল হয়নি। স্পেনের ইতিহাস তার জীবন্ত স্বাক্ষী। স্পেনের সেই নিষ্ঠুর শাসকদের প্রেতাত্মারা আজ ভর করছে বিংশ শতকের কিলার দি গ্রেট রদোভান কারাদজিক, বুশ ও শ্যারনদের উপর। তাইতো বর্তমান শতকে ইউরোপের আর একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র বসনিয়া-হার্জেগোবিনার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হতে চলেছে রদোভান কারাদজিকদের নিষ্ঠুরতায়। আর রক্ত পিচাশ বুশের বুটের নীচে ইরাক ও আফগানিস্তানের স্বাধীনতা চাপা পড়ে আছে। যুগে যুগে পৃথিবীতে এদের জন্ম হবে এবং বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে এদের নিষ্ঠুরতা। বর্তমান নিষ্ঠুরতা ও গণহত্যার লৌমহর্ষক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শান্তিবাদী মানুষ অতীতের নিষ্ঠুরতা ও গণহত্যার গভীরতা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারবে।

একবিংশ শতাব্দীকে এ নিষ্ঠুর গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে বিশ্বের প্রতিটি জনপদে খোদায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবী। খোলাফায়ে রাশেদীনের সেই শান্তিময় শাসন ছাড়া দুনিয়া থেকে নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও গণহত্যা বন্ধ হবে না। তাই আজ প্রয়োজন গাযী সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর মত একজন নেতা ও সিপাহসালারের যাঁর নেতৃত্বে আগামী দিনের পৃথিবীতে পুনরায় খোদার রাজ কায়েম হবে এবং মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য খতম হবে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রবাহিত হবে শান্তির সুবাতাস।

www.pathagar.com

মুসলিম স্পেন এক সময় জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ললিতকলায় সমৃদ্ধ ছিল। সারা দুনিয়ার জ্ঞান পিপাসু ও সৌন্দর্য পিয়াসীরা দলে দলে মুসলিম স্পেনে এসে ভিড় জমাতো। কিন্তু মুসলিম শাসনের অবসানে সেদিনের কর্ডোভা, গ্রানাডা, আলহামরা রাজপ্রাসাদ ও কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় আজ আর জ্ঞান পিপাসু ও সৌন্দর্য পিয়াসীদের ততটা আকর্ষণ করে না। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রানাডা, সেভেলী, আলহামরা আজ ইতিহাসের কোলে সুবোধ বালকের ন্যায় আশ্রয় নিয়েছে। এ সুবোধ বালকের দুরন্তপনায় আবার স্পেন জেগে উঠবে—মুখরিত হবে স্পেনের রাজপথ, আল-হামরা রাজপ্রাসাদে আবারো উড্ডীন হবে কালেমার পতাকা। কিন্তু কিভাবে ? এজন্য প্রয়োজন একজন তারিক কিংবা একজন মূসার।

তারিক ও মূসার দিগ্বিজয়ী বাহিনীর আগমন স্পেনের ঘুমন্ত মানুষকে আবার জাগিয়ে তুলুক, কালো বোরখায় ঢেকে রাখা স্পেনের কালো মুখ আবার সোনালী আভায় উজ্জল হয়ে উঠুক, মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটুক এবং স্পেনের প্রতিটি জনপদে আবার নওবেলালের কণ্ঠে আযানের সুমধুর ধ্বনি উচ্চারিত হোক, বিশ্ববাসী আর একবার প্রত্যক্ষ করুক মুসলিম শাসনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আমরা স্পেনের সে সোনালী ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সূত্র–১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, আগস্ট–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪
২. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।
৩. স্পেন বিজয়ী মূসা ঃ ইবরাহীম খলীল।

www.pathagar.com

ইস্টার্ন তুর্কীস্তান ঃ রক্তাক্ত মুসলিম জনপদ

ইস্টার্ন তুর্কিস্তান আজ রক্তস্নাত। প্রতিনিয়ত সেখানে মুসলমানদের রক্ত ঝরছে। ইস্টার্ন তুর্কিস্তানের হৃদয় আজ কমিউনিস্ট চীনা সৈন্যদের বুলেট আর বেয়নেটের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত। শত নির্যাতন আর নিপীড়ন সহ্য করেও আগামী দিনের প্রজন্মের জন্য একটি স্বাধীন তুর্কীস্তান গড়ে তোলার লক্ষে মুসলিম নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন অথচ দেশটি এক সময় স্বাধীন ছিল। মুসলমানরা দীর্ঘদিন দেশটি শাসন করেছে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এটি একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। Satuk Bughra khan এর শাসনামলে ৯৩৪ সালে দেশটিতে ইসলামের আগমন ঘটে। ইসলামের সাম্য ও শান্তির বাণী শুনে সম্রাট Satuk Bughra Khan ইসলাম গ্রহণ করেন এবং Abdul Karim Satuk Buhgra khan নাম ধারণ করেন। মধ্য এশিয়ায় তিনিই প্রথম তুর্কী শাসক যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সম্রাটের ইসলাম গ্রহণের ফলে দেশটিতে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এ সময় শুধুমাত্র Kashghar city-তেই ৩০০টি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে Azna Mosque, পঞ্চদশ শতাব্দীতে Idgah Mosque, অষ্টাদশ শতাব্দীতে Appak Khoja Mosque নির্মাণ করা হয়। এ সময়ে নির্মিত মসজিদগুলোর মধ্যে Idgah Mosqueটি সর্ববৃহৎ মসজিদের মর্যাদা লাভ করে। এ মসজিদটিতে ৫০০০ লোক একত্রে নামায আদায় করতে পারে। ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষে এ সময় শুধুমাত্র Kashghar শহরে ৬টি বড় বড় মাদরাসা নির্মাণ করা হয়। সকল শ্রেণীর পাঠকদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য পঞ্চদশ শতকে Mesudi library নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এ লাইব্রেরীতে ২,০০০০০ এরও অধিক বই সংগ্রহ করা হয়েছে। মুসলিম ছাত্ররা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে Kashghar লাইব্রেরীতে জ্ঞানার্জনের জন্য এসে থাকে। ফলে Mesudi libraryটি শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানের উৎসে পরিণত হয়েছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে Kashghar শহরের ইমাম Hussain Halaf সর্বপ্রথম তুর্কী ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেন। ফলে তুর্কী মুসলমানদের জন্য সরাসরি পবিত্র কুরআন থেকে জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত

www.pathagar.com

হয়। ইসলাম গ্রহণের পর সম্রাট Abdul Karim Satuk Bughra khan ২২ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময় তিনি তুর্কীস্তানে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এ নিরলস ভূমিকার ফলেই মধ্য এশিয়ার উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই ইসলামী কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রসার ঘটে। ইসলামের এ মহান খাদেম ৯৫৫ সালে ইন্তিকাল করেন।

Abdul Kaim Satuk Bughra Khan- এর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র হারুন মূসা খান "Shihab Al-Dawlah" উপাধি ধারণ করে তুর্কীস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেন। Kara khoja-এর শাসনামলে Uygur Kingdom-এর Turfan, Uruchi এবং Kumul অঞ্চল ইসলামী শাসনাধীনে আসে এবং এ অঞ্চলের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবেই তুর্কীস্তান ও উইগুর সাম্রাজ্যে ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়।

অবস্থানগত দিক থেকে ইস্টার্ন তুর্কীস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ওয়েস্টার্ন তুর্কীস্তান ও মঙ্গোলিয়া প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান, পূর্বসীমান্তে ভারত ও তিব্বত এবং চীন অবস্থিত। ইস্টার্ন তুর্কীস্তান মধ্য এশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৮৬৫ সালে রাশিয়া তুর্কীস্তানের পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নেয়। তখন থেকে এর নামকরণ করা হয় Western Turkistan। ১৯২২ সালে ইউ, এস, এস, আর (USSR) গঠিত হবার পর Western Turkistan-কে ৫টি প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত করা হয়। প্রজাতন্ত্রগুলো হলো—

১. উজবেকিস্তান (Uzbekistan)

২. কাজাকিস্তান (Kazakistan)

৩. কিরঘিজিস্তান (Kirghizistan)

৪. তুর্কমেনিস্তান (Tirkmenistan)

৫. তাজিকিস্তান (Tajikistan)।

১৮৭৬ সালে চীনের Manchu শাসক Eastern Turkistan দখল করে নেয় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় Xinjiang বা Xinjiang Uygur Autonomous Region হিসেবে। ১৮৮৪ সালে চীনা কর্তৃপক্ষ দেশটির পুনঃ নামকরণ করে Sinkiang হিসেবে। ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল শুষ্ক ও বালুময়। তাই কৃষকদেরকে প্রাকৃতিক বৃষ্টির

www.pathagar.com

পানির উপর নির্ভর করেই চাষাবাদ করতে হয়। দিনের বেলায় দেশটিতে প্রচণ্ড গরম ও রাতের বেলায় খুব শীত পড়ে। গ্রীষ্মকালে দেশের তাপমাত্রা ৩০° সেন্ট্রিগ্রেড এবং শীতকালে তাপমাত্রা ১৬° সেন্ট্রিগ্রেড পর্যন্ত উঠানামা করে। Turfan অঞ্চলের তাপমাত্রা ৩৩.৭° সেন্ট্রিগ্রেড পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। চীনের ইতিহাসে Turfan-কে "Fire district" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

১৯৯০ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের লোকসংখ্যা হলো ১৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৫৬% মুসলমান (উইগুর, উজবেক, খালক্স ও কাজাক) এবং ৩৪% পৌত্তলিক চীনা। অবশ্য একটি বেসরকারী সূত্র জানিয়েছে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২৫ মিলিয়ন।

৯৩৪ সালে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে ইসলামের বাণী পৌছার পূর্বে তুর্কী জনগণ Shamanism, Buddhism এবং Manicheism ধর্মবিশ্বাস করতো। কিন্তু ইসলামের আগমনের ফলে যুক্তিবাদী মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং দেশের তদানীন্তন শাসক Satuk Bughra Khan ইসলাম গ্রহণ করায় দ্রুত ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। পরবর্তীকালে Satuk Bughra Khan-এর নেতৃত্বে দেশটিতে ইসলামী শাসন কায়েম হয় এবং দীর্ঘ ২২ বছর তিনি দেশ শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তাঁর ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ীই দেশ শাসন করেন।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের জনগণ শিক্ষা-দীক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। সবদিক দিয়ে দেশটি এতো সমৃদ্ধ ছিল যে, এর তুলনা তখন শুধুমাত্র ইউরোপের সাথেই করা হতো। মুসলমানদের সেই স্বর্ণ শাসনামলের বিশদ বর্ণনা সম্বলিত মূল্যবান বই-পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি আজো বার্লিন, লন্ডন, প্যারিস, লেলিনগ্রাদ, টোকিও এবং মধ্যএশিয়ার মিউজিয়ামগুলোতে সংরক্ষিত আছে। দেশটির অধিকাংশ জনগণ তুর্কী ভাষায় কথা বলে। তবে আঞ্চলিক কিছু ভাষাও কথ্যভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে লেখা ও ছাপার কাজে Kok Turks Script ব্যবহার করা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা Orkhun Script ব্যবহার শুরু করে। অবশ্য Script টি কিছু সময় ব্যবহারের পর তুর্কী জনগণ এটি পরিত্যাগ করে এবং Uyghur Script চালু করে। দশম শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণের

www.pathagar.com

পর সরকার Arabic Script এর প্রচলন শুরু করে। বর্তমানে Uyghur এর Arabic script ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় চীন বারবার ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের উপর তার লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে এবং পরিশেষে দেশটি দখল করে নেয়। খৃষ্টপূর্ব ১০৪ ও খৃষ্টপূর্ব ৫৯ সালে দু'বার চীন দেশটি দখল করে নেয়। কিন্তু স্বাধীনচেতা তুর্কী জনগণ চীনের দখলদারিত্ব মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে এবং দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। পরবর্তীকালে ৭৩, ৪৪৮, ৬৫৭ ও ৭৫১ খৃষ্টাব্দে চীনারা আবার দেশটি দখল করে নেয়। কিন্তু তুর্কীস্তানের জনগণ কখনো চীনের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়নি। তাই তারা প্রতিরোধ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। দেশটির উপর বারবার চীনা আগ্রাসন সত্ত্বেও ৮৫৫ বছরের মধ্যে চীন মাত্র ১৫৭ বছর দেশটিকে নিজেদের শাসনাধীন রাখতে সক্ষম হয়। ১৭৫৯ থেকে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত চীন সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এ সময় ইস্টার্ন তুর্কীস্তান চীন সাম্রাজ্যের দখলে চলে যায়। এ সময় চীনের Manchu রাজবংশ দেশ শাসন করে। তুর্কী জনগণ অতীতের ন্যায় Manchu শাসনামলেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সর্বশেষ ১৮৬৩ সালে তুর্কী জনগণ চীনা Manchu শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে এবং Manchu শাসকদের শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত Eastern Turkistan থেকে উপড়ে ফেলে। বিজয়ী তুর্কী মুসলমানরা Yakub Beg Baavlat এর নেতৃত্বে স্বাধীন ইস্টার্ন তুর্কীস্তান প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৬ বছর পর্যন্ত দেশটির স্বাধীন অস্তিত্ব টিকে থাকে।

১৮৭৬ সালে চীনা Manchu General Zho Zhung এর নেতৃত্বে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে সর্বাত্মক আক্রমণ চালানো হয়। এ যুদ্ধে বিশাল চীনা সেনাবাহিনী অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধে General Zho Zhung জয়লাভ করে এবং ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে পুনরায় চীনা শাসন কায়েম হয়। ১৮৮৪ সালের ১৮ই নভেম্বর ইস্টার্ন তুর্কীস্তানকে China Manchu Empire-এর অংশ বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়।

১৯১১ সালে জাতীয়তাবাদী চীনা নেতা Dr. Sun yat Sen-এর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী চীনা জনগণ Marchu Empire-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং Manchu শাসনের অবসান ঘটিয়ে চীনকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে। চীনে জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে সরকার কায়েমের পর তারা তুর্কী মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়

www.pathagar.com

কোনোরূপ অঙ্গীকার না করায় ১৯৩৩ ও ১৯৪৪ সালে মুসলমানরা পরপর দু'বার বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইস্টার্ন তুর্কীস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু চীনের সামরিক বাহিনী অচিরেই দেশটির স্বাধীন অস্তিত্ব মুছে দেয়।

১৯৪৯ সালে চীনের জাতীয়তাবাদী শক্তি চীনা কমিউনিস্টদের আক্রমণে পরাজিত হয়ে দলে দলে কমিউনিস্টদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। তারা নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একটি বুলেটও ব্যবহার করেনি। কিন্তু হাজার হাজার তুর্কী মুসলমান দেশটির স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। সেই প্রতিরোধ আন্দোলন এখনো অব্যাহত রয়েছে।

ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের নাম পরিবর্তন করে চীনা নাম জিংজিয়াং বা সিংকিয়াং রাখার জন্য ইতিহাস তিনজন চীনা সামন্তবাদী শাসককে দায়ী করেছে। এঁরা হলেন ঃ

১. Zho Zung

Commander in-Chief of the Manchu Chinese forces in Eastern Turkistan.

২. Liu Ching Tang.

The first Governor General of Eastern Turkistan

৩. Yuan Da Hua

Second Governor General of Eastern Turkistan.

একটি দেশের সীমানা মুছে দিয়ে দেশটিকে চীনের অন্তর্ভুক্ত করা এবং দেশটির হাজার হাজার বছরের নিজস্ব পরিচিতিকে পরিত্যাগ করে নতুন নামকরণে বাধ্য করার অপরাধে বিশ্বের স্বাধীনতাকামী ও শান্তিকামী মানুষ আজো এ তিন চীনা নেতাকে ঘৃণার চোখে দেখে আসছে। পৃথিবীর পথে প্রান্তরে ও জনপদে যতদিন স্বাধীনতা ও স্বাধীকার আন্দোলন চলবে ততদিন পর্যন্ত মুক্তিকামী মানুষ একটি জাতিসত্ত্বার ঘাতক এ তিন নেতাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবে না।

ইস্টার্ন তুর্কীস্তানকে পুরোপুরি চীনের অন্তর্ভুক্ত করার পর চীনা কর্তৃপক্ষ তিনটি Policy সেখানে প্রয়োগ করে। এগুলো হলো ঃ

www.pathagar.com

১. Divide and rule ঃ এর অর্থ হলো মুসলমান তথা তুর্কী জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে নির্বিঘ্নে দেশ শাসন করা।

২. Assimilate : এর অর্থ হলো একটি জাতিকে তার নিজস্ব পরিচিতি ভুলিয়ে তাদের জাতিসত্ত্বাকে হজম করে নতুন জাতি সত্ত্বায় আত্তীকরণ করা।

৩. Da Hara chu-i (Greater Chinese Nation) ঃ এর অর্থ হলো বৃহত্তর চীনা জাতি গঠন করা। অর্থাৎ তুর্কী জনগণকে চীনা জাতিসত্ত্বার সাথে একিভূত করে বৃহত্তর চীনা জাতি গঠন করে তুর্কী মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলা। এ তিনটি জঘন্য Policy প্রয়োগ করেই চীনা শাসকরা ক্ষান্ত হয়নি। তুর্কী জনগণের শেষ চিহ্নটিও মুছে ফেলার জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে এবং নিম্নোক্ত কর্মসূচি কার্যকর করে ঃ

ক. চীনাদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য করা।

খ. চীনাদের পোশাক পরতে বাধ্য করা।

গ. চীনা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা।

ঘ. চীনা কর্মকর্তাদের সামনে হাঁটু পেতে বসতে বাধ্য করা।

তুর্কী মুসলমানরা নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার লক্ষে চীনা শাসকদের এ জাতি বিনাশী কর্মসূচির প্রতিবাদ জানায়। মুসলমানদের এ প্রতিবাদের ফলে তাদের উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতা। মানবরূপী চীনা দানবদের হিংস্র নখরাঘাতে এবং বুলেট ও বেয়নেটের খোঁচায় এ সময় ১০,০০,০০০ মুসলমান শাহাদাতবরণ করে এবং ৫,০০,০০০ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে আশ্রয়গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এভাবেই চীনা শাসকরা একটি জাতির অস্তিত্ব ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে। অবশ্য চীনা শাসকদের এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম নয়।

চীন রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'শি হুয়াং তি' (২৫৯-২১০ খৃস্ট পূর্বাব্দ) ক্ষমতা গ্রহণ করেই অতীতকে অস্বীকার করেন। তিনি তাঁর পূর্বের সকল শাসকদের কর্মকাণ্ড মুছে ফেলার লক্ষে সারাদেশ থেকে সকল ইতিহাস গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনুষ্ঠানিকভাবে তা পুড়িয়ে ফেলেন। তাঁর এ অগ্নি উৎসব থেকে শুধুমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের বইগুলো রক্ষা পায়। ইতিহাস গ্রন্থ পুড়ে ফেলার পর তিনি স্বদম্ভে ঘোষণা করেন যে,

www.pathagar.com

চীনের কোনো অতীত নেই বরং তাঁর শাসনামল থেকেই চীনের ইতিহাসের যাত্রা শুরু হলো। কিন্তু চীনের কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি রাজার এ ঘৃণ্য জিঘাংসার হাত থেকে জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রক্ষায় ক্ষীপ্রতার সাথে এগিয়ে আসেন। তারা নিজেদের জীবন বাজী রেখে মূল্যবান কয়েকটি ইতিাস গ্রন্থ মাটি চাপা দিয়ে রাখেন। রাজার মৃত্যুর পর এ গ্রন্থগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। এভাবেই জাতির একটি সচেতন জনগোষ্ঠির সাহসী ভূমিকার ফলে ছাই ভস্ম থেকে গৌরবোজ্জল ইতিহাসের সোনালী পাতাগুলো বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনি ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের মুসলমানদের নির্মূল করার লক্ষে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সত্ত্বেও ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারায় মুসলমানরা আজো তাদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে বেঁচে আছে এবং থাকবে।

১৯১১ সালে চীনে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং National Chinese Republic এর উত্থান ঘটে। Nationalist China-এর প্রতিষ্ঠাতা Dr. Sun yat sean ১৯২৪ সালে Kuomintang Party-এর প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের মুসলমানদের অধিকার সংক্রান্ত National Development program-এর ৪নং ধারাটি উপস্থাপন করেন এবং কংগ্রেস তা অনুমোদন করে। এ ধারায় উল্লেখ করা হয় যে,

"Turkic Peoples living in china and these peoples were original inhabitants of Eastern Turkistan and that all of them were Mslims."

অর্থ : "চীনে বসবাসকারী তুর্কী জনগণ মূলত ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের অধিবাসী এবং তারা সবাই ছিল মুসলমান।"

কংগ্রেস অধিবেশনে ধারাটি উপস্থাপন করে তিনি বলেন,

"These peoples had a right to self-determination and that this right should be granted."

অর্থ : "এ জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্বশাসনের অধিকার রয়েছে এবং তাদের এ ন্যায্য অধিকার স্বীকার করা প্রয়োজন।"

Dr. Sun yat Sen-এর মৃত্যুর পর Chiang kai Shek ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি National Development Program-এর পূর্বোক্ত ৪নং ধারাটি রহিত করেন এবং Great

www.pathagar.com

Chinese Nation গঠনকল্পে মুসলমানদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মুছে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। Great Chinese Nation Theory-র অর্থ হলো চীনের সীমান্ত প্রদেশসমূহে (Turkic, Mongol, Tibetan etc) বসবাসকারী জনগোষ্ঠি এক সময় চীনা জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং Great Chinese Nation গঠনের সুবিধার্থে তাদেরকে পুনরায় চীনা জাতির সাথে একিভূত হতে হবে। Prof. Li Dung fang এ মতবাদের প্রবক্তা। Chiang Kai Shek ছিলেন Prof. Li Dung fang-এর একনিষ্ঠ সমর্থক। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, Eastern Turkistan-এ চীনা গভর্নর Yang Tseng Hsin (1911-1928), Chin Shu Jen (1928- 1933) Shen Shih Tsai (1934-1944) এবং Wu Chung Hsin (August 30, 1944) কঠোরভাবে Great Chinese Nation Theory প্রয়োগ করেন। Eastern Turkestan - এর তুর্কী মুসলমানরা অব্যাহতভাবে এ Theory-এর বিরোধিতা করে আসছে। এ বিরোধিতার কারণে ৩,০০,০০০ তুর্কী মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদীদের সাথে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্টদের বিরোধে চিয়াং কাইশেক পরাজিত হন। ফলে ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কমরেড মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হয়। মাও সে তুং চীনের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ করেন এবং চিয়াং কাইশেক ১৯৪৯ সালের ৮ ডিসেম্বর মূল চীন ভূখণ্ড থেকে ১০০ মাইল পূর্বে তাইওয়ানে তাঁর জাতীয় সরকার স্থানান্তর করেন। এভাবেই চীনে কমিউনিস্ট শাসনের যাত্রা শুরু হয়।

১৯১১ সালে অনুষ্ঠিত First All-China Congress of Workers and Peasants-এর অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও সিংকিয়াং (ইস্টার্ন তুর্কীস্তান) সহ অন্যান্য সীমান্ত প্রদেশগুলো স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতে পারবে। এমনকি তারা ইচ্ছে করলে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেও নিজেদের ঘোষণা করতে পারবে। ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ৭ম কংগ্রেস অধিবেশনে পঠিত প্রতিবেদনে মাও সে তুং ঘোষণা করেন যে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চীনের রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করার পর ইস্টার্ন তুর্কীস্তানসহ অন্যান্য সীমান্ত প্রদেশগুলোর স্বায়ত্বশাসনের অধিকার নিশ্চিত করবে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস চীনা কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর মাও সে তুং ইস্টার্ন তুর্কীস্তানসহ অন্যান্য সীমান্ত প্রদেশগুলোর স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতে অস্বীকার করেন। তুর্কী

www.pathagar.com

মুসলমানরা মাও সে তুং-এর এ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে কমিউনিস্ট সরকারকে বুঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। চীনের অধীনে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে একটি ফেডারেল জাতীয় সরকার গঠনের অনুমতি চেয়েও তুর্কী মুসলমানরা হতাশ হয়। সর্বশেষ তারা দেশটির পরিবর্তিত নাম জিংজিয়াং বা সিংকিয়াং বাতিল করে দেশটির আদি নাম ইস্টার্ন তুর্কীস্তান পুনঃ নামকরণের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু মাও সেতুং সকল আবেদন-নিবেদন নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যান্য চীনা নেতাদের মত তিনিও বিশ্বাস করেন যে, দু' হাজার বছর পূর্ব থেকেই এ প্রদেশটি চীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং চীনা জনগণ এখানে বসবাস করতো। তাই মাও সে তুং-ও মনে করেন ইস্টার্ন তুর্কীস্তান চীনের অবিভাজ্য অংশ (Indiveisible part)।

১৯৬০ সালের ১৪ ডিসেম্বর Xinjiang Ribao পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির 'Cultural Reform' কর্মসূচির আওতায় তুর্কী জনগণ কর্তৃক ব্যবহৃত Arabic Script-এর পরিবর্তে Latin alphabet ব্যবহারে বাধ্য করা হয় এবং এ কর্মসূচির আওতায় ইতিপূর্বে আরবী ভাষায় প্রকাশিত কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের ৩৭০ হাজার কপি পুস্তক ধ্বংস করে দেয়া হয়। মসজিদে মসজিদে মাও সে তুং-এর ছবি টানানো হয় এবং পর্যায়ক্রমে ২৯ হাজার মসজিদকে প্রাইমারী স্কুল, কসাইখানা, সেনা ব্যারাক ইত্যাদিতে রূপান্তর করা হয়। ৫৪ হাজার ইমামকে গ্রেফতার করে তাদেরকে শ্রমিক এবং ক্লিনার হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। মাও সে তুং-এর শাসনামলে Land reform কর্মসূচির আওতায় মুসলমানদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কেড়ে নেয়া হয়। ফলে মুসলমানরা আর্থিক দিক থেকে চরম সংকটে নিপতিত হয়। মাও সে তুং ও কমিউনিস্ট পার্টির এ নির্মম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের মুসলমানরা ১৯৪৯-১৯৬৪ সালের মধ্যে ৫৮ বার বড় ধরনের বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মাও সে তুং-এর কমিউনিস্ট সরকার অত্যন্ত কঠোর হস্তে এ সমস্ত বিদ্রোহ দমন করে। এ সময় ৩ লাখ ৬০ হাজার তুর্কী মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং ২ লাখ মুসলমান প্রতিবেশি রাষ্ট্রে পালিয়ে যায়। এ সময় হাজার হাজার তুর্কী মুসলমানকে ১৯টি শ্রমশিবিরে আটক করে রাখা হয়। এভাবেই মাও সে তুং তাঁর পুরো শাসনামলে তুর্কী মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছেন। কিন্তু শত নির্যাতন সত্ত্বেও চীন থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিজেদের

www.pathagar.com

স্বাতন্ত্র ও আদর্শিক পরিচিতিকে রক্ষা করতে গিয়ে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে কিন্তু বৃহত্তম চীনা জাতির মধ্যে লীন হয়ে যায়নি তাদের স্বাতন্ত্রবোধ। আজো তুর্কীস্তানের মুসলমানরা নিজেদের স্বাধিকার আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। ইতিহাস স্বাক্ষী যে জাতি তাদের স্বাতন্ত্র, আদর্শ, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম রক্ত দিয়ে যায় সে জাতির উত্তরসূরিরা কখনো মাথা নত করতে শেখে না বরং প্রতিরোধ আন্দোলনকে আরো তীব্র থকে তীব্রতর করার লক্ষে তারা হাতিয়ার তুলে নেয়—ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে। ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের বীর জনগণের গৌরবোজ্জল রক্তাক্ত ইতিহাস আমাদেরকে সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের মুসলমানরা বর্তমানে উইগুর মুসলিম হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। মাও সে তুং-এর মৃত্যুর পর উইগুর মুসলমানরা ইস্টার্ন তুর্কীস্তান বা স্বাধীন উইগুরিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করে। এ আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার লক্ষে মুসলিম ছাত্ররা যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. Urumchi, Beijin ও Shanghai শহরে ছাত্রদের ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা।-ডিসেম্বর, ১৯৮৫

২. ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের সকল শহরগুলোতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথ সভার আয়োজন করা।

৩. মাঝে মাঝে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া।

৪. নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষে সাধারণ নির্বাচনের দাবী করা।

৫. ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে কর্মরত চীনা সরকারী কর্মকর্তাদের পরিবর্তে উইগুর মুসলমানদের নিয়োগ দানের লক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলা।

৬. উইগুর মুসলিম ছাত্রদের দেশে ও বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।

৭. ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে অন্য প্রদেশের দাগী (Criminal) চীনাদের বসতি স্থাপনের চলমান কর্মসূচি বাতিল করা।

৮. ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে চীনের পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করা।

চীনা কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে ৬০ জন শীর্ষস্থানীয় ছাত্র নেতাকে ১৯৮৮ সালের

www.pathagar.com

প্রথম দিকে গ্রেফতার করে। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে আজো তা জানা যায়নি। নেতাদের গ্রেফতার হবার পরও ছাত্রদের আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং ১৯৮৮ সালের মধ্যভাগে ছাত্রদের আন্দোলন আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে। তারা Urumchi শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৮৮ সালের মধ্য জুলাইয়ে Urumchi, Artush, Kashgar, Aksu, Hoton, Tekes সহ অন্যান্য শহরে ব্যাপকভাবে পোস্টারিং ও লিফলেট রিলি করা হয় এবং শহরগুলো মুসলিম ছাত্রদের শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে। তুর্কী মুসলমানদের এ আন্দোলনের ফলে বর্তমান চীন সরকার ইস্টার্ন তুর্কীস্তানকে "Autonomous Region" হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাস্তবে এর কোনো ফল উইগুর মুসলমানরা ভোগ করতে পারছে না। এখনো ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে ৯০% সরকারী পদ চীনাদের দখলে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, Regional Party Committe-এর ১৫ জন সদস্যের মধ্যে উইগুর মুসলমান ৩ জন, কাজাক ১জন, মঙ্গোল ১জন এবং ১০জন চীনা। অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, Regional Communist Party Central Committee-এর মোট সদস্য সংখ্যা ৫৬ জন। এর মধ্যে উইগুর মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ১৩ জন। এ কমিটিগুলোই বর্তমানে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের শাসনকার্য পরিচালনা করছে।

সরকারের এ প্রহসনমূলক "Autonomous Region" -এর বাস্তব চিত্র দেখে একজন উইগুর মুসলিম কবি একটি গান রচনা করেছেন। তুর্কীস্তানে এ গানটি বর্তমানে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। গানটির কয়েকটি লাইন নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

> Just by saying "autonomous region" It did not be come Uyguristan, Ah, my poor us ffering nation, Did not become a Turkic land."

> অর্থ ঃ শুধু ঘোষণা হলো-"স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" উইগুকিস্তান কখনো স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে না, হায়! আমার দরিদ্র ও নির্যাতিত জাতি, উইগুরিস্তান কখনো তুর্কী ভূমি হবে না।"

বর্তমানে সরকারী কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে উইগুর মুসলমানদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কোনো ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তাই পদ পেয়েও তারা কোনো কাজ করতে পারছে না। ইস্টার্ন তুর্কীস্তান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ উইগুর মুসলমান বর্তমানে দারিদ্র সীমার

www.pathagar.com

নীচে বসবাস করছে। শতকরা ৮০ জন উইগুর মুসলমানের বার্ষিক আয় মাত্র ৫০ ডলার। মুসলমানদের দরিদ্রতার অন্যতম কারণ হলো বেকারত্ব। অথচ চীনের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে সমস্ত চীনা জনগণকে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে এনে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়েছে তারা কেউই বর্তমানে বেকার নেই। সবাইকেই সরকার তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা করেছে। অথচ উইগুর মুসলমানরা ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের আদিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তারা বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। চাকরির ক্ষেত্রে উইগুর ও চীনাদের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

কর্মক্ষেত্র	মোট জনশক্তি	চীনাদের সংখ্যা	মুসলমানদের সংখ্যা
শিল্প শ্রমিক (Urumchi শহর)	২০০ হাজার	৯০%	১০%
একটি টেক্সটাইল মিল (Urumchi) শহর	১৫ হাজার	৯০%	১০%
একটি টেক্সটাইল প্লান্ট (Kashgar)	১২ হাজার	১১,২০০ জন	৮০০ জন
একটি ট্রাকটর ফ্যাক্টরী (Urumchi শহর)	২,১০০ জন	২০৮৭ জন	১৩ জন
একটি পেট্রো কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী (Poskan)	২২০০ঃ	২২০০	নেই

চাকরির ক্ষেত্রেই শুধু বৈসম্য নয় বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সাথে চীনাদের বৈসম্যের ব্যবধান অনেক বেশি।

১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসের একটি ঘটনা। ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের Hoten শহরের একটি সিল্ক ফ্যাক্টরীতে একজন চীনা পরিচালককে নিয়োগ দেয়া হলে দায়িত্বভার গ্রহণের পরই এ চীনা পরিচালক ৪০০ জন তুর্কী শ্রমিককে ছাঁটাই করে। অথচ এ শ্রমিকরা বছরের পর বছর ধরে এ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ছিল। তাদের ছাঁটাইয়ের পর চীনা শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। ছাঁটাইকৃত শ্রমিকরা এর প্রতিবাদে স্থানীয় তুর্কী গভর্নরের নিকট অভিযোগ পেশ করে। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে গভর্নর তার একজন সহকারীকে ফ্যাক্টরী পরিচালকের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু ফ্যাক্টরী পরিচালক প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে অস্বীকার করেন। ফলে গভর্নরের

www.pathagar.com

সহকারী বিষয়টি Regional Peoples Government-এর vice-chairman-এর নিকট পেশ করেন। কথা শুনে vice-chairman বলেন, "We gave power to the factory directors They can hire or fire anybody they want. There is nothing that we can do about it." Vice-chairman-এর উক্তির মধ্য দিয়ে মুসলমানদের প্রতি চীনা সরকারের ভূমিকা উলঙ্গভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির শাসনামলে এভাবেই উইগুর মুসলমানদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ফলে মুসলমানরা দিন দিন বেকারত্বের শিকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯৮৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর Washington Times পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকেও এর সত্যতা জানা যায়। পত্রিকাটির সাথে এক সাক্ষাৎকারে একজন উইগুর মুসলমান বলেন,

> "So many chinese come to Eastern Turkistan. The economy now favours only the chinese. They get the jobs, Uygurs have no jobs, no good homes, so many sleeping in the streets, peoples are poor. Uygurs are angry : they have a miserable life. The chinese have a good life, good food, high buildings. Uygurs must learn chinese for progress, but chinese cannot speak uygur language. Now it is very hopeless. Many Uygurs have lost thier customs and changed to chinese customs."

অর্থ ঃ "বর্তমানে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের অর্থব্যবস্থা চীনাদের অনুকূল হওয়ায় তারা দলে দলে এখানে আসছে এবং উত্তম পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। অথচ উইগুর মুসলমানদের কোনো চাকরি নেই, মাথা গুজবার জন্য বাড়ী নেই, তারা রাস্তার পাশে রাত যাপন করে এবং তারা অত্যন্ত দরিদ্র। ফলে উইগুর মুসলমানরা তাদের এ শোচনীয় অবস্থার জন্য চীনা কমিউনিস্ট শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। অপরদিকে চীনাদের জীবন যাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত। তাদের উত্তম আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। মুসলমানদেরকে উত্তম জীবনের আশায় চীনা ভাষা জানতে হয় অথচ চীনাদের উইগুর ভাষা জানতে হয় না। এটি একটি হতাশাজনক অবস্থা। এ দুঃসহ অবস্থার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য অনেক উইগুর মুসলমান ইসলামী রীতিনীতি পরিহার করে চীনা রীতিনীতি অনুসরণ করছে।"

www.pathagar.com

বর্তমানে উইগুর মুসলমানগণ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এ সমস্ত সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো–

(ক) Sanitation

(খ) Forced labour

(গ) Education

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ৮০% উইগুর মুসলিম শিশু নিম্নমানের Sanitation ব্যবস্থায় বেড়ে উঠছে। ফলে poor sanitation ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা এ শিশুরা আগামী দিনে সুস্থ ও সবল জাতি গঠনে কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে মনে হয় না।

কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতি বছর একজন উইগুর মুসলমানকে বিনা পারিশ্রমিকে ৪৫ দিন শ্রম দিতে হয়। এতে তাদের আয় কমে যায়। ফলে দরিদ্রতা তাদের নিত্য সাথী হয়ে থাকে।

মুসলিম শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেনি। তাই মুসলমানরা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে অর্থ উপার্জনের লক্ষে কাজে নিয়োগ করে থাকে। এতে আশংকা করা হচ্ছে যে, আগামী দিনে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে অশিক্ষিতের হার বহুগুণ বেড়ে যাবে। ১৯৮৫ সালে Far Eastern Economic Review পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে Nicholas Danziger বলেন,

"On the first day in kashgar I woke up well before dawn to find Uygurs sleeping on the dirty road, thier donkeys and carts beside them, under a blanket of snow. They lay on the ground wearing nothing more than large sheepskin coats and hats and slapt huddled together under sheepskin blanket."

অর্থ ঃ "কাশগরের উইগুর মুসলমানরা কিভাবে রাত যাপন করে তা দেখার জন্য কাশঘর সফরের প্রথম দিন আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। আমি দেখতে পেলাম ময়লা-আবর্জনা যুক্ত রাস্তার পাশে রাখা তাদের গরুর গাড়ীগুলোর পাশেই তারা ও তাদের গর্দভগুলো পাশাপাশি খালী জায়গায় শুয়ে আছে। তাদের গায়ে ভেড়ার চামড়ার লম্বা কোর্ট ও মাথায় টুপি ছাড়া আর কিছু ছিল না। এভাবেই তারা রাস্তায় ভেড়ার চামড়ার কম্বলের নীচে গাদাগাদিভাবে শুয়ে থাকে।"

www.pathagar.com

chinese communist party-এর এ নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষে Uygur মুসলমানরা এখন স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছে।

ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের চলমান মুক্তি সংগ্রামকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বর্তমানে অনেকগুলো ইসলামী সংগঠন কাজ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. East Turkistan Foundation

২. Uyghur Revolutionary National Liberation Front (URNLF)

১. Easttrn Turkistan League

East Turkistan Foundation ইস্তাম্বুল ভিত্তিক একটি সংগঠন। তুরস্কের ইস্তাম্বুল থেকে এ সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। অপরদিকে URNLF কাজাকিস্তান ভিত্তিক একটি সংগঠন। Yussuf Beg Mokhlesi এ সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

১৯৯৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী ৫০০০ রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে Uyghur Revolutionary National Leberation Front (URNLF) এবং Eastern Turkistan League-এর আহবানে ১৫,০০০ তুর্কী মুসলমান Yining শহরে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারী ভবনের কাছে পৌঁছুলে নিরাপত্তা রক্ষীরা মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই ৩০ জন মুসলমান শাহাদাতবরণ করে এবং শত শত মিছিলকারী মারাত্মকভাবে আহত হয়। ঘটনার পূর্বদিন মুসলমানরা একটি সভার আয়োজনের চেষ্টা করলে নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদের বাঁধা দেয় এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে। এ দু' দিনের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত থাকে। এ মিছিল থেকে ৫০০০ মুসলমানকে গ্রেফতার করা হয়। নিরাপত্তা রক্ষীদের সাথে সংঘর্ষে এ সময় সর্বমোট ৩০০ জন বিক্ষোভকারী প্রাণ হারান। যাদেরকে গ্রেফতার করা হয় তাদের মধ্য থেকে সংক্ষিপ্ত বিচারের প্রহসন করে ১০০জনকে ফাঁসী দেয়া হয়, ৩০০০ জনকে কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং ২০০০ জনকে সামরিক বাহিনীর ট্রাকে করে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি।

www.pathagar.com

The society for Threatened peoples নামক একটি জার্মান মানবাধিকার গ্রুপও এ হত্যাকাণ্ডের সত্যতা স্বীকার করেছে। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইস্তাম্বুলেও মুসলিম ছাত্ররা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। তারা ইস্তাম্বুলস্থ চীনা কনসুলেট অফিসের পতাকা জ্বালিয়ে দেয়। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের উইগুর মুসলমানরা এক মাস রোযা রাখার পর যখন ঈদুল ফিতর উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তার পূর্বমূহূর্তে চীনা কর্তৃপক্ষ ঈদুল ফিতরের জামায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে যাতে মুসলমানরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে না পারে সেজন্য মুসলমানদের মনে ভীতিসঞ্চার করার লক্ষে সরকার কেন্দ্রীয় মসজিদের চতুর্দিকে পুলিশ মোতায়েন করে এবং প্রখ্যাত মুসলিম নেতা Khoja Muhammad Yaqub-কে গ্রেফতার করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে ১০০০ মুসলিম যুবক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে ব্যাপক লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। এতে শত শত লোক আহত হয় এবং বহু মুসলিম যুবক শাহাদাতবরণ করে। বহুসংখ্যক যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। সেনা সদস্যরা শহরের সকল প্রবেশ পথগুলো বন্ধ করে দেয় যাতে শহরের বাইরে থেকে বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা মিছিল নিয়ে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। অধিকার আদায়ের মিছিল থেকে বিগত পাঁচ বছরে পুলিশ ৫০,০০০ মুসলমানকে গ্রেফতার করেছে বলে এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে। সাম্প্রতিককালে চীনা সেনাবাহিনী ও পুলিশের নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়নের ফলে গোটা ইস্টার্ন তুর্কীস্তান বর্তমানে একটি বড় জেলখানায় পরিণত হয়েছে। সেখানে অসহায় আর অধিকার হারা মানুষের বিলাপ ধ্বনী বাতাস ভারী করে তুলছে। ইস্টার্ন তুর্কীস্তান যখন একটি বদ্ধভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে তখন সারা বিশ্ব নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে। মুক্ত পৃথিবীর এ নির্লিপ্ততা দেখে একজন নির্যাতিত স্বাধীনতাকামী মুসলিম আক্ষেপ করে বলেন,

"Unfortunately, while the province is being transformed into a big prison where oppression is the normal order and the most basic human rights are violated with impunity, the whole world remains

www.pathagar.com

deafeninghty silent. And that silence encourage the chinese to continue their oppression."

অর্থ : দুর্ভাগ্যক্রমে যখন একটি প্রদেশ বড় কারাগারে রূপান্তরিত হয় তখন যেখানে নির্বিচারে নির্যাতন চালানো ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করা একটি স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয় এবং নির্যাতনকারীদেরকে যখন শাস্তির হাত থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয় তখন সারা বিশ্ব বধিরের ন্যায় নীরব থাকে এবং এ নীরবতা চীনা নির্যাতনকারীদেরকে নির্যাতন অব্যাহত রাখতে উৎসাহ যোগায়।"

উইগুর মুসলমানদের ইস্তাম্বুল ভিত্তিক সংগঠন Eastern Turkistan Endowment এর চেয়ারম্যান Muhammad Reza pekinj সম্প্রতি চীনা কর্তৃপক্ষের মানবতাবিরোধী কিছু কর্মসূচি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। এ সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. নতুন বসতি স্থাপন

ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের প্রায় সকল শহরে চীনের অন্যান্য প্রদেশ থেকে চীনা বৌদ্ধদের এনে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য জমি বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ১৯৪৯ সালে ইস্টার্ন তুর্কীস্তানে চীনাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩,০০,০০০। বর্তমানে এ সংখ্যা ৬ মিলিয়নে উত্তীর্ণ হয়েছে যা মোট জনসংখ্যার ৪০%। এভাবে নতুন বসতিস্থাপন অব্যাহত থাকলে নিজ দেশেই উইগুর মুসলমানরা সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত হবে। Han chinese দের নতুন বসতিস্থাপনের ফলে দেশটির Demographic Stucture-এর মারাত্মক পরিবর্তনের পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যও বিনষ্ট হবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ১৯৫৩ সালে দেশটিতে উইগুর মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৭৫%। চীনাদের অব্যাহত বসতি স্থাপনের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৯৮২ সালে ৫৩% এবং ১৯৯০ সালে ৪০% তে এসে ঠেকেছে। অপরদিকে চীনাদের সংখ্যা ছিল ১৯৫৩ সালে মাত্র ৬% জন। বর্তমানে তা বেড়ে ৪০% এ উন্নীত হয়েছে। এ বৃদ্ধির হার অত্যন্ত আশংকাজনক। চীনা কর্তৃপক্ষ যাদেরকে এ প্রদেশে নতুন বসতি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করছে তাদের অধিকাংশই Criminal এবং Murderers.

www.pathagar.com

২. নিউক্লিয়ার টেস্ট

১৭ আগস্ট, ১৯৯৫ ইং তারিখে প্রকাশিত ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার মতে চীনা কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত তুর্কীস্তানের ভূগর্ভে ৪৩টি নিউক্লিয়ার টেস্ট সম্পন্ন করেছে। ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৪ সাল থেকে আগস্ট, ১৯৯৫ সালের মধ্যে এ পরীক্ষাগুলো সমাপ্ত করা হয়। Nuclear Test-এর প্রতিক্রিয়ায় বিগত ৩০ বছরে এ অঞ্চলে ২০০০০০ -এর অধিক লোক মারা গেছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়াও Nuclear Test-এর ফলে এ অঞ্চলের পরিবেশ মারাত্মক দূষণের শিকার হয়েছে। অপর দিকে মায়েরা বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম দিচ্ছে। এভাবেই একটি সবল জাতিকে ভবিষ্যতে বিকলাঙ্গ জাতিতে পরিণত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে চীনের কমিউনিস্ট সরকার মেতে উঠেছে।

৩. বাধ্যতামূলক নির্বীজকরণ

মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস করার লক্ষে সরকার ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের শহরগুলোতে কঠোরভাবে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে এবং গ্রামগুলোতে Compulsory sterilization কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯২ সালে ২৭,৯০০ পুরুষ ও মহিলাকে বাধ্যতামূলকভাবে নির্বীজকরণ করা হয় এবং ৭,১০০ মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয়। এ কর্মসূচির প্রতিবাদ করায় কমিউনিস্ট শাসকের বুলেট আর বেয়নেটের খোঁচায় হাজার হাজার মুসলমানকে জীবন দিতে হয়েছে।

৪. অর্থনৈতিক বৈষম্য (Economic Discrimination)

ইস্টার্ন তুর্কীস্তান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি প্রদেশ। এ অঞ্চল থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ তৈল, ইউরেনিয়াম, স্বর্ণ ও কয়লা উত্তোলন করা হয়। অথচ উত্তোলিত সম্পদের পুরোটাই বেইজিং সরকার কেন্দ্রে নিয়ে যায়। ফলে এ অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে একটি দরিদ্র অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এ প্রদেশের লোকদের বর্তমানে মাথাপিছু আয় মাত্র ৪৫–৫০ মার্কিন ডলার। শতকরা ৮০ ভাগ লোক বর্তমানে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। এদের মাথাপিছু গড় আয় মাত্র ৫.৫০ মার্কিন ডলার। বর্তমানে এ প্রদেশে কোনো Han chinese বেকার নেই। অথচ উইঘুর মুসলমানদের বেকারত্বের হার অত্যন্ত বেশি। এভাবেই বেইজিং কর্তৃপক্ষ উইঘুর মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু করার নীল নক্সা বাস্তবায়ন করছে।

www.pathagar.com

৫. সাংস্কৃতিক বশীভূতকরণ (Cultural Subjugation)

১৯৪৯ সালে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের পর সারা দেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে যাতে মুসলমানরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে সেজন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ, ইমাম, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দী শিবিরে তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। বন্দীদের অনেককেই প্রহসনমূলক বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। চীনা কর্তৃপক্ষের এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে উইঘুর মুসলমানরা রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে। আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এ সমস্ত সংঘর্ষে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা নিহত হয়। অনেকে দেশত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী কাজাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী প্রধান ব্যক্তিত্ব Yusuf Begও কাজাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১৮০ জন ধর্মীয় নেতা, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। বেইজিং সরকারের এ নির্মম হত্যাকাণ্ড গোটা জিংজিয়াং প্রদেশ বা ইস্টার্ন তুর্কীস্তানকে একটি বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে। জিংজিয়াং-এর বাতাস আজ মুক্তিকামী মানুষের গলিত লাশের উৎকট গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। মুক্তিকামী মানুষের এ লাশের মিছিল দেখেই হয়তো আমাদের জাতীয় কবি বলেছেন,

"শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জামায়েত ভারি
হবে দুনিয়াতে ফের ইসলামী ফরমান জারি।"

দিকে দিকে আজ ইসলামী ফরমান জারির আওয়াজ উঠেছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, মিন্দানাও ও ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের প্রতিটি জনপদ আজ পরিণত হয়েছে বদর, ওহুদ, খন্দক আর কারবালায়। প্রতিটি কারবালার পরই ইসলাম আবার জিন্দা হয়ে ওঠে। আর নব্য আবু জাহল ও ওতবারা মুখের ফুঁৎকারে ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দেবার যতই চেষ্টা করুক না কেন ইসলাম তার স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বলিত হয়ে আলো বিকীরণ করবেই।

মানবতার প্রিয়তম বন্ধু, বাতিলের বিরুদ্ধে বিজয়ী সেনাপতি এবং একটি প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক রাসূলে করীম (স)-এর ওফাতের পাঁচ বছর পর সাইয়েদিনা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) কর্তৃক ক্যান্টনে মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে চীনে যে ইসলামের আগমন

www.pathagar.com

ঘটেছিল তা বিভিন্ন চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে আজ একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গোটা ইস্টার্ন তুর্কীস্তান আজ একটি টাইম বোমায় পরিণত হয়েছে। যে কোনো মূহূর্তে তার বিস্ফোরণ ঘটবেই। কারণ যে জাতি জীবন দিতে জানে, সে জাতি মরে না, তাকে কেউ মারতে পারে না। জিহাদের খুন রাঙা পথ ধরেই সেজাতির ঈপ্সিত মহাবিজয় আসবেই। একটি জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যখন আল্লাহর রাহে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন সে জাতির উত্থান কেউ রোধ করতে পারে না। ঠিক তেমনি ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের উইঘুর মুসলমানরা আজ তাদের অধিকার আদায়ের মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত। সেখানে ভীরু, কাপুরুষ আর কমজোরদের কোনো অস্তিত্ব নেই—আছে শুধু যিন্দা দিল মুজাহিদদের। এ যিন্দা দিল মুজাহিদদের রণহুংকারে খান খান হয়ে যাবে চীনের লৌহ-প্রাচীর আর একবিংশ শতাব্দীর সুবহে সাদিকে অভ্যুদয় ঘটবে স্বাধীন Islamic Republic of Eastern Turkistan-এর। আমরা ইস্টার্ন তুর্কীস্তানের উইঘুর মুসলমানদের সেই কাঙ্ক্ষিত সোনালী দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ

১. Eastern Turkestan : An Analysis of the new Trends.

২. Muslim World League Journal (Makkah) July' 90–August' 90

৩. Muslim World League Journal (Makkah) September/October, 1996

৪. Muslim World League Journal (Makkah) March, 1997

৫. Muslim world League Journal (Makkah) April, 1997

৬. বিশ্ব পরিচয়, দেব সাহিত্য কুটির (কলিকাতা) প্রকাশকাল- ১৯৭৬

www.pathagar.com

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম ঃ গৌরবোজ্জ্বল সোনালী অতীত

নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। একদা দেশটি বর্ণ-বৈষম্যের শিকারে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। এখানে কালো মানুষগুলোর সাথে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হতো। এ কালো মানুষদেরই নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। দীর্ঘ ২৭ বছর কারাজীবনের পর দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক বরেণ্য প্রেসিডেন্ট। ১৯৯৪ সালে নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক নতুন দক্ষিণ অফ্রিকার অভ্যুদয় ঘটে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের ইতিহাস অনেক পুরনো। প্রায় তিনশত বছর পূর্বে শেখ ইউসুফ বা আবেদিন তাদিয়া সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় আগমন করেন। তিনশত বছর পূর্বে শেখ ইউসুফ দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের যে বীজ বপন করেছিলেন কালের ব্যবধানে তা আজ বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম আজ একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অবশ্য মানবতার প্রিয়তম বন্ধু, পথ ভুলা মানুষের পথ প্রদর্শক এবং একটি প্রচণ্ড বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক রাসূলে আকরাম (স)-এর জীবদ্দশায়ই হযরত ওসমান (রা)-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম অন্ধকার মহাদেশ বলে খ্যাত আফ্রিকা মহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় এক মিলিয়ন। তিনশত বছর পূর্বে ডাচরা মুসলানদেরকে রাজবন্দি হিসেবে মালে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপটাউনে প্রেরণ করে। এ সমস্ত বন্দীদের মধ্যে রাজ পরিবারের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভবিষ্যতে আফ্রিকায় যাতে মুসলমানদের উত্থান না ঘটে সে জন্য ডাচরা অনেক মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বন্দি মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সংঘবদ্ধ ভাবে জীবনযাপন শুরু করে। কালক্রমে এ ক্ষুদ্র গ্রুপটিই একটি মুসলিম কমিউনিটি হিসেবে ডেভেলপ করে। কিন্তু আফ্রিকায় জনগণের সাথে দীর্ঘ উঠাবসার কারণে মালয় মুসলমানরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যায় এবং এক পর্যায়ে তারা তাদের আদি মালে ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এতো দৃঢ় ছিল যে, শত নির্যাতন ও ধর্মান্তরিত করণের অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি ঘটাতে পারেনি।

www.pathagar.com

বিগত শতাব্দীতে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম ব্যবসায়ী দক্ষিণ আফ্রিকায় আগমন করে। এ সময় ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা বৃটিশ কলোনীভুক্ত ছিল। ভারতবর্ষ থেকে আগত মুসলিম ব্যবসায়ীরা প্রথমতঃ জোহানেসবার্গ ও ডারবানে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীতে তারা সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সাহচর্যে এসে আফ্রিকার অনেক কালো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে আফ্রিকার জনগণের মধ্যে স্থানীয় মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেপটাউনের বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক আইনজীবি সমিতির সাংবিধানিক কমিশনের কনভেনর এডভোকেট ঈসা মূসা ১৯৯৪ সালে একটি কারাগার পরিদর্শনে গেলে দেখতে পান সে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এ. এন. সি) এর অনেক রাজবন্দি কারাগারেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তারা রমযানে রোযা রাখা ও নামায আদায়ের সুযোগ দেয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেছে।

আফ্রিকার জাতিগত আইন সেখানকার মুসলমানদেরকে চারটি উপদলে বা গ্রুপে বিভক্ত করেছে। গ্রুপগুলো হলো–

ক. সাদা

খ. কালো

গ. নিগ্রো এবং

ঘ. ভারতীয়

প্রচলিত আইনের বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে মুসলমানদের এ চারটি গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা এলাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং এ নির্ধারিত এলাকায়ই তাদেরকে বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে বাধ্য করা হয়। সাদা লোকদের এলাকায় দেখা পেলে জোরপূর্বক তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হতো। যে সমস্ত মুসলমানরা এ ধরনের অবস্থার শিকার হতো তারা তখন স্থানীয় মসজিদ এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় গ্রহণ করে নির্যাতনের হাত থেকে সাময়িকভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করতো। জাতিগত নিপীড়নের সময় বর্ণবৈষম্যবাদী সরকার মুসলমানদের পবিত্র স্থান ও প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে জিহাদের হুমকী দেয়। ফলে বর্ণবাদী সরকার তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নে হুমকীর সম্মুখীন হয়। তাই আজো কেপটাউন, পোর্ট অব এলিজাবেথ, ডারবান ও জোহানেসবার্গে মুসলিম ঐতিহ্য মসজিদ, মিনার ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সাহসী মুসলমানদের দীর্ঘ সংগ্রামেরই প্রতিবিম্ব।

www.pathagar.com

বর্ণবাদী সরকারের আমলে একটি কালো আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের জাতিগত চারটি গ্রুপের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে সরকার বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু মুসলিম আলেমরা সরকারের এ কৃত্রিম বাধা অগ্রাহ্য করে আন্তঃ গ্রুপগুলোর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে আসছে। সরকারী আইন চরমভাবে লংঘিত হবার পরও সরকার মুসলমানদের কাছ থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের আশংকায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে মুসলমানদের শক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বর্তমানে তা একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পশ্চিম কেপটাউনে মুসলমানদের অনেক নিদর্শন এখনো বিদ্যমান। এ সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বিগত দিনের মুসলিম বুজর্গ ও নেতৃবৃন্দের কবর। রবিন দ্বীপে মুসলমানদের বেশ নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এ দ্বীপেই নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘ কারাজীবন অতিবাহিত করেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি রবিন দ্বীপ পরিদর্শনে গেলে সাবেক মুসলিম নেতাদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কেপটাউনের সবচেয়ে পুরাতন গোরস্থান হলো 'তানাবারু' গোরস্থান। ১৭৭২ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে এ গোরস্থানে দাফন করা হয়। ১৮৮৬ সালে সরকার এক ডিক্রী জারী করে 'তানাবারু' গোরস্থান মুসলমানদের জন্য বন্ধ করে দেয়। মুসলমানরা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সরকারী এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৮৮৬ সালের ১৭ জানুয়ারী একটি শিশুর লাশ দাফনের প্রত্যয়দীপ্ত শপথের মধ্য দিয়ে ৩ হাজার মুসলমান 'তানাবারু' গোরস্থানের দিকে যাত্রা শুরু করে এবং সরকারী বাধা উপেক্ষা করে মুসলমানরা সেখানে লাশ দাফন করে। মুসলমানদের এ সাহসী প্রতিরোধ ভবিষ্যতে মুসলিম বিরোধী ডিক্রী জারী করা থেকে বিরত থাকতে সরকারকে বাধ্য করে।

১৯৮৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এক নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জাতিগত দাংগায় ৩০ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে মুসলিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল এর চেয়ারম্যান শেখ নাজিম মোহামেদ এর নেতৃত্বে একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল পার্লামেন্ট ভবনের দিকে অগ্রসর হয়।

বিগত শতাব্দীগুলোতে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানরা সাহসিকতার সাথে সকল প্রকার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়েছে এবং এ সমস্ত সংগ্রাম ও

www.pathagar.com

জিহাদ বৃথা যায়নি। মুসলমানদের এ সাহসী প্রতিরোধের কারণে অনেক নেতৃবৃন্দকে বছরের পর বছর কারা প্রাচীরের অন্ধ প্রকোষ্ঠে আটকে রেখেছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ইবরাহীম রসূল, আবদুল্লাহ ওমর, ইমাম আবদুল্লাহ হারুন, আহমেদ কাতারদা এবং আহমেদ তিমুল। এ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইসলাম ও স্বজাতির জন্য তিলে তিলে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের এ ত্যাগ ও তিতিক্ষা আগামী দিনে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামী সমাজ কায়েমের পথে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েকটি ইসলামী সংগঠন ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সমস্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—

১. কল অব ইসলাম
২. মুসলিম ইয়ুথ মুভমেন্ট
৩. মুসলিম ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব সাউথ আফ্রিকা
৪. মুসলিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি এ সংগঠনগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ফলে মুসলিম এবং অমুসলিম সবার নিকটই এ সংগঠনগুলো বেশ পরিচিত। ডি. ক্লার্ক এর শাসনামলে এ সংগঠনগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় প্রকাশ্যে তারা কাজ করতে পারেনি। অবশ্য সে সময় এ. এন. সি এবং পি. এ. সি'র উপরও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। বর্তমান সরকার ইসলামী সংগঠনগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। ফলে এ সংগঠন-গুলো তাদের ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্ণবাদী ডি. ক্লার্ক সরকার মুসলিম সংস্থাসমূহের যে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল নেলসন ম্যান্ডেলা তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আইনগত কোনো বাধা থাকলে ম্যান্ডেলা সরকার বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করেছে। সরকারের এ সদিচ্ছা বাস্তবায়িত হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বাধীন এ. এন. সি'র পাশাপাশি মুসলিম সংগঠনগুলোও বর্ণবাদ, ঔপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা ম্যান্ডেলা অকপটে স্বীকার করেছেন এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে মুসলিম নেতৃবৃন্দের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেছেন।

www.pathagar.com

বিগত তিনশত বছরে মুসলমানরা দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টমণ্ডিত ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। যাঁদের রক্ত ও ঘামে এ ইতিহাস লেখা হয়েছে তাঁদের অন্যতম হলেন শেখ ইউসুফ, ডঃ ইউসুফ দাদু, মৌলভী বকেলিয়া, ইমাম আবদুল্লাহ হারুন। ইমাম আবদুল্লাহ হারুন ছিলেন অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন নেতা। ডিটেনশনে থাকাকালীন ১৯৬৮ সালে নিরাপত্তা পুলিশ তাকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজবন্দি শেখ ইউসুফ দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ইসলামের সে চারাগাছ রোপন করেন, বিংশ শতাব্দীর মধ্যগগনে ইমাম আবদুল্লাহ হারুনের পবিত্র খুন তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে। শহীদদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না—দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি তারই নীরব স্বাক্ষী।

দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানরা অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘু দেশের তুলনায় রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। ১৯৯৩ সালে অত্যন্ত জাকজমকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের আগমনের তিনশত বছর পূর্তি উদযাপিত হলো। তিনশত বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানরা দেশের সরকার ও জনগণকে জানিয়ে দিয়েছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানরাও একটি ফ্যাক্টর এবং একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি। তাদেরকে বাদ দিয়ে নতুন দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ কল্পনাও করা যায় না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রথম প্রচারক শেখ আবদুল্লাহ ইউসুফকে ডাচরা একজন খৃস্টান ধর্মযাজকের কৃতদাস হিসেবে নিয়োগ করে। কিন্তু আল্লাহর দীনের এ মুজাহিদ কৃত দাসের দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনের পর অবসর সময়টুকু ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ব্যয় করেন। তার একান্ত প্রচেষ্টার ফলে ক্যাপটাউনে একটি ক্ষুদ্র মুসলিম কমিউনিটি গড়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুবরণের পর এ কমিউনিটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। বাহ্যত কমিউনিটি বিলীন হয়ে গেলেও আফ্রিকার মুসলমানদের হৃদয় থেকে শেখ আবদুল্লাহ ইউসুফের নাম মুছে যায়নি। তারা শেখ ইউসুফের আবর্তমানে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। এ পরিশ্রমেরই সফল উত্তরণ ঘটে তিনশত বছর পূর্তির মধ্য দিয়ে।

শেখ আবদুল্লাহ ইউসুফের দাওয়াহ কাজের সূচনাপর্ব থেকে প্রায় ১৫০ বছর পর্যন্ত মুসলমানরা শত নির্যাতন ও নিপীড়নকে সহ্য করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা পালন করেন। তখন প্রকাশ্যে আল্লাহর

www.pathagar.com

ইবাদাত করা নিষিদ্ধ ছিল। শেখ ইউসুফ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করে কেপটাউনে প্রকাশ্যে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদাত শুরু করেন। শেখ ইউসুফের সাহসিকতা আজো দক্ষিণ আফ্রিকায় কিংবদন্তী হয়ে আছে।

শেখ আবদুল্লাহ ইউসুফের এ সাহসিকতা পূর্ণ সংগ্রামের ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে ১৮০৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানরা ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। তবুও একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার শহীদ ইমাম আবদুল্লাহ হারুন ও শহীদ আহমদ তিমুলের নাম মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল আফ্রিকার জনগণ যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

সাবেক বর্ণবাদী সরকারের আমলে জাতিগত বৈষম্য, সন্ত্রাস ও নির্যাতন ছিল রাজনৈতিক দর্শন। ১৯৪৮ সাল থেকে ন্যাশনাল পার্টি ক্ষমতায় আরোহণ করে। তখন থেকেই ন্যাশনাল পার্টির নেতৃত্বে এ জাতিগত বৈষম্য ও নির্যাতন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিটি জনপদে মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ মুখ থুবড়ে পড়ে। অপরদিকে ইসলাম মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশের পথকে করে প্রশস্ত। জাতিগত বৈষম্য কুরআনী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাইতো আমরা দেখি রাসূলে করীম (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আর এভাবেই কা'বাকেন্দ্রিক কাফেলার মিছিল হয়ে উঠে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। ফলে ইসলাম অচিরেই আরবের মরুভূমি থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায় হযরত ওসমান (রা)-এর নেতৃত্বে আফ্রিকা মহাদেশে ইসলামের আলো পৌঁছে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত তিনশত বছর পূর্বে মর্দে মুজাহিদ শেখ ইউসুফের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা সর্বপ্রথম ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াদির এক চমৎকার সমন্বয় ঘটে এভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায়। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এখন প্রয়োজন একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের। পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য এর সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে ? ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয়

www.pathagar.com

পৃথিবীকে গড়তে হলে প্রথমে নিজেদেরকে গড়তে হবে। ব্যক্তি গঠন ছাড়া কোনো ভালো কমিউনিটি গড়ে উঠতে পারে না। কুরআনের শিক্ষা হলো প্রত্যেক মানুষকে তাকওয়ার ভিত্তিতে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে হবে। আর এ ধরনের সুন্দর মানুষ দ্বারাই সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব। কারণ তাকওয়া সম্পন্ন মানুষই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে সহজেই। তাকওয়া সম্পর্কে তাই বলা হয় ঃ

> "It is Taqwa Which is central to all Islamic practices from ritual prayers to establishing the welfare State."
>
> অর্থ ঃ "তাকওয়া হলো সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের কেন্দ্রবিন্দু যা কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।"

১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক নতুন দক্ষিণ আফ্রিকার যাত্রা শুরু হয়। নতুন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জাতিগত বৈষম্য, সন্ত্রাস ও নির্যাতন বহুলাংশে দূর হয়েছে। মানুষ তার ব্যক্তি ও বাক স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশের পথ হয়েছে উন্মুক্ত। এমনি এক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ আফ্রিকার এক মিলিয়ন মুসলমান নিজেদের সামর্থানুযায়ী দেশকে গড়ে তোলার লক্ষে সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানরা নিম্নোক্ত দুটি পর্যায়ে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

প্রথমতঃ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

দ্বিতীয়তঃ তৃণমূল পর্যায়ে সকল প্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানরা জাতিগত বৈষম্য দূর করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের ভাব প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশের লক্ষে মানবীয় মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। নতুন আফ্রিকান সরকার দেশ ও জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষে যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে মুসলমানরাও তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলমানরা তাদের ভোটাধিকার পেয়েছে। এ অধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগের মধ্যেই রয়েছে তাদের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ।

www.pathagar.com

সাবেক বর্ণবাদী সরকারের আমলে মানুষের ভোটাধিকার ছিল না। সেখানে ছিল অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন। ইতিহাস সে শাসনকে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করেছে। বর্ণবাদের অবসান এবং নতুন গণতান্ত্রিক সরকারের অভ্যুদয়ের ফলে অন্ধকার যুগের চিরঅবসান হয়েছে এবং একটি নতুন যুগের যাত্রা শুরু হয়েছে। এ যুগসন্ধিক্ষণে মুসলমানদেরকে তাদের অস্তিত্ব ও আদর্শিক বিজয়ের লক্ষে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই নতুন দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে। এভাবেই নতুন দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যত ইতিহাসে মুসলমানরা তাদের যথাযথ স্থান অধিকার করে নিতে পারবে বলে বিশ্বাস।

ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে তৃণমূল পর্যায়ে নতুন দক্ষিণ আফ্রিকা গড়ার ক্ষেত্রে মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কুরআনের শিক্ষার আলোকে নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক. সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

খ. মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা।

গ. প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।

ঘ. মানুষকে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্মে নিয়োজিত না করা।

ঙ. আফ্রিকার জনগণের সাথে ভালো ব্যবহার করা।

চ. শ্রমজীবি মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

ছ. অসহায় ও দরিদ্র জনগণকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

এ সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বস্তরের জনগণের কাছে মুসলমানরা নিজেদের যোগ্য স্থান অধিকার করে নিতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি ঃ

"Every Muslim must do what ever he or she can to the best of his or her ability for social upliftment and improving the quality of life in South Africa."

অর্থ ঃ "দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নের লক্ষে সকল মুসলিম নর-নারীকে তাদের যোগ্যতানুসারে দায়িত্ব পালন করতে হবে।"

www.pathagar.com

সাবেক বর্ণবাদী সরকারের শাসনামলে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে এবং দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের মুক্তির সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের কাছে একটি স্বীকৃত সত্য। নতুন গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান সরকারও মুসলমানদের এ অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক নতুন দক্ষিণ আফ্রিকায় মানুষের ব্যক্তি ও বাক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ায় মুসলমানদের জন্য দাওয়াহ কাজের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অমুসলিমদের নিকট অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দিতে হবে।

অমুসলিমদের নিকট দাওয়াত পৌছানোর দুটি পদ্ধতি

প্রথমতঃ দায়ীকে একজন অনুকরণীয় মুসলিম হতে হবে। কুরআনের আলোকে তার মধ্যে সুন্দর ব্যবহার, সততা, অনুপম চরিত্র, মানবতাবোধ, স্বার্থপরহীনতা প্রভৃতি গুণের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এ ধরনের গুণের সমন্বয় ঘটালেই অন্যান্য মানুষ তার সান্নিধ্যে এসে ইসলামের আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে পারবে। তাই প্রত্যেক দায়ী তথা প্রত্যেক মুসলমানকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। এ কাজে মুসলমানরা যতটুকু অগ্রসর হবে দাওয়াহ কাজেও ততটুকুই ফল পাওয়া যাবে। তাই বলা হয় ঃ

> "Islam has always spread through the practic of pious people and honest merchants."

> অর্থ ঃ "ইসলাম সর্বদাই সম্প্রসারিত হয়েছে ধার্মিক ব্যক্তি ও সৎ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে।"

দ্বিতীয়তঃ শরীআতসম্মত সকল পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে সংখ্যাগুরু অমুসলিমদের নিকট ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পৌছে দেয়া।

দাওয়াহ কাজের জন্য উপযুক্ত লোক তৈরীর লক্ষ্যে ক্যাপটাউনের মুসলমানরা সম্প্রতি একটি ইসলামিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে।

www.pathagar.com

ক্যাপটাউনের মুসলিম কমিউনিটি এ কলেজের উদ্যোক্তা। কলেজ প্রতিষ্ঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন উদ্যোক্তা বলেন ঃ

"We envisage providing a platform and a forum for the Community to produce thinkers, Imams, teachers, Writers, Scholars, Mujtahids and Mujahids to be trained in the envionment, in which they would eventually offer their valuable services."

অর্থ ঃ "আমরা মুসলিম কমিউনিটির জন্যে চিন্তাবিদ, ইমাম, শিক্ষক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত, মুজতাহিদ ও মুজাহিদ তৈরীর লক্ষে একটি প্লাটফর্ম ও ফোরাম তৈরী করেছি যেখানে তারা প্রশিক্ষিত হয়ে উঠবে এবং পরিশেষে তারা সমাজকে মূল্যবান সেবা দান করবে।"

কলেজের জন্য একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আগামীতে কলেজে একটি কুরআনিক সেন্টার (হিফযখানা) চালু করা হবে, যেখানে কুরআনের হাফিয ও ক্বারী তৈরী করা হবে। বর্তমানে কলেজে স্নাতক সমমানের চার বছর মেয়াদী ইসলামিক স্টাডিজ কোর্স চালু রয়েছে। তাছাড়া এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সও কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কলেজের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ মালয়েশিয়াস্থ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানের ইসলামাবাদস্থ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বার্ক লে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। এ যোগাযোগের মাধ্যমে কলেজের পাঠ্য তালিকায় কলেজের উদ্যোক্তাদের মনোভাব প্রতিফলিত হবে বলে ক্যাপটাউনের মুসলমানদের বিশ্বাস। ভবিষ্যতে কলেজে সাংবাদিকতা, ক্যালিওগ্রাফি, ফাইন আর্ট ও কম্পিউটার বিভাগ খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এ কলেজ থেকে ইতোমধ্যে স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এ কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা আগামী দিনে নতুন দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে দাওয়াহ কাজ ছড়িয়ে দিতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ কলেজ থেকে আগামী দিনে বেরিয়ে আসবে এ যুগের তারিক, মূসা, খালিদ বিন ওয়ালীদ, ইবনে খালদুন, ইবনে সীনা, ইবনে বতুতার মত অসংখ্য কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। তাঁদের তৎপরতায় দাওয়াহ কাজ সম্প্রসারিত হলে ব্যাপকভাবে অমুসলিমরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল

www.pathagar.com

ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং দিনে দিনে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভবিষ্যত দক্ষিণ আফ্রিকা এক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে রূপান্তরিত হবে এবং সেখানে খোদায়ী রাজ কায়েম হবে—ইনশাআল্লাহ্। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, জুন, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

শতাব্দীর শিকার ঃ বর্মী মুসলমান

নাফ নদী বিধৌত আরাকান বার্মার (মায়ানমার) একটি প্রদেশ। মায়ানমার বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে প্রায় ১৭২ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত দ্বারা বাংলাদেশ ও মায়ানমার সংযুক্ত। ১০০ মাইল দীর্ঘ নাফ নদী বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে বিভক্ত করে রেখেছে। এছাড়াও রয়েছে ৭২ মাইলের দীর্ঘ দুর্লংঘ্য পার্বত্য সীমান্ত।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব ও ইয়েমেনী বণিকদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইসলামের আলো আরাকানে এসে পৌঁছে এবং ৬৫০ সাল থেকে ১৪৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৭৮০ বছর পর্যন্ত তারা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন। ১৪০৬ সালে আরাকানের বৌদ্ধরাজা নরমিখলা বার্মার রাজা অনন থু-র আক্রমণে পরাজিত ও বিতাড়িত হন। এ সময় জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি গৌড়ের সুলতান নাসির উদ্দীনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতান নাসির উদ্দীন শাহের আশ্রয়ে থাকাকালীন সময় তিনি ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন এবং ইসলামের আলোয় নিজেকে আলোকিত করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সুলাইমান শাহ নাম ধারণ করেন। নরমিখলার ইসলাম গ্রহণের পর সুলতান নাসির উদ্দীন শাহ ১৪৩০ সালে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরাকান আক্রমণ করার জন্য তাঁর প্রধান সেনাপতি ওয়ালী খাঁকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে ওয়ালী খাঁ বর্মী রাজাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে আরাকান রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। আরাকান রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর সুলাইমান শাহ (নরমিখলা)-কে আরাকানের সিংহাসনে পুনঃঅধিষ্ঠিত করেন। সুলাইমান শাহের আরাকান রাজ্য পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে আরাকানে ইসলামী শাসনের শুভ সূচনা হয়। সুলাইমান শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র "আরাকান" দীর্ঘ সাড়ে তিন শত বছর পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীন ছিল। আরাকানে মুসলিম শাসনের শেষদিকে অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু হয়। এ কোন্দলের সুযোগে বর্মী বুদ্ধরাজা বুদাপায়া ১৭৮৪ সালে আরাকান আক্রমণ ও অধিকার করে নেয় এবং দীর্ঘ ৪২ বছর পর্যন্ত তার শাসনকার্য অব্যাহত থাকে। বুদাপায়া ছিল চরম মুসলিম বিদ্বেষী শাসক। আরাকান দখলের পর আরাকান থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য বুদাপায়া বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমেই বুদাপায়া আরাকানের মুসলিম

www.pathagar.com

রাজধানী মরুহং ধ্বংস করে। পর্যায়ক্রমে মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। শুধু ইসলামী প্রতিষ্ঠান ধ্বংস সাধন করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এ সময় গোটা আরাকানে ব্যাপকভাবে প্যাগোডা, মন্দির ও ভিক্ষু-বিহার নির্মাণ করে। উদ্দেশ্য ছিল আরাকানকে বৈশিষ্টগতভাবে একটি বুদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা।

১৮২৩ সালে এক যুদ্ধের মাধ্যমে বৃটিশরা আরাকান দখল করে নেয়। এ যুদ্ধকে ইতিহাসে প্রথম ইংরেজ বর্মী যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। আরাকান বৃটিশ শাসনাধীনে যাবার পর ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী মায়ানমারের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত তা বৃটিশ শাসনাধীন ছিল। অবশ্য ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আরাকান জাপানীদের অধীন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর ১৯৪৫ সালে বৃটিশরা আবার আরাকান দখল করে নেয়।

মায়ানমারের বর্তমান জনসংখ্যা ৪১ মিলিয়ন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৬ মিলিয়ন। ৬ মিলিয়ন মুসলমানের মধ্যে ৩ মিলিয়ন মুসলমান আরাকানে বাস করে। আরাকানের মোট জনসংখ্যার ৭০% মুসলমান। এক জরীপে জানা যায় যে, বিগত প্রায় ১৪০০ বছর যাবত মুসলমানরা আরাকানে বসবাস করে আসছে। অপর এক গবেষণা তথ্য থেকে জানা যায় যে, তিনটি পর্যায়ে মুসলমানরা আরাকান তথা বার্মায় (মায়ানমার) আগমন করে। প্রথমত ৬১৮ সালে আবু ওয়াক্কাস (রা) নামক একজন সাহাবী সর্বপ্রথম আরাকান সফর করেন। তখন থেকেই আরব ধর্ম প্রচারক ও ব্যবসায়ীরা আরাকানে আসতে শুরু করে। এ সমস্ত ধর্ম প্রচারক ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই আরাকানে সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে।

দ্বিতীয়ত ১৫ শতকের শুরুতে আরাকানের বুদ্ধ রাজা নরমিখলার ইসলাম গ্রহণ এবং সুলাইমান শাহ নাম ধারণ করে আরাকানকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণার ফলে আরাকানে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানরা জীবিকার সন্ধানে আরাকানে আগমন করে। পরবর্তীকালে এ সমস্ত মুসলমানরা আরাকানে স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

তৃতীয়ত ১৮২৩ সালে আরাকান বৃটিশ শাসনাধীনে আসার পর তা পাক-ভারত উপমহাদেশের অংশে পরিণত হয়। ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানরা এসে আরাকানে বসতি স্থাপন করে।

www.pathagar.com

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরাকানী মুসলমানদের আদি পুরুষেরা নরমিখলার রাজত্বকাল (১৪৩৪) থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত বসতি স্থাপনকারী মুসলমানদের বংশধর। কাজেই আরাকানসহ মায়ানমারের যে কোনো স্থানে তাদের বসবাস করার জন্মগত ও আইনগত অধিকার রয়েছে।

আরাকানে মুসলিম সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে ১৯৪২ সালের পূর্বপর্যন্ত আরাকানী মুসলমানরা ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করেছে। কিন্তু ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশরা আরাকান থেকে চলে গেলে এক গভীর প্রশাসনিক সংকট সৃষ্টি হয়। এ প্রশাসনিক সংকটের সুযোগ নিয়ে মগদস্যুরা বর্মীদের সরবরাহকৃত আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নিরীহ মুসলমানদের উপর হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এ লোমহর্ষক গণহত্যার শিকার হয় প্রায় এক লাখ আরাকানী মুসলমান এবং পাঁচ লাখেরও বেশী মুসলমান ভিটেমাটি ছাড়া হয়। ধ্বংস হয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ। এভাবেই আরাকানের মাটি রক্তরঞ্জিত হয় মুসর্লমানদের পবিত্র রক্তে। এবারই প্রথম নয় বরং ১৬৬০ সালে মোঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা ভাইদের সাথে সিংহাসন দখলের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরাকানে এসে আশ্রয়গ্রহণ করেন। আরাকানের তদানিন্তন বুদ্ধরাজা শাহ সুজার সুন্দরী কন্যাকে দেখে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে শাহ সুজা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বুদ্ধ রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে শাহ সুজাকে সপরিবারে হত্যা করে। রাজনৈতিক আশ্রয় লাভকারী অসহায় মানুষকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা মানব সভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন। ইতিহাস স্বাক্ষী আরাকানের মাটি শাহজাদা শাহ সুজা ও তার পরিবারের সদস্যদের রক্তেই প্রথম রঞ্জিত হয়। সেই রক্তের দাগ আজো শুকায়নি। আজো মুসলমানদের রক্তে আরাকানের মাটি সিক্ত হচ্ছে অনবরত প্রতিনিয়ত।

১৭৮৫ সালে আরাকান তার স্বাধীন অস্তিত্ব হারায়। এ সময় বর্মী শাসকরা আরাকান দখল করে বার্মার অংশে পরিণত করে। আরাকন বার্মার অংশে পরিণত হবার পর নতুনভাবে মুসলমানদের উপর দানবীয় নির্যাতন শুরু হয়। এ নির্যাতনের ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত আছে।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী মি. অনুর নেতৃত্বে বার্মা (মায়ানমার) বৃটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতাত্তোর প্রথম মন্ত্রীসভায় মি. অনু আরাকান থেকে দু'জন মুসলিম নেতাকে বার্মার কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। এরা হলেন- সুলতান আহমেদ ও মাস্টার আবদুল গাফফার। এ মন্ত্রীসভা ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দেশ শাসন করে। ১৯৬২ সালে জেনারেল নেউইন সামরিক আইন জারী করে এবং অনু মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৬৪ সালে জেনারেল নেউইন বার্মায় সমাজতন্ত্র কায়েম করেন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত জেনারেল নেউইন ক্ষমতায় ছিলেন। জেনারেল নেউইনের শাসনামল ছিল একটি কালো অধ্যায়। ১৯৭৪ সালে নেউইন সরকার আরাকানকে বুদ্ধ শাসিত একটি অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দান করে এবং আরাকানকে সম্পূর্ণরূপে মুসলিম শূন্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৭৮ সালে কুখ্যাত নাগসিন ড্রাগন অপারেশন শুরু হয়। এ অপারেশনে ১০ হাজারেরও অধিক রোহিঙ্গা মুসলমান নিহত হয় এবং প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশের কক্সবাজার সীমান্ত এলাকায় এসে আশ্রয় নেয়। শরণার্থীদের এহেন বিপজ্জনক ঢল জাতিসংঘ ও বিশ্ববিবেককে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়।

নেউইন ক্ষমতায় আসার পর 'বার্মা পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র (Burmese way to socialism) পদ্ধতি চালু করে। এ পদ্ধতির লক্ষ হলো, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর উপর তাদের আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের মাধ্যমে বর্মীকরণ নিশ্চিত করা। সামরিক জান্তা তাদের এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার লক্ষে ডি-ইসলামাইজেশন পলিসি গ্রহণ করে। মুসলমানদের অস্তিত্ব বিরোধী এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা মুসলমানরা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণার অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলো গঠিত হয়। সংগঠনগুলোর নাম ও এর নেতৃবৃন্দের পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ক্র নং	সংগঠনের নাম	সভাপতির নাম
১.	রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (RSO) (আরাকান ভিত্তিক সংগঠন)	ডাঃ মোঃ ইউনুস
২.	আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট (ARIF) (আরাকান ভিত্তিক সংগঠন)	এডভোকেট নূরুল ইসলাম
৩.	রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (RSO) (আরাকান ভিত্তিক সংগঠন)	মাওলানা দীন মুহাম্মদ

www.pathagar.com

৪.	রোহিঙ্গা ইসলামিক লিবারেশন অর্গানাইজেশন (RILO) (পাকিস্তান ভিত্তিক সংগঠন)	মুহাম্মাদ শাহ্
৫.	বিসমিল্লাহ অর্গানাইজেশন (মুসলিম অর্গানাইজেশন) (থাইল্যান্ড ভিত্তিক সংগঠন)	মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল
৬.	রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (RPF) (আরাকান ভিত্তিক সংগঠন) (১৯৮২ সালে নেতৃত্বের কোন্দলে সংগঠনটি ভেঙে যায় এবং কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।)	বি. এ. জাফর (শহীদ) (তিনি সর্বপ্রথম আরাকানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।)
৭.	জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (১৯৪৮ সালের পূর্ব থেকেই সংগঠনটি মুসলমানদের জন্য কাজ করে আসছে) (বার্মা ভিত্তিক সংগঠন)	প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঃ মাওলানা আবদুস সোবহান এবং বর্তমান সভাপতি ঃ ডাঃ মো ইছহাক খান

এ সংগঠনগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত সংগঠনগুলোকে ১৯৯১ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) স্বীকৃতি দেয়। সংগঠনগুলো হলো ঃ

১. রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আর. এস. ও)

২. রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আর. পি. এফ)

৩. রোহিঙ্গা লিবারেশন অর্গানাইজেশন (আর. এল. ও)

৪. রোহিঙ্গা ইসলামিক লিবারেশন অর্গানাইজেশন (আর. আই. এল. ও)

৫. আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট (এ. আর. আই. এফ)

ওআইসি-এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংগঠনগুলো নির্যাতিত মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বর্মী মুসলমানদেরকে আরাকান সহ বার্মার বিভিন্ন জনপদ থেকে বিতাড়িত করার লক্ষে বর্মী সরকার বিভিন্ন সময় অভিবাসন ও নাগরিকত্ব

www.pathagar.com

আইন জারী করে। এ সমস্ত অমানবিক আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ ১. বার্মা অভিবাসন (জরুরি) আইন–১৯৪৭

২. ইউনিয়ন নাগরিকত্ব আইন–১৯৪৮

৩. বার্মা অভিবাসন (জরুরী) আইন–১৯৫৭

৪. নাগরিকত্ব আইন–১৯৮২

নাগরিকত্ব ও অভিবাসন আইনগুলোর মধ্যে সামরিক জান্তা কর্তৃক জারীকৃত ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনটিই বেশি জঘন্য ও অমানবিক। এটি একটি কালো আইন। এ আইন রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর কঠোরভাবে আরোপ করা হয়েছে। এ আইনের মূলকথা হলো–১৮২৩ সালে বার্মা বৃটিশ শাসনাধীনে আসার পূর্বে যে সমস্ত মুসলমান আরাকানসহ বার্মার অন্যান্য প্রদেশে বসবাস করে আসছে তারা এবং তাদের উত্তরসূরীরাই বার্মার নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ ১৮২৩ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত (১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে) যে সমস্ত মুসলমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে আরাকানসহ বার্মার বিভিন্ন জনপদে স্থায়ী বসবাস করছে তারা বহিরাগত এবং অবৈধ। তাদেরকে আরাকানসহ বার্মার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। সরকারের এ জঘন্য নীতির ফলে স্বাধীনতা উত্তর বার্মার মুসলমানরা নির্মম নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। এ সমস্ত নির্যাতনের শিকার হয়ে এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুসলিম নরনারী ও শিশু শাহাদাত বরণ করে এবং লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনে নাগরিকদেরকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, পূর্ণাঙ্গ, সহযোগী এবং নেচারালাইজড। নাগরিকত্ব আইনের ৩নং শর্তে বলা হয়েছে যে, ১৮২৩ সালের পূর্বে যে সমস্ত নাগরিকরা বার্মায় বসবাস করে আসছে তারা 'ন্যাশনাল' শ্রেণীভুক্ত নাগরিক। এ আইনে মুসলমানদেরকে ১৮২৩ সালের পরের বাসিন্দা দেখিয়ে তাদেরকে 'ন্যাশনাল' নাগরিকত্বের ক্যাটাগরি থেকে বাদ দিয়ে কার্যত রাজ্যহীন জনগোষ্ঠিতে পরিণত করা হয়েছে। অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রোহিঙ্গারা আরাকানে বসবাস করে আসছে। ১৯৭৪ সালের এক আইনে জেনারেল নেউইন আরাকানকে মুসলিম শূন্য করে বুদ্ধ শাসিত একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। অথচ বার্মার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মি. উনু ১৯৫৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এক বেতার ভাষণে রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে বার্মার অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির মত বার্মার নাগরিক

www.pathagar.com

বলে ঘোষণা করেন। এছাড়াও বার্মার অপর এক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী মি. উব সুয়ে ১৯৫৯ সালে ৩ নভেম্বর এক ভাষণে মুসলমানদেরকে শন, চিন, কাচিন, কায়িন, কায়া, মন এবং রাখাইনদের ন্যায় সমঅধিকারী নাগরিক বলে ঘোষণা করেন। অথচ রোহিঙ্গাদেরকে আজ আরাকানে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ১৭৮৪ সালে বর্মীদের কর্তৃক আরাকান দখলের পূর্বে সুদীর্ঘ ৩৫০ বছর পর্যন্ত আরাকান রোহিঙ্গা মুসলমান কর্তৃক শাসিত হয়েছে। অথচ তারা আজ নিজ দেশেই পরদেশী বলে বিবেচিত হচ্ছে।

আরাকানসহ বার্মাকে মুসলিম শূন্য করার লক্ষে ১৯৩৭ সাল থেকে যে নির্যাতন শুরু হয় তার একটি খণ্ডচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ক. ১৯৩৮ সালে সেন্ট্রাল বার্মায় ৩০ হাজার মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

খ. ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বৃটিশরা আরাকান ত্যাগ করলে এবং জাপান আরাকানের দখল নেয়ার পূর্বে স্বল্প সময়ে এক লাখ মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং পাঁচ লাখ মুসলমানকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এ সময় নির্বিচারে মুসলমানদের বাড়ীঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ক্ষতি হয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ।

গ. ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে "এথ্নিক ক্লিনজিং প্রোগ্রাম"-এর আওতায় আশি হাজার মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং বিশ হাজার মুসলমানকে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বলপূর্বক প্রেরণ করা হয়।

ঘ. পঞ্চাশের দশকে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং মহিলা ও যুবতীদেরকে গণহারে পাশবিক নির্যাতন করা হয়।

এ সময় তেত্রিশ হাজার মুসলমানকে দেশত্যাগ করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়।

ঙ. ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে বর্মী সরকার অবৈধ অভিবাসনকারীদের চিহ্নিত করার নামে আরাকানে অনেকবার তল্লাশী অভিযান চালায়। এ অভিযানকালে অনেক মুসলিম যুবককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মহিলা ও যুবতীদেরকে পাশবিক নির্যাতন চালান। যে সমস্ত যুবকদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তারা আর কোনো দিন পিতামাতার কাছে ফিরে আসতে পারেনি।

www.pathagar.com

চ. ১৯৭৮ সালের ড্রাগন অপারেশনের মাধ্যমে দশ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং তিন লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়।

ছ. ১৯৯১-৯৭ সালের মধ্যে পুনরায় দুই লাখ পনের হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়।

জ. ২০০৪ সালে ৭ এপ্রিল দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত "প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে"-শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে বর্তমানে বৈধ ও অবৈধভাবে মোট পনের লক্ষাধিক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বসবাস করছে।

ঝ. স্বাধীনভাবে চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা, জোরপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা, জমি বাজেয়াপ্ত করা, ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা, অযৌক্তিক করারোপ, বিয়ের অনুমতি তুলে নেয়া, জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন ফি আদায় করা ইত্যাদি।

এ সমস্ত নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। কারণ নির্যাতনের কারণে মুসলমানরা দিন দিন দরিদ্র থেকে হত দরিদ্র হয়ে পড়েছে। ফলে তাদের পক্ষে পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না ঠিক তেমনি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এতে আশংকা করা হচ্ছে যে, আগামী প্রজন্ম শুধুমাত্র নামেই মুসলমান থাকবে। অপরদিকে যোগ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষক ও ইমামগণ বর্মী সামরিক জান্তার ভয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে বর্তমান জীর্ণশীর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদগুলোতে যোগ্য শিক্ষক ও ইমামের অভাব দেখা দিয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনের আরাকানে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ মুখ থুবড়ে পড়বে। ফলে নামসর্বস্ব মুসলমানরা ভবিষ্যতে বর্মী সামরিক জান্তার নির্যাতন ও চাপের মুখে বর্মী সংস্কৃতির সাথে একীভূত হয়ে যাবে এবং এভাবে আরাকান একদিন মুসলিম শূন্য হবার পথ প্রশস্ত হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন সময় বর্মী সামরিক বাহিনীর সদস্যরা নামাযী মুসলমানদের মধ্য থেকে মুসলিম মুজাহিদদের ধরার জন্য সশস্ত্র অবস্থায় জুতা পড়ে মসজিদে ঢুকে পড়ে। ইমাম সাহেবরা এ ধরনের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করলে তাদের উপর নেমে আসে নির্মম নির্যাতন।

www.pathagar.com

সম্প্রতি মংডুর একটি মসজিদে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে। মসজিদের ষাটোর্ধ ইমাম শেখ আবদুল হামিদ সেনা সদস্যদের মসজিদে প্রবেশের প্রতিবাদ করলে উপস্থিত মুসল্লীদের সামনে তাকে রাইফেলের বাট দিয়ে নির্মমভাবে আঘাত করা হয় এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে স্থানীয় আর্মী ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। বর্মী সেনা সদস্যরা মুজাহিদ ক্যাম্প ও মুজাহিদদের সম্পর্কে তথ্য দেয়ার জন্য ইমাম সাহেককে অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তিনি তার অপারগতার কথা জানালে সেনাসদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে সিগারেটের আগুন দ্বারা তার শরীরের বিভিন্ন জায়গা পুড়ে ফেলে এবং তার দাঁড়িও জ্বালিয়ে দেয়। পরে অর্ধমৃত অবস্থায় তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা সেখানে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটছে।

রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে বর্মী সামরিক জান্তার নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা এবং আরাকানে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন এবং ইসলাম প্রচার-প্রসারের লক্ষে "আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এ. আর. এন. ও)" সাত দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এ সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে–

১. রোহিঙ্গা মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্দোলন আরো জোরদার ও অব্যাহত রাখা।

২. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশ সাধনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩. মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।

৪. রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীদের শান্তিপূর্ণভাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।

৫. রোহিঙ্গা মুসলমানদের মাঝে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি ও মানবিক গুণাবলী বিকাশ সাধনের লক্ষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

৬. রোহিঙ্গা মুসলমানদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্নমুখি কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৭. আরাকানী মুসলমানদের ঐতিহাসিক স্থাপত্যকলা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা। এ সমস্ত কর্মসূচি বাস্তায়নের মাধ্যমে হতোদ্যম

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

অপরদিকে ডাঃ মুহাম্মাদ ইউনুস এর নেতৃত্বাধীন 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন' এবং এডভোকেট নূরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন 'আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট' আরাকানের চলমান মুক্তি সংগ্রামকে আরো তীব্রতর করার লক্ষে 'রোহিঙ্গা ন্যাশনাল এলায়েন্স' নামে একটি জোট গঠন করেছে। আরাকানের মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত মুজাহিদ সংগঠনগুলোর মধ্যে এ দুটি সংগঠন এবং তাদের জোট কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে একটি ইসলামিক আরাকান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ জোটের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অস্ত্র চালনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ঠিক তেমনি তাদের সশস্ত্র ক্যাডারদেরকে সাচ্চা মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এ সংগঠন দুটি রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিকট খাটি ইসলামী সংগঠন হিসেবে পরিচিত। নব গঠিত এ্যালায়েন্স বার্মার বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষে সামরিক জান্তা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিবেচনার জন্য নয়টি প্রস্তাবনা পেশ করেছে।

প্রস্তাবনাসমূহ

১. সামরিক জান্তা কর্তৃক গঠিত "স্টেট ল এন্ড অর্ডার রেস্টোরেশন কাউন্সিল" (SLORC) কর্তৃক অনুমোদিত "ন্যাশনাল কনভেনশন" বাতিল করা।

২. SLORC কর্তৃক সংবাদপত্র ও মিডিয়ার উপর আরোপিত সেন্সরশীপ প্রত্যাহার করা।

৩. SLORC কর্তৃক সকল ক্ষুদ্র জাতিগুলোর উপর দমননীতি বন্ধ করা।

৪. সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়া এবং রাজনৈতিক নির্যাতন বন্ধ করে নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৫. "স্টেট ল এন্ড অর্ডার রেস্টোরেশন কাউন্সিল"-কর্তৃক রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর আরোপিত সকল বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা এবং তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরায় বাধা না দেয়া।

www.pathagar.com

৬. SLORC কর্তৃক জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করা এবং কনভেনশনে সকল সংখ্যালঘু জাতিগুলোর নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো।

৭. 'ফেডারেল ইউনিয়ন অব বার্মা' গঠনের লক্ষে জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করা।

৮. সকল জাতিসত্ত্বা ও রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শ করে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা এবং সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে সামরিক বাহিনীর ব্যারাকে ফিরে যাওয়া।

৯. তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করবে এবং নির্বাচিত সদস্যরা দেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে। নতুন সংবিধানের আলোকে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত 'কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী' প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব পালন করবে।

আমরা মনে করি সামরিক জান্তা 'রোহিঙ্গা ন্যাশনাল এ্যালায়েন্স' কর্তৃক ঘোষিত প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনা করবে এবং বার্মায় দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়াও সামরিক জান্তাকে উৎখাত করে বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে কয়েকটি গেরিলা সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২০০০ সালে 'বার্মা লিবারেশন আর্মী' নামে একটি ঐক্যবদ্ধ গেরিলা বাহিনী গঠন করেছে। 'বার্মা লিবারেশন আর্মী'-র সহযোগী গেরিলা সংগঠনগুলো হলো ঃ

১. বার্মা মুসলিম অর্গানাইজেশন–ড. মং ফোল্লা

২. নিখিল বার্মা জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম–ডাঃ ইসহাক খান

৩. রোহিঙ্গা লিবারেশন আর্মি–এম. এ. রশীদ

৪. রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন–মাওলানা সাইফুল ইসলাম

৫. রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট–

৬. জমিয়তে ওলামা আরাকান–মাওলানা সিরাজুল ইসলাম

৭. অল্ বার্মীজ স্টুডেন্ট ফ্রন্টসহ আরো কতকগুলো ক্ষুদ্র গেরিলা সংগঠন।

ডঃ মং ফোল্লাকে চেয়্যারম্যান এবং এম. এ. রশীদকে 'বার্মা লিবারেশন আর্মীর' প্রধান কমাণ্ডারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ড. মং ফোল্লা এক সাক্ষাৎকারে দাবী করেছেন যে, তাদের অধীনে ১০ হাজার প্রশিক্ষিত

www.pathagar.com

গেরিলা রয়েছে। ড. মং ফোল্লার মুসলিম নাম জানা যায়নি। এদিকে ১৯৯০ সালে স্লোর্ক (SLORC) তথা বর্মী সামরিক জান্তার অধীনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আরাকান থেকে নির্বাচিত নিম্নোক্ত পাঁচজন পার্লামেন্ট সদস্য ঃ

১. মি. উচমিন্ট- বুছিডং-১. আরাকান
২. মি. উফজল আহমেদ-মংডু-৩. আরাকান
৩. মি. উ নূর আহমেদ-বুছিডং-২. আরাকান
৪. মি. উ চিট লুইন-মংডু-১. আরাকান
৫. মিঃ উইসুয়ে ইয়া-আকিয়াব-১. আরাকান।

রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বরাবরে ৬৮ পৃষ্ঠার সংযুক্তিসহ ১০ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ পত্র (পত্র নং-শূণ্য, তারিখ-সেপ্টেম্বর-০৫, ১৯৯৮ ইং) প্রেরণ করেন। এ পত্রে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর লোমহর্ষক নির্যাতনের বর্ণনাসহ মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের চিত্রসহ রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র পেশ করা হয়। চিঠির সাথে সংযুক্ত এক প্রমাণ পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, বার্মা পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট-১৯৪৯ এবং বার্মা পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন রুলস-১৯৫০-এর ৩০ ধারা অনুযায়ী রোহিঙ্গা মুসলমানদের নামে 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন কার্ড (NRC)' ইস্যু করা হয়। সুতরাং রোহিঙ্গা মুসলমানরা কোনো অবস্থায়ই বহিরাগত নয় বরং আরাকানের স্থায়ী বাসিন্দা ও নাগরিক।

আরাকানের গৌরবোজ্জল সোনালী ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত, মযলুম মানবতার প্রিয়তম নেতা, একটি প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক, শান্তির বার্তাবাহক, আমাদের প্রিয়তম নেতা, আলোকিত পথের দিশারী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রিয়তম সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা) ৬১৮ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম আরাকানের মাটি স্পর্শ করেন এবং স্থানীয় জনগণের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য আরাকানে স্থায়ীভাবে থেকে যান। সুতরাং ইতিহাস একথা প্রমাণ করে যে, রোহিঙ্গা মুসলমানরা বহিরাগত নয় বরং তারাই আরাকানের আদিবাসী।

আমরা আশা করবো বার্মার সামরিক জান্তা এ ঐতিহাসিক সত্যটা মেনে নেবেন এবং রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর চলমান শতাব্দীর বর্বরতম

www.pathagar.com

নির্যাতন বন্ধ করে তাদেরকে বার্মার অন্যান্য জাতিসত্ত্বার ন্যায় সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করবেন। এজন্য প্রয়োজন বিশ্ব নেতৃত্বের চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ। বার্মার (মায়ানমার) বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জেনারেল খিন্যু এ্নুন্টন গত ৪ ও ৫ এপ্রিল '০৪ বাংলাদেশ সফর করেন। ৫ এপ্রিল, ২০০৪ সন্ধায় চট্টগ্রামের হোটেল আগ্রাবাদে কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকদের দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী খিন্যু বলেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের দ্রুত স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়া হবে। আমরাও বিশ্বাস করি প্রধানমন্ত্রীর এ উক্তি নিছক কূটনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং নির্যাতিত-নিপীড়িত ও ভাগ্য বিড়ম্বিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের নির্যাতনের অবসান ঘটাতে সহায়ক হবে। এভাবেই আরাকান আবার মুসলিম আকারানে উন্নীত হবে এবং রোহিঙ্গা মুসলমানরা ফিরে পাবে তাদের হারানো গৌরব ও ইতিহাস। আমরা রোহিঙ্গা মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

তথ্যসূত্র

১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), জানুয়ারী, ১৯৯৬, এপ্রিল, ১৯৯৮, ডিসেম্বর ১৯৯৮, জুলাই ২০০০ এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০২

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (বাংলাদেশ), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩

৩. বার্মায় মুসলিম গণহত্যা-মোহাম্মদ আবুল হোসেন মাহমুদ

৪. অধিকৃত আরাকান, জনগণ, দেশ ও ইতিহাস (বার্মা)-রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন

৫. আরাকানের পাঁচজন পার্লামেন্ট সদস্য কর্তৃক জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানকে দেয়া পত্র (তারিখ ঃ ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

৬. প্রবাহ, ০৫ অক্টোবর ২০০০

৭. রোহিঙ্গা মুসলমানদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (পাণ্ডুলিপি)-ডা. মুহাম্মদ ইসহাক খান (রোহিঙ্গা নেতা)

৮. দৈনিক ইনকিলাব, ৬ এপ্রিল ২০০৪

৯. দৈনিক সংগ্রাম, ২২ আগস্ট, ১৯৭৯

১০. দৈনিক সংগ্রাম,৭ এপ্রিল, ২০০৪

www.pathagar.com

রুশ শাসনাধীনে তাতার মুসলমান ঃ একটি সমীক্ষা

লেলিনের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। এক সময় এ দেশটা ছিল জারদের অধীন। ১৯১৭ সালে লেলিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের পথ ধরেই আশির দশকের শেষ দিকে মাত্র সত্তর বছরের মাথায় লেলিনের স্বপ্নের সমাজতন্ত্র চিরদিনের জন্য বিদায় নেয় রাশিয়া থেকে। কিন্তু পেছনে রেখে যায় মানতার বিরুদ্ধে পরিচালিত বলশেভিকদের নির্মম নির্যাতরে স্বাক্ষী—অসংখ্য গণকবর আর মানুষের মাথার খুলী। আগামী দিনের ইতিহাস গবেষকরা লেলিন-স্ট্যালিনদের এ নির্মম ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের হিসাব মেলাবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সঠিক ইতিহাস রচনা করবে। সে ইতিহাস পড়ে পড়ে ভবিষ্যত প্রজন্ম জানতে পারবে মানবতার বিরুদ্ধে লেলিন-স্ট্যালিনদের আচরণ ছিল কতো নির্মম ও নিষ্ঠুর। মানব রচিত অইন মানবতার বিকাশের পরিবর্তে মানবতাকে কতো নিষ্ঠুরভাবে থামিয়ে দেয়। মার্কস এঞ্জেলস এর সমাজতন্ত্র তার জীবন্ত সাক্ষী। তাই মানবতার বিকাশের জন্য খোদায়ী আইনের আজ বড় প্রয়োজন। দিকে দিকে তাই আজ নও বেলালের আওয়াজ উঠেছে।" মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় অনিবার্য।" একবিংশ শতকের প্রথম সূর্যোদয় মানবতার মুক্তির শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠুক এটাই আজকের প্রত্যাশা।

অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমানদের সংখ্যা ৫০ থেকে ৬০ মিলিয়ন। এ সমস্ত মুসলমানরা সাধারণত ভলগা, উরালস, মধ্য এশিয়া, উত্তর ককেশাশ এবং তুর্কিস্তানে বসবাস করে। আরব বণিকদের মাধ্যমে সপ্তম শতাব্দীতেই ইসলাম সর্বপ্রথম পূর্বাঞ্চলীয় ট্রান্স ককেশাশ অঞ্চলে আগমন করে এবং হাজার বছর ধরে ইসলাম মধ্য এশিয়া ও ককেশাশ অঞ্চলে ব্যাপকভাকে বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে সে সমস্ত অঞ্চলের সত্য সন্ধানী মানুষগুলো ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবেই মধ্য এশিয়া ও ককেশাশ অঞ্চলে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভীত রচিত হয়—যা আজও মানবতার বিকাশে অবদান রেখে যাচ্ছে। মুসলিম শাসনামলে এ অঞ্চল জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে গোটা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম সভ্যতা রাশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। এ

www.pathagar.com

সময়টা ছিল রাশিয়ায় তাতার মুসলমানদের স্বর্ণ শাসনকাল। কিন্তু ষোড়শ শতকের শুরু থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত রুশরা এক এক করে মধ্য এশিয়া ও ককেশাশ অঞ্চলের সকল মুসলিম দেশ দখল করে নেয়।

রুশ শাসনাধীন Volga Urals অঞ্চলের তাতার মুসলমানদের উত্থান-পতন এবং তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত চালচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৭৫১ খৃস্টাব্দে ইসলাম সর্বপ্রথম আরব বণিকদের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া ও Volga Urals অঞ্চলে আগমন করে। মুসলিম বণিকদের সাহচর্যে এসে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম এ অঞ্চলে এক অপ্রতিরুদ্ধ রাজশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাই বলা হয় ঃ

> "Islam absorved and assimilated the people of the former sophisticated civilization and the territories of Transcaucasia and Transoxamia became one of the most brilliant centers of Dar-ul-Islam."

> অর্থ ঃ "ইসলাম সাবেক সফিস্টিকেটেড সভ্যতার জনগণকে ইসলামের দিকে পরিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট ও অ্যাসিমিলেটেড করেছে এবং এর ফলে Transcaucasia এবং Transcaucasia অঞ্চলসমূহ 'দারুল ইসলাম'-এর দীপ্তিমান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।"

৯২২ সালে একজন Bulgar Prince (রাজকুমার) ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন। রাজকুমারের ইসলাম গ্রহণের ফলে Bulgar সাম্রাজ্যে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং অচিরেই বুলগার সাম্রাজ্য একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে তা 'Golden Horde'-এর অংশে পরিণত হয়। এ মুসলিম রাষ্ট্রটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মংগলীয়দের আক্রমণ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিহত করে নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

তাতারদের স্বর্ণ শাসনামলে ১৪৩৮ সালে রাজকুমার Ulug Mahmed -এর নেতৃত্বে সকল মুসলিম উপজাতি ও সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি একক মুসলিম জাতি গঠন করা হয়। এরাই পরবর্তীকালে ইতিহাসে 'তাতার মুসলিম' নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে।

www.pathagar.com

১৯৫২ সালে মুসলিম অঞ্চল Kazan (কাজান) দখলের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী Tatar Khanate রাশিয়ার অধীনস্থ হয়। ফলে একশত বছরের মধ্যে সমস্ত ভলগা সাম্রাজ্য রাশিয়ার পদানত হয়। আন্দালুসিয়ার পতনের পর এটাই মুসলমানদের সবচেয়ে শোচনীয় পরাজয়। দুর্ধর্ষ Ivan কর্তৃক Kazan Khanate দখলের পর তাতার মুসলমানরা শুধু স্বাধীনতাই হারায়নি বরং মৌলিক অধিকার থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি তাদের উর্বর জমি রুশ কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়।

১৯৫২ সালে দুর্ধর্ষ ইভান কর্তৃক Kazan দখলের পর তাতার মুসলমানরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। রুশ দখলদার বাহিনী ১৫৫২ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তাতার মুসলমানদেরকে রুশীয় করণের জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

1. Assimilation through Conversion to orthodox Christianity.

2. Assimilation through linguistic and cultural Russification

3. Genocide through extinction and expulsion.

Assimilation through conversion to orthodox christianity-এর আওতায় ভলগা তাতার মুসলমানদের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়। মুসলিম এলাকায় খৃস্টান মিশনারীদেরকে ধর্মান্তরিত করার কাজে নিয়োজিত করা হয়। সেবার ছদ্মাবরণে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার কাজ তারা পুরোদমে অব্যাহত রাখে, কিন্তু মিশনারীরা তাতার মুসলমানদের কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়। ১৬০৫ সাল থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে Middle volga, Urals, Western Siberia and Lower Volga caspian Sea Area রাশিয়ার প্রভাব বলয়ে চলে যায়। এভাবেই রুশ সাম্রাজ্য পুরো কাস্পিয়ান উপসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। ১৭৩৮ সাল থেকে ১৭৫৫ সালের মধ্যে জার মিখাইলের নির্দেশে ৫৩৬টি মসজিদের মধ্যে ৪১৮টি মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয়। অবশিষ্ট মসজিদগুলো তালাবদ্ধ করে রাখা হয় যাতে মুসলমানরা মসজিদে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। কারণ

www.pathagar.com

মসজিদই হলো মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্ত ও নিরাপদ দুর্গ। এ দুর্গ যতদিন মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন মুসলমানদেরকে দুনিয়ার কোনো শক্তিই পরাজিত করতে পারবে না। রুশ সম্রাটরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই তারা সর্বপ্রথম মসজিদ ধ্বংসের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কারণ মসজিদ মুসলমানদের পুর্নজাগরণ কেন্দ্র।

ধর্মান্তরিত মুসলিম শিশুদের জন্য খৃস্টান মিশনারীরা নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করছে। ১৭৪০ সালে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের জন্য একটি পূর্ণাংগ মিশনারী অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। রুশ সরকারের এতো দমননীতি ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টার ফলে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত ১২,০০০ মুসলমান খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। রুশদের শত প্রলোভন ও নির্যাতনের মধ্যেও তাতার মুসলমানরা স্বীয় ধর্ম ও কৃষ্টিকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে। এ পর্যায়ে খৃস্টান বিশ্প Alexi Raifsky-এর একটি উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন,

> "Mohamedans are diehards in their customs and none of them seek conversion on their own initiative."
>
> অর্থ ঃ "মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির উপর আমৃত্যু অবিচল থাকে এবং তারা কখনো তাদের ধর্ম পরিবর্তন করে না।"

পিটার দি গ্রেট ও তার উত্তরসূরীদের শাসনামলে তথা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৭৩৮-১৭৫৫) সময়ে মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয় যা ১৯৩০ সালে স্ট্যালীনের ধর্ম বিরোধী আন্দোলনের সাথেই তুলনীয়।

Assimilation through Linguistic and cultural Russification -এর আওতায় মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্য নতুন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। রুশ শিক্ষাবিদ N. I. LLminsky এ নতুন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা। তিনি মুসলমানদের গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামিক সেন্টারগুলো বন্ধ করে দেয়ার জন্য রুশ সরকারকে পরামর্শ দেন এবং ধর্মান্তরিত Russian Tatarদের জন্য নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী সিলেবাস তৈরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী নিম্ন

www.pathagar.com

শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা নিজস্ব ভাষায় এবং উপরের শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা রুশ ভাষায় পড়াশুনা করতে বাধ্য। ফলে পরিণত বয়সে একজন যুবক নিজস্ব ধর্মমত থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এটা এ শিক্ষা কারিকুলামের প্রধান বৈশিষ্ট। তিনি মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরবীয় অনুকরণে নতুন ধরনের বর্ণমালা তৈরি করেন। ১৮৬৩ সালে নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মান্তরিত তাতার শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়। কেননা ধর্মান্তরিত তাতার শিক্ষক দ্বারা কচিকাচা শিশুদের ধোঁকা দেয়া খুবই সহজ। তাতার মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা LLminsky-এর এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করে। মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের এ বিরোধিতায় তাৎক্ষণিক কোনো ফল পাওয়া না গেলেও পরবর্তীতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মুসলমানদের সাহস যুগিয়েছে প্রচণ্ডভাবে।

Genocide through extinction and expulsion-এর আওতায় জার কর্তৃপক্ষ Middle volga এরিয়ার প্রধান প্রধান শহর ও উর্বর কৃষি জমি থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে প্রায় ৮ মিলিয়ন তাতার মুসলমানকে বহিষ্কার করে এবং তাদের বাড়ী ঘরে ও কৃষি জমিতে জার সরকারের অনুগত লোকদের পুনর্বাসিত করা হয়। এভাবেই রুশ ঔপনিবেশিক শক্তি সাবেক মুসলিম শাসিত দেশটিকে একটি খৃস্টান শাসিত দেশে পরিণত করে। জার কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত নির্মমভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে বন্ধ করে দেয়। Persecution, expultion এবং Sovietization-এর ফলে মধ্য ভলগা অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা অচিরেই সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয় এবং মধ্য ভলগা অঞ্চল চিরদিনের জন্য দারুল ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাতার মুসলমানরা রুশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে যা উনিশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু এ আন্দোলন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। Tsarian Catherine-II-এর শাসনামলে তাতার মুসলমানরা তাদের অধিকার লাভ করে। ফলে মুসলমানরা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমগ্র মধ্য এশিয়া, কাজাকিস্তান ও তুর্কীস্তানের মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করে এবং তাদের জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ফিরে আসে। তাদের এ অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

সচ্ছলতা রাশিয়ার অন্যান্য অংশে বসবাসকারী মুসলমানদের জীবনকেও প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। তাই বলা হয় ঃ

"By the beginning of the nineteenth century, the Tatars had nearly gained a monopoly in Russian trade with the Kazakh steppes and Uzbek Khamates."

অর্থ ঃ "উনিশ শতকের শুরুতে তাতাররা রাশিয়ার কাজাখ ও উজবেক অঞ্চলে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে।"

তাতার মুসলমানদের এ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলেই ১৮১২ সালের মধ্যে ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠানই তাতার মুসলমানদের মালিকানায় আসে এবং ১৮৯০ সালের মধ্যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের এক তৃতীয়াংশের মালিকানাস্বত্ব তাতার মুসলমানরা লাভ করে। ফলে Akchurin Agichev, Apanaev, Burnabaev, yunosov and Rakhma tutin -এর তাতার মুসলিম শিল্পপতিরা সমগ্র পূর্ব রাশিয়ার টেক্সটাইল, সাবান এবং চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের নেতা নির্বাচিত হয়। এ সমস্ত এলাকার ব্যবসা বাণিজ্যে মূলতঃ তাতার মুসলমানদের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে এ সময় Urals Tatar রা goldmining এবং lumbering এর কাজে নিয়োজিত ছিল। বলশেভিক বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব রাশিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যে মুসলিম তাতারদের একচেটিয়া প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। কিন্তু উনিশ শতকের বিদায় লগ্নে মুসলমানদের এ অব্যাহত প্রাধান্য চিরতরে ঠেকিয়ে দেয়ার জন্য রুশরা তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং তাদের দাবীর প্রেক্ষিতেই সরকার মুসলমানদের ব্যবসা বাণিজ্যে সরকারী বাধা নিষেধ আরোপ করে। ফলে মুসলমানদের বাণিজ্যিক অগ্রগতি শ্লথ হয়ে পড়ে এবং ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তা চুড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

১৮১২ সাল থেকে Volga Tatarদের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য শুরু হয় তা প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। Volga Tatars মুসলমানদের এ অর্থনৈতিক প্রাচুর্য সমগ্র জার সাম্রাজ্য, পশ্চিম ইউরোপ এবং স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশসমূহেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৬৩ সালে Nikolas Illminsky -এর শিক্ষা সংস্কার নীতির ফলে তাতার মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। Nikolas Illminsky এর শিক্ষা সংস্কার

www.pathagar.com

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাতার মুসলমানরা ভারত ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মুসলমানদের ন্যায় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনও শুরু করে। এ সংস্কার আন্দোলন Jadid Movement নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে অনেকে এ আন্দোলনকে Tatar Renaissance of the nineteenth century -বলেও অভিহিত করে থাকে। এ আন্দোলন মূলতঃ ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনেরই অনুরূপ। কারণ শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তাতার মুসলমানরা শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে Adaptation এবং Compromise এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাই বলা হয় ঃ

> "This movement was a movement of adaptation and compromise in the education sector".
>
> অর্থ ঃ "এ আন্দোলন ছিল শিক্ষা সেক্টরকে কম্প্রোমাইজের মাধ্যমে উপযোগী করে তোলার আন্দোলন।"

এ আন্দোলন প্রথমতঃ Abdul Nazir Kursavi -এর নেতৃত্বে শুরু হয় এবং পরবর্তীতে Marjani-এর নেতৃত্বে এ আন্দোলন গতি লাভ করে। Mr. Marjani -কে এক দল তাতার ক্রিমিয়ান ও ককেশীয় চিন্তাবিদ ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেন। এ শিক্ষা আন্দোলনের অনুকরণে তারা তাতার মুসলমানদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তার সমাধান পেশ করতো। এ শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের ফলে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক অংগনে মুসলমানরা নিজস্ব প্রভাব বলয় তৈরী করতে সক্ষম হয়। এ সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন Rizaeddin Fahretdin Oglu (1859-1936), Abdul Qayyum Nasyri (1825-1902), Ismail Bey Gaspraly (1851-1914), Musa Jarullah Bigi (1875-1949) and Abdullah Bubi.

ভলগা তাতার মুসলমানরা তাদের বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের লক্ষে সর্বপ্রথম শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। তারা মুসলিম প্রভাবাধীন এলাকায় নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। মধ্য এশিয়ার বুখারায় তারা বহু মাদরাসা স্থাপন করে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রখ্যাত ভলগা তাতার মুসলিম স্কলার আবদুল আজিজ কুরসাভী (১৭৭৫-১৮১৩) শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধিতা করে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। এ সমন্বিত শিক্ষা আন্দোলন পরবর্তীতে Shihabedding Majani (১৮১৫-১৮৮৯)-এর নেতৃত্ব প্রচণ্ড গতি লাভ কর। এজন্য Shihabedding Marjanni (1815-1889)-কে First Modern Tatar historian and reformer হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮৪৯ সালে তিনি ভলগা অঞ্চলের সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। Marjani বিশ্বাস করতেন যে, সোনালী যুগের ইসলামকে পুনরায় দুনিয়ার মানুষের সামনে যথার্থভাবে তুলে ধরতে হলে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে ইসলামী আদর্শের সাচে ঢেলে সাজাতে হবে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন রক্ষণশীলতা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে একটি বড় বাধা। এ বাধা অপসারণের জন্য ইসলামের আধুনিক ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এজন্য তিনি ইজতিহাদের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন।

Marjani শুধুমাত্র একজন ধর্মীয় নেতাই নন বরং একজন আধুনিক সংস্কারবাদী নেতা। তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ২০ বছর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার পর ৬১ বছর বয়সে ১৮৭৬ সালে শিক্ষকতার পেশায় যোগদান করেন। তার প্রধান দায়িত্ব ছিল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া। এ সমস্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাধ্যমেই তিনি নতুন প্রজন্মকে তাঁর চিন্তা ও চেতনায় গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। Marjani-এর প্রধান শিষ্য Hussenin Feitskhani (1826-1866) প্রথমে Kazan-এর একটি কলেজে প্রভাষক পদে এবং পরে Petersburg University-তে যোগদান করেন। তিনি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিকতর আধুনিকীকরণ করার জন্য একটি ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর এ শিক্ষা আন্দোলন তাতার লেখক ও প্রকাশক Abdul Kaium Nasyri (1824-1927)-এর লেখনী ও প্রকাশনার মাধ্যমে সমগ্র তাতার অঞ্চলে এখনও অব্যাহত রয়েছে। তিনি অসংখ্য টেক্সট বই, ডিকশনারী, ক্যালেন্ডার চিরাচরিত তুর্কী ভাষায় রচনা না করে তাতার ভাষায় রচনা করেন। ফলে স্থানীয় লোকদের নিকট তার লেখনীর কদর বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের অংশ হিসেবে Abdul Kaium Nasyri-এর অনুসারীরা প্রথমতঃ তাতার ভাষায় নিজস্ব ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান বই রচনায় হাত দেয়। বিংশ শতকের শুরুতে এ শিক্ষা আন্দোলন একটি পরিপূর্ণ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। Nasyri স্থানীয় ভাষায় সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি স্থানীয় লোকদের মাতৃভাষায় গ্রামারও

www.pathagar.com

রচনা করেন যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে ১৯২৬ সালে আধুনিক তাতার ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাতার ভাষায় মুসলমানরা ধর্মীয় পুস্তক ও পবিত্র কুরআন শরীফ ছাপাবার অনুমতি লাভ করে। এ অনুমতি লাভের পর প্রথম পর্যায়ে তাতার মুসলমানরা তাতার ভাষায় ১৪,৩০০ কপি কুরআন ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করে। ১৮৫৪-১৮৬৪ সালের মধ্যে কাজান ইউনিভার্সিটি একই তাতার ভাষায় এক মিলিয়নের অধিক কুরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করে। ব্যাপক হারে কুরআন ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশের ফলে মাদরাসা শিক্ষার পরিধিও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। ১০৪৪ সালে কাজান এলাকায় মাত্র ৪ (চার) টি মাদরাসা ছিল। অথচ ১৮৬০ সালের মধ্যে ১৮৫৯টি তাতার মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ের ফলেই শিক্ষা বিস্তারে মুসলমানদের এ অগ্রগতি সাধিত হয়।

১৯০৫ সালে রাশিয়ায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) মসজিদ, হাজার হাজার মক্তব ও মাদরাসা এবং ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) ধর্মীয় শিক্ষক (নেতা) কর্মরত ছিলেন। ১৯১৩ সালের শেষার্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সারাদেশে মাত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) মাদরাসা পরিচালিত হয় যার মধ্যে মাত্র ১০৮৫টি মাদরাসাকে সরকারীভাবে নিবন্ধনকৃত করা হয়। অধিকাংশ মাদরাসাকেই সরকার রেজিস্ট্রেশন দেয়নি। রেজিস্ট্রেশন বিহীন মাদরাসার পরিমাণ ছিল ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাত্র ১০,০০০ মাদরাসার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছে। এ সময় Jadid Movement (Modernist Movement) মধ্য এশিয়া ও উত্তর ককেশীয় অঞ্চল ছাড়া সমগ্র রাশিয়ার ধর্মীয় অংগনে প্রাধান্য বিস্তার করে। অপর একটি মুসলিম ধর্মীয় গ্রুপ রাশিয়ার শাসকদের সাথে সংঘাতে না গিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ গ্রুপের নেতৃত্ব দেন Ismail Bey Gasprinsky (1851-1914)। ক্রিমিয়ার একটি ধনাঢ্য ও উচ্চশিক্ষিত মুসলিম পরিবারে তার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি Bagh Chesaray এর একটি Quranic School-এ পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীতে মস্কোর একটি ক্যাডেট কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর তিনি কয়েক বছর ফ্রান্সে এবং উসমানীয় খেলাফতের বিভিন্ন এলাকায়

www.pathagar.com

বসবাস করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি ক্রিমিয়ায় আসেন এবং Baghchesaray -এর মেয়র নির্বাচিত হন। ১৮৮২ সালে তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচির লক্ষ ছিল তুর্কী ওয়ার্ল্ড এর সাথে রুশ সম্রাটের Unification। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তার রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁকে বলা হয় ঃ

> "He was the greatest educator, linguist, historian and Political leader of his time. His influence on the intellectual life of Russian Turkic Muslims and on the Muslims world in general was tremendous."

> অর্থ ঃ "তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, ইতিহাসবিদ এবং রাজনৈতিক নেতা। তিনি রুশ-তুর্কী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেন। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বও বিস্ময়করভাবে প্রভাবিত হয়।"

মুসলিম বিশ্বের সাথে রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপনের লক্ষে Gasprinsky Pan Turkish এর নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। Pan Turkish এর Violent এবং Anti-Western Manifestation পরিহার করে তিনি এ নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইসলামের অন্তর্নিহীত শক্তিই তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম। তিনি রাশিয়ার মুসলমানদের পূর্ণাংগ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও সমতা বিধানের জন্য চেষ্টা করেন। বৃটিশ, জার্মান ও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের সাথে রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপনের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

১৯০৫ সালে Russian liberal Muslim Political Leader বা Gashprinsky-এর প্রস্তাব অনুযায়ী Russian Muslim Alliance স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সমস্ত Liberal Muslim Leader-দের মধ্যে অন্যতম হলেন Yousuf Akchura Oglu (1876-1933)। তিনি ছিলেন ইস্তাম্বুল ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন Brilliant Academic Careerist। তিনি রাশিয়ার মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের একজন অন্যতম পুরোধা। Ittifaq-al-Muslimin নামে তিনি রাশিয়ার মুসলমানদের জন্য একটি

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল গঠন করেন। নবগঠিত এ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে Akchura Oglu Russian-Muslim Partnership প্রতিষ্ঠার জন্যও তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু রুশ পার্লামেন্ট Duma-য় একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল নিঃশর্তভাবে Partnership চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে তখন Akchura Oglu-এর রুশ-মুসলিম মৈত্রী চুক্তির স্বপ্ন চিরতরে খান খান হয়ে ভেঙে যায়।

রুশ সাম্রাজ্যবাদের Persecution, Genocide এবং Conversion to Christianity-এর ইতিহাস Volga Urals অঞ্চলের তাতার মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার এক জঘন্য ইতিহাস। মানবতার বিরুদ্ধে রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের আচরণ কতো নিষ্ঠুর হতে পারে তাতার মুসলমানদের প্রতি তাদের আচরণই তার নির্মম সাক্ষী। রুশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক মধ্য এশিয়ার মুসলিম অঞ্চলের আধিপত্য বিস্তার গোটা মুসলিম বিশ্বের একটি Major economic and Political set-back ছাড়া আর কিছুই নয়। সমগ্র মধ্য এশিয়া, Volga-Urals অঞ্চল, ক্রিমিয়া এবং ককেশীয় অঞ্চলের মুসলমানদের চিরতরে নির্মূল করার জন্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে Tsar Fedor, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে Tsarina Anna এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উনিশ শতাব্দীর শেষার্ধে Nicolas Illminsky-এর শাসনামলে বার বার উদ্যোগ নেয়া হয়। এছাড়াও মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের চিরতরে নির্মূল করার উদ্যোগ লেলিন ও স্ট্যালিনরাও নিয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যারাই ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছে তারাই খোদায়ী গজবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পতন তার সর্বশেষ সাক্ষী। রুশ সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর মধ্য এশিয়ার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে ইসলাম আবার স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এ অঞ্চলের মুসলমানরা আবার ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণযুগে ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাদের এ প্রত্যয়দীপ্ত অপেক্ষার অবসান হোক এবং মধ্য এশিয়ায় নব উত্থিত ইসলামী পুর্নজাগরণ আন্দোলন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক—পৃথিবী আবার প্রত্যক্ষ করুক খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণ শাসন—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ দ্যা মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল নভেম্বর, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার জন্য তাতার মুসলমানরা সংগ্রাম করছে

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বা বর্তমান রুশ ফেডারেশনের একটি অংগ রাষ্ট্র তাতারস্থান। এর অধিবাসীরা ভলগা তাতার বা কাজান তাতার নামেই সমধিক পরিচিত। ভলগা এবং কাজান নদীর মিলন স্থলে তাতার স্থান অবস্থিত। এর আয়তন ৬৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার। তাতারস্থানের লোকসংখ্যা ৩৬,৮০,০০০। এর মধ্যে তাতার ১৮,০০,০০০ ; রুশ ১৫,০০,০০০ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ৩,৮০,০০০। অধিকাংশ তাতাররা সুন্নী মুসলিম।

তাতার মুসলমান প্রধানত ঃ তুরস্কের তিনটি জাতির সমন্বয়ে গঠিত। এরা হলো ঃ

ক. ভলগা বুলগারস (Volga Bulgars) ঃ

এরা সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ভলগা এলাকায় পুনর্বাসিত হয়। ৯২২ সালে এরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

খ. কিপচকস (Kipchaks) ঃ

তুরস্কের যে সকল লোক দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে Volga এলাকায় বসতি স্থাপন করে তারাই Kipchaks নামে পরিচিত।

গ. তাতার (Tatars) ঃ

তুরস্ক থেকে যে সকল উপজাতি Volga এলাকায় এসে বসতিস্থাপন করে তারাই তাতার নামে পরিচিত। মংগোলিয়ার যে সৈন্যবাহিনী প্রথম রাশিয়া আক্রমণ করে তাতাররা সে সেনাবাহিনীরই সদস্য ছিল। তাতার সৈন্যরা চেংগিস খাঁনের বংশধর। তাতার সৈনিকদের মধ্যে তুর্কীদের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। চতুর্দশ শতাব্দীতে মংগোলীয় সৈন্যরা রাশিয়া আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে তারা রাশিয়ার একটি বিরাট অংশ দখল করে তাতারস্থান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন ঘটায়। নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে তাতারদের শাসনকে ইতিহাসে Golden Horde নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে Colden Horde ছিল Turkic Empire।

www.pathagar.com

কিন্তু খুব শীঘ্রই Turkic Empire ছিন্ন ভিন্ন হয়ে কতকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। নতুন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো Crimean Tatar, Khanate, Uzbek ইত্যাদি। তাতার শব্দটি পরবর্তীকালে Turkic People -দের পদবী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরা পরবর্তীতে ভলগা নদীর তীরে নিজেদের নতুন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করে।

১৪৫২ সালে দুর্ধর্ষ ইভান (Ivan) Kazan Khanate অধিকার করে নেয়। ফলে তাতাররা পরাধীন হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে জোর করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়। Catherine the Great -এর শাসনামলে তাতারদের উপর নির্যাতনের মাত্রা কিছুটা কমে আসে। কারণ ক্যাথরিন তার শাসনামলে তাতার বিরোধী অনেক আইন রহিত করেন।

"In middle of the 19th Century, an assimilation policy was also implemented. But this was not enough to repress the "Jadid" (Revival) movement, whose aim was to integrate Islam with modern Aimes."

অর্থ ঃ "উনিশ শতকের মধ্য ভাগে আত্তীকরণ নীতি বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু তা ইসলামকে আধুনিক Aimes এর সাথে সমন্বিত করার ইসলামী জিহাদকে লক্ষে দমন করার জন্যে যথেষ্ট ছিল না।"

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের ফলে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের শুরুতে Kazan ইসলামী চিন্তাবিদদের একটি কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। কিন্তু ১৯১৭ সালে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে তা বলশেভিকদের প্রবল জোয়ারে তলিয়ে যায় এবং ১৯২০ সালে তাতারস্থান সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অংগ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে তাতারদের সংখ্যা ছিল সাত মিলিয়ন। তাতাররা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে আসছে। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের Equal Status দাবী করছে। তারা তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে। কিন্তু গর্বাচেভের শাসনামলে তাদের এ দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়। ইয়েলিৎশিনের শাসনাধীন রুশ ফেডারেশনে তাতাররা ছিল নিঃসংগ-একাকী। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আওয়াজ পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো এখন আর সম্প্রচার করছে না। ফলে তাতারদের আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্ববাসী আজ সম্পূর্ণ নীরব।

www.pathagar.com

১৯৯০ সালের ৩০ আগষ্ট স্বায়ত্বশাসিত তাতারস্থান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু নবগঠিত রুশ ফেডারেশন সদ্য ঘোষিত স্বাধীন তাতারস্থানের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়নি। তাতারস্থান নবগঠিত রুশ ফেডারেশন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। ২১ মার্চ তাতারস্থানে রেফারেনডাম অনুষ্ঠিত হয়। ৬৯.৪% শতাংশ লোক স্বাধীন তাতার স্থানের স্বপক্ষে রায় দেয়।

সাবেক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাই বর্তমানে তাতারস্থানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ১৯৮৮ সালে Tatar Public Center নামে নবগঠিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তাতার স্থানের পূর্ণাংগ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষে চরমপন্থীরা Ittifak Party নামে আরো একটি সংগঠন কায়েম করে। তাতার স্থানের পূর্ণাংগ স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এ সংগঠনটি তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার অংগীকার ঘোষণা করেছে।

তাতারস্থানে রুশ ফেডারেশনের প্রধান প্রধান সামরিক ঘাটি এবং তৈল শোধনাগার রয়েছে। রুশ ফেডারেশনের মোট উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামের ২৬% তাতারস্থান থেকে উত্তোলিত হয়। ফলে তাতার স্থানের পরিবেশ সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত নয়।

তাতার জনগণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত অগ্রগামী। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতারদেরকে Consider করতো। কারণ তাতাররা ১২৩৬ ইং থেকে ১৫৩৬ ইং পর্যন্ত মোট ৩০০ বছর রাশিয়ার উপর কর্তৃত্ব করেছিল। কিন্তু আজ সে বীর তাতাররা রাশিয়ার পদানত। যে কোনো সময় তারা আবার রাশিয়াকে পদানত করে তাঁদের কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারে এ আংশকায় রুশ সরকার সর্বদাই তাতারদের Consider করে আসছে।

বিগত কয়েক বছর থেকে তাতারদের সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তাতাররা নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণ করছে এবং তাতার ভাষায় দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করছে। তাতার বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন যে, তাতারদের পূর্ণাংগ স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন বিপদমুক্ত হতে পারে না। তাই তারা পূর্ণাংগ স্বাধীনতার লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টা সফল হোক—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ ১. দ্যা মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, (মক্কা) নভেম্বর, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

বুরুন্ডিতে ইসলাম ও মুসলমান ঃ একটি সমীক্ষা

অন্ধকার মহাদেশ বলে খ্যাত আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বুরুন্ডি। কবে কখন বুরুণ্ডিতে ইসলামের আগমন ঘটেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ইতিহাসের সচেতন পাঠক মাত্রই জানে যে, মানবতার প্রিয়তম বন্ধু, একটি পূর্ণাংগ সামাজিক বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ই হযরত ওসমান (রা)-এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দল আজকের আফ্রিকার ইথিওপিয়া বলে পরিচিত সেদিনের খৃস্টান দেশ হাবশায় হিজরত করেছিলেন। এঁদেরই উত্তর পুরুষদের তৎপরতায় কোনো এক সোনালী মূর্হূতে বুরুন্ডিতে ইসলামের আগমন ঘটে।

বুরুন্ডি ২৮,০০০ বর্গ কিলোমিটারের একটি ক্ষুদ্র দেশ। এর উত্তরে রুয়ান্ডা, পশ্চিমে জায়ারে এবং পূর্বে তানজানিয়া অবস্থিত। সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটির লোক সংখ্যা প্রায় ৫-৬ মিলিয়ন। আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় ঘনবসতি রাষ্ট্র বুরুন্ডি। বুরুন্ডি পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব রাষ্ট্র।

কফি দেশটির প্রধান অর্থকরী ফসল। কফি রপ্তানি করে ৯০% ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। বুরুন্ডি একটি কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের অস্তিত্ব কৃষিজাত ফসলের উপরই নির্ভরশীল। উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—তুলা, চা, কফি, পশু পালন ইত্যাদি। সামান্য পরিমাণ খনিজ সম্পদও দেশটিতে রয়েছে। জনগণ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নিকেল, কার্বন ও ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী তৈরির কাজে নিয়োজিত রয়েছে। দেশে তেল অনুসন্ধানের কাজ চলছে। তেলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। তেলপ্রাপ্তির পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বুরুন্ডির আবহাওয়া সাধারণত মাঝারী ধরনের তবে গ্রীষ্মকালে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দু ঋতুতে (অক্টোবর-ডিসেম্বর এবং মার্চ-জুন) সেখানে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। দেশের Bujumbura zoneটি অত্যন্ত গরম কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা বেশি বিধায় এ অঞ্চলের তাপমাত্রা ১৭-২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করে। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০০ থেকে ১৫০০ মি. মি.।

www.pathagar.com

জনসংখ্যা

এখানে কয়েকটি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এদের মধ্যে হুতুদের (Hutu Tribe) সংখ্যা ৮৫% ভাগ। হুতুরাই বুরুন্ডির আদিবাসী বলে পরিচিত। তুতসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১৪% ভাগ। এরা বুরুন্ডির অভিজাত অধিবাসী বলে পরিচিত। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘকায় লোকদের অস্তিত্ব তুতসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। বুরুন্ডির সর্বময় শাসনক্ষমতা এরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ১৬ শতকের শুরুতে এরা সুদান, ইথিওপিয়া এবং সোমালিয়া থেকে Immigrante হয়ে আসে। এরা আদি Nilotic Tribes এর লোক। অবশিষ্ট ১% ভাগ Twa Tribe-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এরা খর্বাকৃতির লোক।

হুতু এবং তুতসী সম্প্রদায়ের লোকেরা Kirundi ভাষায় কথা বলে। এছাড়াও প্রতিবেশী রাষ্ট্র রুয়ান্ডার জাতীয় ভাষা Kinyar wandaও হুতুদের আর একটি ভাষা। বুরুন্ডির সংস্কৃতি এবং ভাষা বিজ্ঞানের মধ্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ফ্রান্স ভাষা সাধারণভাবে সবারই সহজবোধ্য এবং এ ভাষাই সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সোয়াহিলী (Swahili) ভাষা মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা এবং এ ভাষা কমার্শিয়াল কাজে ব্যবহৃত হয়।

দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ১৫০ জন। শতকরা ৯৫ জন লোক কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—আলু, কলা, শিম ইত্যাদি। বাণিজ্যিক উৎপাদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—কফি, চা, তুলা ইত্যাদি।

১৯৬২ সালে বুরুন্ডি স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকেই হুতু ও তুতসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসে। এ দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৬৫, ১৯৭২ এবং ১৯৮৮ সালে। বর্তমানে এ দু' সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মানবতা আজ সেখানে বিপন্ন। দিনে দিনে সেখানে উদ্বাস্তুদের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। রোগে শোকে আর অনাহারে মানুষ মৃত্যুর সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। বিশ্ববাসী তাকিয়ে আছে এ আত্মঘাতি ঘটনা প্রবাহের দিকে। মানবতা ও মনুষত্ব সেখানে উপহাসের পাত্র। এর শেষ কোথায় ? কে দেবে এর সদুত্তর ?

www.pathagar.com

মুসলমানদের অবস্থা

বুরুন্ডিতে মুসলমানের সংখ্যা দু' মিলিয়ন। মোট জনসংখ্যার ২৫% মুসলমান। এর মধ্যে হুতু ২৩%, তুতসী ১.১৪% এবং অবশিষ্টরা Twa Tribe এর অন্তর্ভুক্ত। এ তিনটি সম্প্রদায়ের ধর্মান্তরিত লোকেরা নিজেদেরকে Waswahhi Community-এর সদস্য বলে বিবেচনা করে। ধর্মান্তরিত মুসলমানরা Kiswahi ভাষায় কথা বলে। একই ভাষায় কথা বলার কারণে দাওয়াহ্ কাজে তাদেরকে কোনো প্রকার জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না।

অভিবাসনকৃত মুসলমানদের মধ্যে ৩,৫০,০০০ আরব ১,৫০,০০০ পাঁচমিশালী জাতি যেমন—জায়ার থেকে—৫০,০০০, রুয়ান্ডা থেকে ৬,৫০০, উগান্ডা থেকে ৩,০০০, তানজানিয়া থেকে ১২,০০০, ভারত থেকে ৪৫,০০০ এবং অবশিষ্টরা সেনেগাল ও ম্যালিয়ান মুসলমান।

মুসলিম অভিবাসীরা দেশের বড় বড় প্রদেশসমূহের নয়টি প্রধান শহরে বসবাস করছে। এ সমস্ত শহরগুলো Bujumbura, Gitega, Ngozi, Muramvya, Muyinga, Bubanza, Bururi, Rumonge এবং Ruyigi। আরব বিশ্ব এবং ভারত থেকে আগত মুসলমানরা এ সমস্ত শহরগুলো ছাড়াও দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সারা দেশেই আরব ও ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

মুসলমানরা সাধারণত তাদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তারা তাদের স্বজাতি থেকেও অনেকটা বিচ্ছিন্ন। অধিকাংশ মুসলমান অশিক্ষিত এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তারা সক্রিয় নয়। জাতীয় কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানরা পশ্চাৎপদ। Bujumbura state University-তে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৫-১০ জন। সারা দেশে ১ মিলিয়নের অধিক গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে মুসলিম গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা মাত্র ৬ জন। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদে শতকরা ১ জনেরও কম মুসলমান নিয়োজিত রয়েছে। এভাবেই বুরুন্ডির মুসলমানরা সেদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সামরিক শক্তি থেকে বঞ্চিত রয়েছে। বুরুন্ডির চলমান ইতিহাসে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকলেও মুসলিম জাতি হিসেবে তারা আজও শক্তিহীন। শক্তিহীন জাতি কখনও নিজেদের অস্তিত্ব দাবী করতে পারে না। তাই বলা যায়, বুরুণ্ডির দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী নিজেদের শক্তিহীনতার কারণে আজ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। বুরুন্ডির পিছিয়ে

www.pathagar.com

পড়া এ অসহায় মুসলিম জনগোষ্ঠিকে বুরুন্ডির মূল স্রোতধারায় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একজন তারিক বা মূসার আবির্ভাব এখন সময়ের দাবী ।

বুরুন্ডিতে ইসলামের আগমন

১৮৯৫ সালে পর্তুগীজ দস্যুরা যখন পূর্ব আফ্রিকান ইসলামী রাষ্ট্র মোম্বাসা (Mombasa) ও জানজিবার (Zanjibar) আক্রমণ করে তা দখল করে নেয় তখন এ সমস্ত মুসলিম দেশের ভাগ্যহত নির্বাসিত মুসলমানরা বুরুন্ডিতে এসে আশ্রয় নেয়। তাছাড়া একই সময়ে অনেক আরব মুসলমান বুরুন্ডিতে অভিবাসী (Immigrants) হিসেবে আগমন করে। অভিবাসী আরব মুসলমানদের মধ্যে Abadia এবং Haddarima গোত্রের লোকসহ নিগ্রো মুসলমানরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ১৯ শতকের শেষার্ধে এবং ২০ শতকের শুরুতে অনেক অভিবাসী মুসলমান বুরুন্ডিতে আগমন করে। এ সময় এক উপনিবেশ থেকে অন্য উপনিবেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ ছিল। এ সময়ে Tanganyika মুসলমানরা Usumbura (বর্তমান নাম—Bujumbura)-তে এসে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে তারা সেন্ট্রাল প্রদেশের Rumonge এবং Gitega অঞ্চলসহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সাথে অভিবাসী মুসলমানদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে স্বদেশজাত নতুন একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এ সময় আরব ও নিগ্রো মুসলমানদের একটি অংশও কংগো (জায়ার) থেকে বুরুন্ডিতে আগমন করে। Col. Jaekques-এর নেতৃত্বাধীন খৃস্টান আর্মীর নির্যাতনের শিকার হয়ে কংগোর মুসলমানরা বুরুন্ডিতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

আরব ও ভারত থেকে সর্বশেষ যে গ্রুপটি বুরুন্ডিতে আগমন করে তারা ছিল কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোক। কাদিয়ানীরা সোয়াহেলী ভাষায় বুরুন্ডিতে ইসলাম প্রচার করে। স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সাথে অভিবাসী মুসলমানদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও বুরুন্ডিতে ইসলাম প্রচার ও প্রসার আশানুরূপ হয়নি। ফলে মুসলমানরা বুরুন্ডিতে আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তি হিসেবে আজো নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও বুরুন্ডির মুসলমানরা সনাতন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছে।

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইসলাম

ঔপনিবেশিক শাসনামলে গীর্জাগুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পরিচালিত হতো। গীর্জার মাধ্যমে খৃস্টান পাদ্রীরা শহরতলীতে ব্যাপকভাবে খৃস্টধর্ম প্রচার করে। ফলে বুরুণ্ডিতে দ্রুত খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে স্বদেশজাত একটি খৃস্টান সমাজ বিনির্মাণের লক্ষে মিশনারীজ সোসাইটি ও গীর্জাসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। এ সমস্ত সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে খৃস্টানরা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এ প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে খৃস্টান সোসাইটি ও গীর্জাগুলো স্থানীয় লোকদেরকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করে। ফলে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একটি স্বদেশজাত খৃস্টান শ্রেণীর উন্মেষ ঘটে।

অপরদিকে মুসলমানরা বুরুণ্ডির প্রধান প্রধান শহর ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতে বসবাস করার কারণে এ সমস্ত এলাকার এলিট শ্রেণী মুসলমানদের সাহচর্যে আসে এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এতে স্থানীয় লোকেরা মুসলমানদের ভাষা সোয়াহেলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায় এবং সারাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। বুরুন্ডিতে খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের এক শতাব্দী পূর্বেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। কিন্তু ইসলামী দাওয়াহ্ কাজের কোনো পরিকল্পিত উদ্যোগ না থাকার কারণে খৃস্টান মিশনারীদের পরিকল্পিত তৎপরতার মোকাবেলায় ইসলামী দাওয়াহ্ কাজের সম্প্রসারণ অনেকটা স্থবির হয়ে পড়ে। ইসলাম প্রচারের এ স্থবিরতার পাশাপাশি খৃস্টান মিশনারীদের পরিকল্পিত কার্যক্রম ধর্মান্তরিত মুসলমানদেরকে আবার পূর্বধর্মে দিক্ষীত হবার জন্য উৎসাহিত করে। মিশনারীদের এ উদ্যোগের ফলে অনেক নওমুসলিম আবার পূর্বধর্মে ফিরে যায়। নওমুসলিমদেরকে পূর্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক উত্তর শাসকদের পলিসিই বহুলাংশে দায়ী।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে বুরুন্ডিতে দু' ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর ছিল। যেমন—

প্রথমতঃ সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় সাদা বর্ণের শিশু এবং গোত্র প্রধানদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ মিশনারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে সাধারণ লোকদের ছেলেমেয়েরা এবং তুতসী, হুতু খৃস্টান এবং তাওয়া গোত্রের ছেলেমেয়েরাও পড়াশোনার সুযোগ লাভ করে।

মুসলমানরা দরিদ্রতার কারণে স্ব উদ্যোগে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ফলে তাদের সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এ বঞ্চনার হাত থেকে মুসলিম শিশুদের রক্ষার ছদ্মাবরণে খৃস্টান মিশনারীরা দুটি বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে মুসলিম পিতা-মাতার নিকট হাজির হয়। তা হলো ঃ

প্রথমতঃ মুসলিম শিশুদেরকে মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা এবং এ শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদেরকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টায় বাধা না দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ খৃস্টধর্মে সরাসরি দীক্ষিত না করে পশ্চিমী জীবনযাত্রায় তাদেরকে অভ্যস্ত করে তোলা।

এ দুটি বিকল্পের একটির সাথেও মুসলিম পিতামাতারা একমত হতে না পারায় তারা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠানো থেকে বিরত থাকে। এভাবেই সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিম শিশুদেরকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে তাদেরকে পশ্চাৎপদ জাতি হিসেবে বেড়ে উঠতে বাধ্য করা হয়।

মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। বিধর্মীদের শিক্ষাব্যবস্থা ভবিষ্যতে মুসলিম শিশুদের আদর্শচ্যুতি ঘটাতে পারে এ আশংকায় অনেক মুসলিম পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পরিকল্পিত ভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বুরুন্ডির প্রচলিত আইন অনুযায়ী সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় শিক্ষিত না হলে কেউ ক্যাডার সার্ভিসে যোগদান করতে পারে না। অবশ্য মুসলমানদেরকে ক্যাডার সার্ভিস থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যই এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন মানবতা ও মনুষত্বের বিরুদ্ধে একটি ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র বলে সুধিজন মনে করেন।

বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিক শাসনামলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করা হয়। এ সময় বেলজিয়ামের উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী খৃস্টান প্রধান এলাকাসমূহে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ফলে খৃস্টান

ধর্মাবলম্বীদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও তারা সমৃদ্ধি অর্জন করে। অপরদিকে মুসলমানরা দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে। শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে বুরুন্ডির মুসলমানরা দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনীতি, সরকারী চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তাদের এ বঞ্চনার শেষ কোথায় তা কেউ বলতে পারে না।

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বুরুন্ডির মুসলমানরা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকলেও সেখানে ধীরগতিতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ চলছে। গ্রামীণ এলাকায় মুসলমানদের স্ব উদ্যোগে কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সমস্ত দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে বুরুন্ডিতে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। এ নিবুনিবু আলো স্ববেগে প্রোজ্জলিত হয়ে উঠুক, আলোকিত করুক বুরুন্ডির সকল জনপদ এবং বুরুণ্ডির নির্যাতিত মুসলমানরা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মুসলিম এবং উপজাতি দ্বন্দ্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকার দেশগুলো স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে। পঞ্চাশের দশকে এ আন্দোলনের ঢেউ বুরুন্ডিতে এসে পৌঁছে। হুতু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীনতা আন্দোলন শুরুর উষালগ্নেই প্রতিবেশী রুয়ান্ডার সহযোগিতায় বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিক সরকার বুরুন্ডিতে এককভাবে হুতু সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা সরকার গঠন করে। ফলে তুতসী ও মুসলমানরা স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকেই ক্ষমতার নাগালের বাইরে থেকে যায়।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বুরুন্ডিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন বুরুণ্ডির স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তোলে। নির্বাচনে তুতসী সম্প্রদায়ের নেতা Prince Rwagasore-এর নেতৃত্বাধীন Uprona party বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। হুতু, তুতসী এবং সোয়াহেলী মুসলমানরা Prince Rwagasore-এর নেতৃত্বাধীন Uprona Party-কে বিজয়ী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। যে সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ নির্বাচনে Prince Pwagasore-কে বিজয়ী করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে

www.pathagar.com

অন্যতম হলেন, Salum Bichuka, Mussa Magabanya এবং Abdullah Rajabee Rwicaruhose.

স্বাধীনতা লাভের পর Prince Rwagasore সরকার গঠন করেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠকও নেতা জনাব Salum Bicuka-কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সরকার গঠনের এক মাসের মাথায় প্রধানমন্ত্রী তুতসী বিদ্রোহীদের ভাড়া করা ঘাতকের হাতে গুপ্ত হত্যার শিকার হন। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিহত হবার পর মুসলিম নেতৃবৃন্দ Uprona Partyতে এবং স্থানীয় সরকার পরিচালনায় কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিহত হবার পর Uprona party মধ্যপন্থী Monrovia এবং চরমপন্থী Casablanca উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে দেশে জাতিগত বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। এ জাতিগত বিরোধ হুতু ও তুতসী এবং খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরোধিতার কারণ হলো বুরুন্ডির স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানরা Uprona party-কে সমর্থন করে এবং দেশ স্বাধীন হবার পর তারা সরকার গঠনে Uprona party-কে সহযোগিতা করে। চরম মুসলিম বিদ্বেষী PDC (Party Democratic uechretien) জাতিগত বিরোধের এ সুযোগে বুরুন্ডি থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। PDC মুসলিম ও আরব বিরোধী একটি চরম রাজনৈতিক দল। কিন্তু তারা Bezi family-এর রাজত্ব বা শাসনকে খুব ভয় করতো। এ সময় Bezi family রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোদমে ব্যবহার করে শাসনকার্য পরিচালনা করতো। Bezi family-এর শাসনকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য Abanyarguru এবং Hima নামক দুটি তুতসী উপদল Bezi family-এর সাথে হুতু সম্প্রদায় ও মুসলমানদের সম্পর্কে চিড় ধরানোর কাজে আত্মনিয়োগ করে। কারণ স্বাধীনতা লাভের পর King Mwambutsa-iv পর পর দু'জন প্রধানমন্ত্রী হুতু উপজাতি থেকে নিয়োগ করেন। King Mwambutsa-iv ১৯২৫ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং গোপনে ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন মানার চেষ্টা করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মূসা নাম ধারণ করেন। হুতুদের মধ্য থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী দু'জনও ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। তারা হলেন Pierre Ngendanumwe এবং Joseph Bamina।

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে হুতু ও তুতসীদের মধ্যে মারাত্মক জাতিগত সংঘাত শুরু হয়। এ সংঘাতে তুতসীদেরকে বুরুন্ডি থেকে চিরতরে উচ্ছেদের জন্য হুতুরা মরণপণ সংগ্রাম শুরু করে। হুতুরা প্রতিজ্ঞা করে তারা সকল তুতসী পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করবে। তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা দাবানলের মত জ্বলে উঠে। দেশের সর্বত্রই মানুষ হত্যার এক উদগ্র প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সর্বত্রই চলে রক্তের হোলি খেলার মহোৎসব।

তুতসী বিদ্রোহীরা সকল হুতু পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করে গুলি করে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডে ৮৬ জন হুতু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হয় এবং ১৫০০ জনেরও অধিক হুতু ও তুতসী মুসলমান এ জাতিগত দাংগায় নির্মমভাবে নিহত হয়। অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড তুতসী প্রধান এলাকায় সংঘটিত হয়। King Mwambutsa (Mussa) দেশের আইন শৃংখলার ক্রমাবনতিতে দেশত্যাগ করেন এবং সুইজারলান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুতু ও তুতসীদের মানুষ হত্যার এ মরণখেলা ইতিহাসের হালাকু খান, চেঙ্গিস খান আর হিটলারদের নিষ্ঠুরতাকেই আর একবার বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে।

বুরুন্ডির পার্লামেন্টে হুতুদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। হুতুরাই দেশ শাসন করতো। কিন্তু রাজার দেশত্যাগের পর তরুণ রাজা Charles Ndizeye -কে হুতু প্রধান পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়ার জন্য সেনা কর্মকর্তা Capt. Micombero অনুরোধ করেন। Capt. Micombero তুতসী সম্প্রদায়ের লোক। পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে একজন তুতসী নেতাকে দেশের প্রশাসক নিয়োগ করার জন্যও সেনাকর্মকর্তা রাজাকে পরামর্শ দেন। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে Capt. Micombero সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করেন। তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেন এবং রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করেন। শাসনকার্যে তাকে সহায়তা করার জন্য তিনি সারা দেশে আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক নিয়োগ করেন। সামরিক প্রশাসকদের সহযোগিতায় Capt. Micombero দেশ শাসন করেন।

১৯৭২ সালে হুতু বিদ্রোহীরা Capt. Micombero-এর শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তুতসীদের শাসন অবসানের লক্ষে ব্যাপক ভিত্তিক আন্দোলন শুরু করে। Capt. Micombero-এর শাসনামলে হুতুদেরকে প্রশাসন যন্ত্রের সকল স্তর থেকে উচ্ছেদ করা হয় এবং হুতু নেতৃবৃন্দকে

www.pathagar.com

জোরপূর্বক নির্বাসন দেয়া হয়। Capt. Micombero-এর ক্ষমতাচ্যুতির আন্দোলনে হুতুদের হাতে অনেক তুতসী নিহত হয়। আন্দোলন যখন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে তখন Capt. Micombero-এর সৈনিকরা প্রতিহিংসায় মেতে ওঠে। তারা প্রশাসন এবং সেনাবাহিনী থেকে হুতুদের নির্মূল শুরু করে এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হুতুরা এ সময় মারমুখী হয়ে ওঠে। তারা নির্বিচারে তুতসীদের যত্রতত্র হত্যা করে। বহু তুতসী এ সংঘর্ষে নিহত হয়।

Capt. Micombero-এর সেনা সদস্যরা এ সময় বাছাইকৃত হুতু নেতৃবৃন্দকে ধরে ধরে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ জঘন্য গণহত্যাকাণ্ডে হাজার হাজার হুতু মুসলমান নিহত হয়। নিহতদের তালিকায় হুতু মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Ameer Hassan, Shabami Merry, Rajabee Almassi, Amisi Marongo, Zaidi Naongoro অন্যতম। অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ নির্যাতনের শিকার হয়ে পার্শ্ববর্তী জায়ারে, তানজানিয়া, রুয়ান্ডাসহ অন্যান্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁরা শরণার্থী ক্যাম্পে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসের শেষার্ধে Maragna জেলায় হুতু সম্প্রদায়ের লোকেরা আকস্মিকভাবে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে ওঠে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুতসী সেনাবাহিনীর হাতে শুধুমাত্র Maragna জেলায়ই ১০ হাজারের অধিক হুতু নিহত হয় এবং ২০ হাজারের অধিক পার্শ্ববর্তী রুয়ান্ডায় পালিয়ে যায়। নিহতদের অধিকাংশই মুসলমান। এ নির্মম গণহত্যা আফ্রিকার জনগণকে স্তম্ভিত করে দেয়। তারা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তুতসীদের এ মরণ খেলার দিকে। শুধু Maranga জেলাই নয় অন্যান্য বড় বড় জেলা শহরগুলোতেও যাতে হুতুদের প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে না পারে সে জন্য হুতু নেতৃবৃন্দকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। হুতুদেরকে নেতৃত্ব শূন্য করাই ছিল তুতসীদের লক্ষ।

দেশের এ কঠিন মুহূর্তে ভবিষ্যতে আরো হত্যাকাণ্ড রোধ করার লক্ষে একজন হুতু নেতাকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হয়। নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে। মন্ত্রীসভায় ১১ জন হুতুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ১১ জনের মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র ১ জন। তাকে কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট Buyoya পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার

www.pathagar.com

পর এ মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। তার পুনরায় ক্ষমতারোহণের পেছনে ক্যাথলিক চার্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসের শেষার্ধে প্রেসিডেন্ট Maj. Buyoya দেশে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান জারী করেন। প্রেসিডেন্ট Maj. Buyoya ৪৪ বছর বয়স্ক একজন তুতসী নেতা। বুরুন্ডির রাজনৈতিক আকাশে সর্বদা মুসলিম বিরোধী আবহাওয়া বিরাজ করছে। স্বাধীনতার পর থেকে হুতু অথবা তুতসী যারাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তারা সবাই তাদের শাসনামলে মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী ভূমিকাই পালন করেছে। Milcombero-এর শাসনামলে ১৯৬৮ সালে মুসলমানরা যখন তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হয় তখন সরকার অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গের মিথ্যা অজুহাতে মুসলমানদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রামরত দুটি দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দল দুটি হলো—

১. Burundian Muslims organization
২. Congolese Muslims Associstion

১৯৭৬ সালে Micombero-কে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে কমিউনিস্ট শাসন জারী করা হয়। সমাজতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এসেই মুসলমানদের অপর একটি সংগঠন Supreme Council for Islamic Affairs of Burundi-কে বেআইনী ঘোষণা করে। দলটির প্রধান নেতা মুহাম্মাদ আহমদ শরীফকে দেশ থেকে নির্বাসন দেয়া হয় এবং তার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। সমাজতান্ত্রিক সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশ থেকে মুসলিম উচ্ছেদের অভিযান শুরু করে। এ উচ্ছেদ অভিযানের অংশ হিসেবে ১৯৭৯ সালে বুরুন্ডি থেকে Zairean Muslims-দেরকে বিদ্রোহীদের সহযোগিতার কথিত অভিযোগে নির্বাসন দেয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক শাসনামলে দুর্নীতি, আঞ্চলিকতার দ্বন্দ্ব, গোত্রীয় দ্বন্দ্ব এবং অন্যায় ও অবিচারে দেশটি ছেয়ে যায়। এ সময় ধর্মীয় সংঘাত অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে। সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত জঘন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

ক. আযান দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়।

খ. ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়।

গ. বিনা বিচারে অনেক মুসলিম যুবককে নির্মম নির্যাতনের পর গুলি করে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

ঘ. জুমার নামাজকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

ঙ. মুসলিম নাম পরিবর্তনে শক্তি প্রয়োগ করা হয়।

১৯৯২ সালে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষে দেশে একটি নতুন সংবিধান জারী করা হয়। সংবিধান অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ক্যাথলিক খৃষ্টানরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলে পার্লামেন্টে এবং কেবিনেটে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার কোনো সুযোগ রইলো না। প্রাক্তন মুসলিম কেবিনেট মন্ত্রী Jumaine Hussain-কে রাষ্ট্রদূত করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

বুরুন্ডির মোট লোক সংখ্যা ৬ মিলিয়ন, এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৩ মিলিয়ন, অথচ স্বাধীনতা অর্জনের ৩৫ বছর পর মুসলমানদেরকে সীমিত পরিসরে সরকারী ও বেসরকারী সেক্টরে অংশ গ্রহণের সুয়োগ দেয়া হয়। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর্যন্ত মুসলমানরা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ৩৫ বছর পর্যন্ত মুসলমানরা সরকারী সুযোগ থেকেও বঞ্চিত থাকায় তাদের সন্তানরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। ফলে মুসলিম যুবকরা একটি পশ্চাৎপদ জাতি হিসেবেই বেড়ে ওঠে। ৩৫ বছর পর সরকারী ও বেসরকারী সেক্টরে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেও অশিক্ষা ও অদক্ষতার কারণে সে সীমিত সুযোগ ব্যবহারেও তারা অপারগ হয়ে পড়ে। কারণ বুরুন্ডির মুসলমানদের দুর্ভাগ্য হলো ১৯৮০-১৯৮৭ ইং পর্যন্ত সামরিক জান্তার নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজতান্ত্রিক শাসন এবং ১৯৮৭ ইং ১৯৯৩ ইং পর্যন্ত সামরিক জান্তার নিয়ন্ত্রণাধীন খৃষ্টান শাসন মুসলমানদেরকে সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখে। অথচ এ সময়ে সরকারগুলো মুসলমানদের ব্যবহার করেছে নিরেট টিস্যু পেপারের মতই—কি নির্মম পরিহাস।

১৯৯৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার গঠন করা হয়। নতুন সরকার মুসলমানদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তার সমাধান সরকারের নিকট পেশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। একজন হুতু মুসলমানকে কমিটির প্রধান করা হয়। মুসলমানদেরকে দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। তাদেরকে প্রথমতঃ তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ সর্বস্তরে ইসলামী দাওয়াহ কাজ শুরু করতে হবে। আগামী দিনের বুরুন্ডিতে মুসলমানদেরকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হলে সতর্কতার সাথে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা এখন সময়ের দাবী ঃ

www.pathagar.com

ক. সর্বস্তরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা।

খ. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করা।

গ. অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।

ঘ. দেশে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করা।

ঙ. নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

চ. হুতু এবং তুতসীদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা।

ছ. নিজেদের মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের লক্ষে নতুন নতুন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।

জ. সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের উন্নয়নের লক্ষে নিজেদের সম্পদ ও সুযোগকে কাজে লাগানো।

ঝ. ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে ব্যাপকভিত্তিক দাওয়াতী কাজ শুরু করা।

বুরুন্ডির নির্যাতিত ও নিপড়িত মুসলমানদেরকে আগামী দিনের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে উপরোক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষমতারোহণের করিডোর সৃষ্টি করতে হবে। এ করিডোর সৃষ্টি যত তাড়াতাড়ি হবে ততই তাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

আমরা বুরুন্ডির নির্যাতিত ও নিগৃহীত মুসলমানদের সোনালী ভবিষ্যত প্রত্যক্ষ করার প্রতীক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), জানুয়ারী, ১৯৯৭।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (বাংলাদেশ) অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

মুজাম্বিকে ইসলাম ও মুসলমান

মুজাম্বিক অন্ধকার মহাদেশ বলে খ্যাত আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ। ৫৫টি দেশ সমন্বয়ে এ মহাদেশ গঠিত। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন ১,১৬,৯৯,০০০ বর্গ মাইল। আফ্রিকা স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি মহাবীর তারেকের স্মৃতি বিজড়িত "জাবালুততারিক" তথা সংকীর্ণ জিব্রাল্টার প্রণালী দ্বারা ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন।

আফ্রিকার দেশসমূহকে মুসলিম জনসংখ্যা ও কর্তৃত্বের দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

১. যে সকল দেশে মুসলমানদের সংখ্যা ৯০% এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত।

২. যে সকল দেশে মুসলমানদের সংখ্যা ৬০% কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা খৃস্টানদের হাতে ন্যস্ত।

৩. যেসব দেশে মুসলমানদের সংখ্যা ৬৫% কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা খৃস্টান প্রভাবিত নাস্তিক্যবাদী অমুসলিমদের হাতে ন্যস্ত।

মুজাম্বিক দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত একটি দেশ।

মুজাম্বিক আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত।

মুজাম্বিকের উত্তরে তানজানিয়া, পশ্চিম মালাভী, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে এবং ট্রান্সভাল প্রভিন্স, দক্ষিণে ন্যাটাল প্রভিন্স অব সাউথ আফ্রিকা এবং সোয়াজিল্যান্ড অবস্থিত। দেশটিতে অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে। বেশির ভাগ দ্বীপ দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। এ সমস্ত দ্বীপে বসবাসকারীদের মধ্যে ৯০% মুসলমান। দেশটি এগারটি প্রদেশে বিভক্ত। এর মধ্যে Niassa এবং Zambezia প্রদেশে মুসলমানরা অত্যন্ত শক্তিশালী। Niassa Lake দেশটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। দেশের উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলে লোকবসতি তুলনামূলকভাবে বেশি। এ সমস্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতেই মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান। প্রদেশভিত্তিক মুসলমানদের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

www.pathagar.com

ক্র নং	প্রদেশের নাম	মুসলমানের সংখ্যা
১.	নিয়াসা (Niassa)	৮০% - ৯০%
২.	ক্যাবোডেলগোদু (Cabo Delgodo)	৭৫% - ৮০%
৩.	নাম্পূলা (Nampula)	৮০% - ৯০%
৪.	জাম্বেজিয়া (Zambezia)	৭০% - ৭৫%
৫.	অন্যান্য প্রদেশসমূহ	১০% - ২০%

বর্তমানে মুজাম্বিকের লোক সংখ্যা ১৭ মিলিয়ন। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৪০%–৬০%। বর্তমানে সারাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৬ মিলিয়ন। আশির দশকের গোড়ার দিকে দেশটিতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪ লাখ।

ঔপনিবেশিক শাসনামলের পূর্বে মুসলমানরা মুজাম্বিক শাসন করতো। এ সময় দেশে মাদরাসা ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। মাদরাসা শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবেশি রাষ্ট্র জানজিবার এবং তানজানিয়ায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত। কারণ সে সময় দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ঊনিশ শতকে মুজাম্বিকে পতুর্গীজ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয়। পতুর্গীজ ঔপনিবেশিক শাসকরা মুজাম্বিক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করে। এক হাতে অস্ত্র এবং অপর হাতে বাইবেল নিয়ে খৃস্টানরা এ সময় দেশব্যাপী অভিযান শুরু করে। পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসকদের এ ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মুসলমানরা রুখে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বের মুসলিম শাসকরা এ প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দেয়। তাঁদের ডাকে সাড়া দেয় ইমাম, মুবাল্লিগ শায়িখগণসহ ও সর্বস্তরের ইসলামী নেতৃবৃন্দ।

ঔপনিবেশিক শাসকরা মুজাম্বিকে খৃস্টান ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষে সারা দেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কোমলমতি শিশুদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে পাদ্রীদের নিয়োগ দেয়া হয়। তারা পাঠদানের মধ্যদিয়ে কৌশলে খৃস্টধর্ম প্রচার শুরু করে। একাজে খৃস্টান মিশনারীরা তাদেরকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। পাদ্রী ও মিশনারীদের

www.pathagar.com

এ তৎপরতার ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে ধর্মান্তরিত খৃস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ পর্তুগীজ শাসকদের শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম শিশুদের পাঠাতে নিরুৎসাহিত করে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামের উপর টিকিয়ে রাখার জন্য মসজিদ ও মাদরাসাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রেখেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মুসলিম শিশুরা কুরআনিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসকরা মুসলমানদেরকে শিক্ষাদীক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য একটি নির্বাহী আদেশ জারী করেছে। এ আদেশের ফলে আগ্রহী মুসলিম শিশুদের জন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এ নির্বাহী আদেশে মুসলিম শিশুদেরকে পর্তুগীজ শাসক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেকুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে মুজাম্বিকে মুসলিম শিশুরা শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে। বর্তমানে মুজাম্বিকের মুসলমানরা শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যথা–

১. সেকুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং

২. সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করা।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিম শিশুদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হলে তথা স্কুলে ভর্তি করাতে চাইলে প্রথমে মুসলিম শিশুদেরকে খৃস্টান চার্চে যেতে হবে এবং সেখানে মুসলিম নাম পরিত্যাগ করে খৃস্টান নাম ধারণ করতে হবে। যারা খৃস্টান নাম ধারণ করবে শুধুমাত্র তারাই সরকার ও খৃস্টান মিশনারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। এভাবেই ঔপনিবেশিক পর্তুগীজ সরকার মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছে। এ অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট মুসলিম নেতা এবং মুজাম্বিক পার্লামেন্ট সদস্য জনাব আবদুল খালেক বলেন ঃ

"That's why we will find many people in the northern part of the country who are in fact Muslims but have no Muslim names."

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "একারণে দেশের উত্তরাঞ্চলে আমরা অনেককে দেখতে পাই—যারা কার্যত মুসলমান কিন্তু তাদের নামের মধ্যে মুসলিম পরিচয় নেই।"

দেশের উত্তরাঞ্চলে সরকারের নির্যাতনে বাধ্য হয়ে বহু মুসলমান নিজেদের নাম পরিবর্তন করেছে। তাদেরকে দেখলে এখন আর মুসলমান বলে মনে হয় না যতক্ষণ না তারা নিজেদের সঠিক পরিচয় তুলে ধরেন। সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে বৈষয়িক সাফল্য অর্জন করার জন্যও অনেক মুসলমান তাদের মুসলিম নাম পরিবর্তন করে স্লাভিক নাম ধারণ করেছে। এ সমস্ত মুসলমানরা ঘরের বাইরে স্লাভিক নাম ব্যবহার করলেও পারিবারিক পরিমণ্ডলে ইসলামী নাম ব্যবহার করে আসছে।

১৯৫০ সাল পর্যন্ত পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সরকার কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করে রাখে। ১৯৫০ সালের পরে সীমিত পরিসরে কালোদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। কালো অধীবাসীদের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুজাম্বিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। কিছু কিছু মুজাম্বিক নাগরিক খৃস্টান চার্চে গিয়ে পড়াশুনা করে উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এরা পরবর্তীকালে পাদ্রীদের সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা গমন করে এবং উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে। অনেক মুসলিম যুবক উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য মুসলিম নাম পরিবর্তন করে খৃস্টান চার্চগুলোতে পড়ালেখা করে পাদ্রীদের সহযোগিতায় আমেরিকা গমন করে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ লাভ করেছে। চার্চগুলো মেধাবী ছাত্রদেরকে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এ সমস্ত চার্চের সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষা লাভকারী মেধাবী মুসলিম যুবকরা পরবর্তীকালে স্বকীয় আদর্শিক অবস্থান থেকে অনেক অনেক দূরে সরে যায়। আমেরিকায় শিক্ষা লাভকারী মুজাম্বিক নাগরিকরা দেশে সম্ভ্রান্ত শ্রেণী হিসেবে পরিচিত। এরাই দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মুজাম্বিকের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ এলিট শ্রেণীই নেতৃত্বদান করে।

১৯৬৪ সালে মুজাম্বিকের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে আলজেরিয়া সর্বপ্রথম সহযোগিতার হাত বাড়ায়। এরপর মরক্কো মুজাম্বিকের স্বাধীনতাকামীদের সকল প্রকার সহযোগিতা দান করে। এছাড়াও মিসরসহ অন্যান্য মুসলিম দেশ মুজাম্বিকের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। মুজাম্বিকের মুসলমানরাও স্বাধীনতা আন্দোলনে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা এ আন্দোলনে খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অপর দিকে যেসব মুসলমান স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তারা নিজেদের জাতিগত পরিচয় গোপন রেখে কমিউনিস্টকর্মী হিসেবেই পরিচয় দিতে বেশি পছন্দ করে।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মুজাম্বিক স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে কমিউনিস্টরা সরকার গঠন করে। সরকার গঠন করার পরপরই দেশের সকল শীর্ষ পদগুলো কমিউনিস্টরা দখল করে নেয়। এতে সারা দেশে একটি চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই স্বাধীনতা অর্জনের এক বছর পর ১৯৭৬ সালে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ১৯৯৪ সালে গৃহযুদ্ধের অবসান হলে দেখা যায় যে, দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনামলে কোনো মুসলমানকে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। অবশ্য যে সমস্ত মুসলমান সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তারা নিজেদেরকে কমিউনিস্ট বলেই পরিচয় দিত। এ ব্যাপারে মুজাম্বিক পার্লামেন্টের বর্তমান সদস্য এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ

"In the first cabinet there were three or four Muslim ministers by name. They would not say openly that they were Muslims."

অর্থ ঃ "মুজাম্বিকের প্রথম মন্ত্রী সভায় তিন বা চারজন মুসলমান মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তারা তাদের মুসলিম পরিচয় দিতে পারতো না।"

কমিউনিস্ট শাসনামলে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময় মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে পড়ে। তাদেরকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। বর্তমানে গৃহযুদ্ধের অবসান হয়েছে এবং কমিউনিস্টরা ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে সরে যাবার ফলে মুসলমানরা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সীমিত সুযোগ লাভ করেছে। বর্তমানে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষে দেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দের শিক্ষা আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে পার্লামেন্ট সদস্য জনাব আবদুল খালেক বলেন ঃ

www.pathagar.com

"We have just started to Promote Muslims. we have only one university which was established in 1970, besides three secondary schools in the capital and two or three secondary schools in the central and southern provinces."

অর্থ ঃ "আমরা মুসলমানদের মানোন্নয়নের লক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯৭০ সালে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজধানীতে তিনটি মাধ্যমিক স্কুল এবং কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশে দু বা তিনটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।"

কমিউনিস্ট শাসনাবসানের পর ১৯৯৫ সালে মুজাম্বিকে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পরিবেশে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মুসলমানদের কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। কিন্তু তবুও কয়েকজন মুসলমান এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে সাবেক কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকরাই জয়লাভ করে। তবে তারা বর্তমানে তাদের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি পরিবর্তন করে দেশের চাহিদানুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার কায়েম করেছে। বর্তমান সরকারে ২০ জন মন্ত্রীর মধ্যে মুসলমান মন্ত্রী মাত্র ১ জন এবং প্রতিমন্ত্রী ২ জন। অবশ্য এসব মুসলিম মন্ত্রীরা মন্ত্রীসভায় মুসলিম স্বার্থের স্বপক্ষে কাজ না করে দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিক সক্রিয়। এরা সবাই প্রাক্তন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তবে বিচারমন্ত্রী Jose Ibraimo Abudo নিজের মুসলিম পরিচয় বহন করেই মন্ত্রী সভায় দায়িত্ব পালন করছেন। অবশ্য তার নামটি খৃস্টান ও মুসলিম নামের সমন্বয়ে রাখা হয়েছে। তার নামের প্রথম অংশটি খৃস্টান। বর্তমানে মুজাম্বিকে পার্লামেন্ট সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন। এর মধ্যে মুসলিম সদস্য মাত্র ৫০ জন।

মুজাম্বিকের নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানরা দুটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। সংস্থা দুটি হলো ঃ

১. The Islamic Council of Mozambique
২. The Isamic Congress of Mozambique

১৯৮০ সালের শেষার্ধে The Islamic Council of Mozambique প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থাটি শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মেধাবী মুসলিম ছাত্রদেরকে উচ্চ শিক্ষার জন্য

www.pathagar.com

এ সংস্থাটি ছাত্রবৃত্তি দিয়ে থাকে। এ সংস্থার বৃত্তিপ্রাপ্ত ৫০ জন ছাত্র বর্তমানে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৪৬ জন মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করছে। এছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র বৃত্তি নিয়ে সুদানে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করছে।

African Muslim Agency নামক সুদানভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা বর্তমানে মুজাম্বিকের একটি মুসলিম প্রধান প্রদেশে সামাজিক ও শিক্ষা কার্মক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ সংস্থাটি ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। সংস্থাটির কর্মসূচি বাস্তবায়নে কুয়েত সরকার অর্থ যোগান দিয়ে থাকে বলে জানা গেছে। Munazzamal Al-Dawah নামক সুদানভিত্তিক অপর একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থাও মুজাম্বিকের মুসলিম জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষে শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থাটির শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এবং বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা।

মক্কাভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা রাবেতা আলমে ইসলামী মুজাম্বিকের মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে সহায়তা দানের জন্য দক্ষিণ মুজাম্বিকে রাবেতার একটি শাখা অফিস খুলেছে। রাবেতা আলমে ইসলামীর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ আব্দুল্লাহ বিন ওমর নাসীফ তাঁর দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে মুজাম্বিক সফর করেন। সেসময় তিনি মুজাম্বিকে রাবেতার একটি শাখা খোলার জন্য মুজাম্বিক সরকারকে অনুরোধ করেন। সরকার তার অনুরোধ রক্ষা করে এবং মুজাম্বিকে রাবেতার শাখা অফিস খোলা হয়। বর্তমানে জনাব রহমতুল্লাহ্ নামক একজন ব্যক্তি রাবেতার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মুজাম্বিকে রাবেতা আলমে ইসলামীর চলমান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

১. ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে দাওয়াহ কার্যক্রম।
২. সমাজ সেবার লক্ষে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি।
৩. শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে মাদরাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ।
৪. ছাত্রবৃত্তি ও শিক্ষকদের বেতনভাতা প্রদান করা।
৫. মুবাল্লিগ নিয়োগদান।
৬. আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৭. সুস্বাস্থ্যের লক্ষে চিকিৎসা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

মুসলমানরা নামায আদায়ের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে স্ব উদ্যোগে বহু মসজিদ নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে দেশের রাজধানীতে বড় ধরনের ২০টি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এ সমস্ত মসজিদগুলোতে ইসলাম ও আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের মুসলমানরা কাঠ দ্বারা ছোট ছোট অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছে। এ সমস্ত মসজিদের মেঝেগুলো মাটির তৈরি। এ মসজিদগুলোতে কার্পেটের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ মসজিদগুলো পারিবারিক মসজিদ হিসেবেই পরিচিত। দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী মুসলমানরা স্থানীয়ভাবে অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছে। এ মসজিদগুলো কাঠ ও ছনের তৈরি।

মুজাম্বিকের মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা

কমিউনিস্ট শাসনামলে জাতিগত বিরোধ তথা গৃহযুদ্ধে মুসলমানরা তাদের গৃহ, সম্পদ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হারিয়ে স্বদেশেই উদ্বাস্তু জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। UNHCR-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এ সময়ে ১.৭ মিলিয়ন মুসলমান দেশত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। UNHCR-এর অপর এক রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে ৬,০০০০০ দেশত্যাগী মুসলমান স্বদেশে ফিরে আসে এবং বর্তমানে ৬,৮৪,০০০ স্বদেশে ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে।

শরণার্থী জীবনের অবসান ঘটিয়ে যে সমস্ত দরিদ্র ও অসহায় মুসলমানরা স্বদেশে ফিরে এসেছে তাদের সাহায্যার্থে বহু খৃস্টান এন. জি. ও এগিয়ে এসেছে। এ সমস্ত এন. জি. ও-গুলো সাহায্যের ছদ্মাবরণে বর্তমানে দরিদ্র মুসলিম এলাকাগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাদ্রীরা ছাত্রদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছে। শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে পাদ্রীরা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে খৃস্টধর্ম প্রচার করছে। ফলে আশংকা করা হচ্ছে আজকের শিশুরা আগামী দিনে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত না হলেও চালচলনে তারা খৃস্টান হয়ে যাবে। এভাবেই বেড়ে ওঠা মুসলিম যুবকদেরকে পরিকল্পিতভাবে জাতীয় মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। খৃস্টান এন. জি. ও-গুলোর মুকাবিলায় ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে জেদ্দাভিত্তিক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) সম্প্রতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরাঞ্চলে ৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অর্থ যোগান দিতে সম্মত হয়েছে। একটি দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য শুধু ৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয় বরং সারা দেশের চাহিদানুযায়ী শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয়

www.pathagar.com

এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে আমাদের বিশ্বাস। এভাবেই একটি দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকে যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। আর এ যোগ্য ও দক্ষ লোকগুলো আগামী দিনের ইসলামী মুজাম্বিক প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানরা এখনও আধুনিক সভ্যতার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তারা এখনও আদিম যুগের মানুষের ন্যায় সেকেলে ধরনের জীবন যাপন করছে। Northern Province টি দেশের সর্ববৃহৎ প্রদেশ। এ প্রদেশটি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সম্পদশালী। এখানে স্বর্ণের খনিও আছে। স্বর্ণ উত্তোলনের জন্য কোনো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে না। বরং সেকেলে ধরনের হাতে চালানো উপকরণ ব্যবহার করে স্বর্ণ উত্তোলনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় 'Garing'। এ অঞ্চলে স্বর্ণের খনি ছাড়াও Diamond মওজুদ আছে বলে এলাকাবাসীদের ধারণা। আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে মূল্যবান এ প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন করা হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি এ অঞ্চলের জনগণেরও ভাগ্যোন্নয়ন করা সম্ভব হতো।

কৃষি সম্পদেও মুজাম্বিক একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। দেশের Northern province-এর কৃষি ক্ষেত্রগুলোকে আরো উন্নত ও আধুনিকীকরণ করার লক্ষে সম্প্রতি সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষি বিশেষজ্ঞরা মুজাম্বিকের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং যৌক্তিক সহায়তা দেবে। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার একদল কৃষি বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কৃষক Nothern Province এর Niassaয় আগমন করে। তারা এ অঞ্চলের কৃষি ক্ষেত্রগুলোকে আধুনিকীকরণের লক্ষে কৃষিকাজে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করছে। স্থানীয় কৃষকরা তাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। এভাবেই যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকরা কৃষিকাজের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারবে। Northern Province মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হওয়ার কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষি বিশেষজ্ঞদের সাথে যৌথভাবে কাজ করে স্থানীয় মুসলমানরা কৃষিকাজে দক্ষ হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে তাদের এ

www.pathagar.com

দক্ষতা ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনে ও বিপণনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে পর্যায়ক্রমে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আগামী দিনের মুজাম্বিকের মুসলমানরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদেরকে একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলে আমাদের প্রত্যয় রয়েছে।

মুজাম্বিকের মুসলমানরা স্বাস্থ্যসুবিধা থেকে অনেকটা বঞ্চিত। সরকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুব অবহেলার পরিচয় দিচ্ছে। সম্প্রতি ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক মুজাম্বিকের Northern Province-এ ৩০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই মুজাম্বিক সরকারের সাথে ব্যাংক একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে। ১৯৯২ সালে মুজাম্বিক ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পর্যবেক্ষক সদস্যের মর্যাদা লাভ করে এবং ১৯৯৪ সালে পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে।

মুজাম্বিকের দারিদ্রক্লিষ্ট জনগোষ্ঠিকে সে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মুসলিম দেশসমূহের সরকার, আইডিবি, রাবেতা আলমে ইসলামীসহ সকল আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলোকে নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

সম্ভাব্য কর্মসূচি

১. স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা।

২. মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার এবং পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।

৩. আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু করা।

৪. যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৫. আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ প্রয়োগ করে কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা পালন করা।

৬. শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করার জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প চালু করা।

৭. সুস্বাস্থ্যের জন্য চাহিদানুযায়ী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

৮. ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্যে মুবাল্লিগ নিয়োগ করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে মুজাম্বিকের মুসলিম জনগোষ্ঠী আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাবে

www.pathagar.com

এবং আগামী দিনের মুজাম্বিক ইসলামী মুজাম্বিকে পরিণত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা মুজাম্বিকের মুসলমানদের সেই কাঙ্ক্ষিত সোনালী ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ

১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), জুন, ১৯৯৭।
২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (বাংলাদেশ) অক্টোবর, ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

ক্যারিবীয় অঞ্চলে ইসলাম ও মুসলমান ঃ একটি সংক্ষিপ্ত চালচিত্র

তেরটি দেশের সমন্বয়ে ক্যারিবীয় অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে। ভাষার পার্থক্য অনুযায়ী এ অঞ্চলকে প্রধানতঃ চারটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যেমন–ইংরেজী, ফরাসী, স্প্যানীশ এবং ডাচ ভাষা অনুযায়ী তেরটি দেশকে আলাদা আলাদা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা এ সমস্ত দেশে এসে বসবাস শুরু করে। অধিকাংশ মুসলমান পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে এ অঞ্চলে আগমন করে। পড়াশুনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত মুসলমানদের একটি অংশ স্থায়ীভাবে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে থেকে যায় এবং বসবাস শুরু করে। কালক্রমে এ অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে অনেক মুসলমানও ভাগ্যান্বেষণে এ অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে।

ক্যারিবীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে বাহামায় বসবাসকারী মুসলমানরাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দ্রিক থেকে বেশ শক্তিশালী। অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানরা আর্থিক দিক থেকে খুব সচ্ছল নয়। সংগত কারণেই আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠি রাজনৈতিক দিক দিয়েও পিছিয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের পূর্বশর্ত হলো অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করা। কারণ অর্থনৈতিক শক্তি ছাড়া রাজনৈতিক শক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাহামার মুসলমানরা অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল হওয়ার কারণে তারা দেশে ইসলাম বিরোধী গর্ভপাত, মাদকাশক্তি, পারিবারিক বন্ধন শিথীলতার বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমগুলোতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ক্যারিবীয় অঞ্চলের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাদের ইমাম এবং মুসলিম নেতাদের জন্য স্থায়ী ওয়ার্ক পারমিট না পাওয়া। কারণ অধিকাংশ ক্যারিবীয় দেশের সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন। ইতোমধ্যে ক্যারিবীয় কয়েকটি দেশে মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে অধিকাংশ দেশে মসজিদের পরিবর্তে

www.pathagar.com

নামায ঘরে মুসলমানরা তাদের দৈনন্দিন নামায আদায় করে থাকে। সরকার থেকে অনুমতি পেলে এ সমস্ত দেশসমূহেও মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে জানা গেছে।

ক্যারিবীয় অঞ্চলের যে সমস্ত দেশগুলোর প্রধান ভাষা ইংরেজী সে সমস্ত দেশগুলো হলো ঃ

এ্যান্টিগুয়া, বারবুদা, বাহামা, বারবাডস, বেলিজ, বারমুদা, ডোমিনিকা, গ্রেনাডা (Grenada), গায়ানা, মন্সট্যারাট, সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেট, ত্রিনিদাদ, টোবাগু ও ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ। ইংরেজী ভাষাভাষী দেশের মধ্যে জ্যামাইকার লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এর লোকসংখ্যা ২৪,৫০,০০০। তন্মধ্যে মুসলমান হলো ৫,০০০ জন। যে সমস্ত ক্যারিবীয় দেশে ইংরেজী ভাষাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা বেশি সে দেশগুলো হলো ঃ গায়ানা, ত্রিনিদাদ, টোবাগু ইত্যাদি। এ সমস্ত দেশে মুসলমানদের মোট সংখ্যা ১,০০,০০০ জন।

ইতিহাসের অমলিন পাতাগুলো উল্টালে দেখা যায় যে, পাক-ভারত উপমহাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়া থেকেই মুসলমানরা সর্বপ্রথম ক্যারিবীয় অঞ্চলে আগমন করে। তারা প্রথমতঃ Indentured servants এবং Farm labourer হিসেবে ক্যারিবীয় দেশগুলোতে আগমন করে। এ সমস্ত দেশে তারা শ্রম বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতো। কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় ও স্বাতন্ত্রবোধ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে ক্যারিবীয় অঞ্চলের মুসলমানদের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো ঃ

দেশের নাম	মোট জনসংখ্যা	মুসলমানদের সংখ্যা
ইংরেজী ভাষাভাষী দেশ	৫৮,৩৬,৬০১	২,১৭,২৫০
ফরাসী ”	৭১,৭৮,৫৭২	২,৬০০
স্প্যানিশ ”	২,০৫,৭৩,০০০	৩,৫০০
ওলন্দাজ ”	৬,৩৫,৪১৫	১,২১,০০০
মোট জনসংখ্যা	৩,৪২,২৩,৫৮৮	৩,৪৪,৩৫০

মুসলমানদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে খৃস্টান মিশনারীগুলো দীর্ঘদিন থেকে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

তারা বড় ধরনের কোন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। মুসলমানরা দরিদ্রতার মধ্যেও নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে মিশনারীদের নিরবচ্ছিন্ন অপতৎপরতার ফলে ইদানিং কিছু সংখ্যক মুসলিম যুবক ধর্মান্তরিত না হয়েও ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে পড়েছে এবং কিছু সংখ্যক যুবক স্বকীয় ধর্মীয় আদর্শের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

শত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মুসলমানরা যাতে তাদের ধর্মীয় পরিচয় ও স্বাতন্ত্রবোধ বজায় রাখতে পারে সেজন্য ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে মুসলমানরা বেশ ক'টি ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা গড়ে তুলেছে। মুসলিম সংগঠনগুলোর মধ্যে Caribean Islamic organization of Guyana এবং Islamic Trust of Guyana অন্যতম। এ সংগঠন দুটির বয়স প্রায় ১৫০ বছর। এ ছাড়াও ১৯৭০ সালে অনেক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। গায়ানার মুসলমানদের আরো দুটি প্রধান সংগঠনের নাম হলো- Guyana Muslim Mission (গায়ানা মুসলিম মিশন)। Guyana Islamic Institute (গায়ানা ইসলামিক ইনস্টিটিউট)। এ সংগঠনগুলো দেশে অনেক স্কুল, মাদরাসা, মসজিদ এবং স্বাস্থ্কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

ক্যারিবীয় দেশ ত্রিনিদাদ-এর মুসলমানরা অত্যন্ত সুসংগঠিত। তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত সক্রিয় এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্থানীয় ইসলামী সংগঠনগুলোর মাধ্যমেই মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করে আসছে। ফলে ইসলামী সংগঠনগুলোর গ্রহণযোগ্যতা স্থানীয় মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত বেশি। ছাত্র যুবকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ইফসু (IIFSO-International Islamic Federation of Student organization) এর কেন্দ্রীয় সমন্বয় অফিস ত্রিনিদাদ-এর রাজধানী পোর্ট অব স্পেন (Port of Spain) এ অবস্থিত। ইফসুর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো—

(ক) শিক্ষা সহায়তা দান প্রকল্প।

(খ) আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্পে আর্থিক সহায়তাদান।

(গ) ইসলামী পুস্তক বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

(ঘ) ভিডিও সেন্টার স্থাপন এবং ভিডিও ক্যাসেট বিলি করা।

এ কার্যক্রমগুলো তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করার জন্য সংস্থার কিছু Full time worker নিয়োজিত রয়েছে।

www.pathagar.com

ফরাসী ভাষাভাষী লোকেরা guadeloupe, guyane Francaise, Haiti এবং Martinique-এ বসবাস করে। এ সমস্ত দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানরা সাধারণত পশ্চিম আফ্রিকা, সেনেগাল এবং মালি থেকে আগমন করেছে। এ সমস্ত দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা ৭১,৭৮,৫৭২ জন। তন্মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ২,৬০০ জন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, Guyane Francaise এবং হাইতির মুসলমানদের সংখ্যা না জানার কারণে তা মোট মুসলিম জনসংখ্যার সাথে যোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে এ দুটি দেশের মুসলমানদের সংখ্যা যোগ করা হলেও মুসলমানদের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হবে না।

ফিলিস্তিনের একদল সচ্ছল ও সম্পদশালী মুসলমান Martinique-এ এসে বসবাস করছে। তারা এখানে একটি বড় ধরনের Islamic centre স্থাপন করেছে। সৌদি আরবের দারুল ইফতা সেন্টারের জন্য একজন যোগ্য ইমাম নিয়োগ করেছে। এ সেন্টারের মাধ্যমে স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানরা তাদের নিজস্ব আদর্শিক পরিচয় বজায় রাখার চেষ্টা করছে। এ সেন্টারের মাধ্যমে দ্রুত ইসলামী দাওয়াহ কাজ সম্প্রসারণ করার জন্য IIFSO প্রয়োজনীয় দাওয়াহ সামগ্রী সরবরাহ করছে।

Cuba, Dominican Republic এবং Puerto Rico এ স্প্যানিশ ভাষাভাষী লোকদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এ দেশগুলোতে মোট জনসংখ্যা হলো, ২,০৫,৭৩,০০০। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা হলো ৩,৫০০ জন। Dominican Republic-এ পাকিস্তানী মুসলমানদের প্রাধান্য রয়েছে। অপরদিকে Puerto Rico-তে ফিলিস্তিন মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২০০০ জন। তারা অত্যন্ত সচ্ছল এবং সম্পদশালী। দাওয়াহ কাজের জন্য তারা বিনামূল্যে ইসলামী বই-পুস্তক বিতরণ করছে এবং ইসলামিক সেন্টারের ইমামের বেতনও তারা নিয়মিতভাবে প্রদান করে আসছে।

পর্তুগীজ ভাষাভাষী লোকেরা Curacao, St. Martin, Suerinum এবং Nethfral & Antilles এ বসবাস করছে। Surinum এবং Nethfral & Antiles-এর মোট জনসংখ্যা ৬,৩৫,৪১৫ এবং মুসলমানদের সংখ্যা ১,২১,০০০।

Surinam এবং Nethfral & Antilles অঞ্চলে আরব এবং পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে আগত মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বেশি। সুরিনামে আরবীয় মুসলমানরা একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং

www.pathagar.com

মসজিদে একজন স্থায়ী ইমাম্‌ রয়েছেন। মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ চলছে। ইমাম সাহেব এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা নিজস্ব অর্থায়নে অনেকগুলো সমাজসেবামূলক প্রকল্প পরিচালনা করছে। এ সমস্ত প্রকল্পগুলো মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সুরিনামে মুসলমানদের সংখ্যা ২৮.২৩%। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশের মোট জনসংখ্যা ৪,২৫,০০০ জন। প্রায় ১০০ বছর পূর্বে ভারত বর্ষ থেকে মুসলমানরা এ দেশে এসে বসবাস শুরু করে। তবে ইন্দোনেশিয়া থেকে মুসলমানরা আসে প্রায় ৫০ বছর পূর্বে। ১৯৮৮ সালে সুরিনামে 'ক্যারিবিয়ান ইসলামিক সেক্রেটারিয়েট' (Caribbean Islamic Secretariat) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বোর্ড অব ডিরেকটরস-এর তত্ত্বাবধানে একজন নির্বাহী পরিচালক সংস্থাটির দায়িত্ব পালন করেন। সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো ঃ

ক. দাওয়াহ কর্মসূচি।

খ. ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করা।

গ. ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

ঘ. পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি।

ক্যারিবীয় দেশসমূহের মুসলমানদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং দাওয়াহ কাজের প্রচার ও প্রসারের লক্ষে রাবেতা আলমে ইসলামী, ইফসু ও ওয়ামীসহ আন্তর্জাতিক ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা ও যুব সংগঠনগুলোর এগিয়ে আসা সময়ের দাবীতে অত্যন্ত জরুরী বলে আমাদের ধারণা। এ সংস্থাগুলোর আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা পেলে ক্যারিবীয় দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠনগুলো তাদের ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনগণের সামনে ইসলামকে একবিংশ শতাব্দীর মানবতার মুক্তির আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে। ফলে বিভ্রান্ত ও পথহারা মানুষ আবার মুক্তির সন্ধান পাবে। এভাবেই একটি জনপদের মানুষ সামগ্রিকভাবে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের ইহকালীন জীবনের সার্বিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে পরকালীন নাজাতের পথকে প্রশস্ত করে তুলতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা ক্যারিবীয় দেশসমূহের মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্যা মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, (মক্কা) আগস্ট ও সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

www.pathagar.com

ফ্রান্সে ইসলাম ও ইসলামী সংগঠনের ভূমিকা

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে ধর্ম সর্বদাই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সুশৃঙ্খল, বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে ধর্ম বরাবরই সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিসত্ত্বা সংগঠনে ইসলামের ভূমিকা অনন্য সাধারণ।

খৃস্টীয় সপ্তম শতকের অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর 'জাযিরাতুল আরব'-এ ইসলামের আগমনের মাত্র এক শতাব্দীকালের মধ্যেই বিশ্বের এক বিরাট অংশে ইসলাম ব্যাপ্তি লাভ করে। এর ধারাবাহিকতায় ইতিহাসের অনিবার্য প্রয়োজনে ফ্রান্সে ইসলামের আগমন ঘটে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে মুসলমানদের আগমন ঘটে। এ দুটি যুদ্ধে বহু লোক প্রাণ হারায়। ফলে ইউরোপের দেশে দেশে কর্মক্ষম জনশক্তির তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর দেশ পুনর্গঠনের জন্য ফ্রান্স সরকার বিদেশ থেকে জনশক্তি আমদানী শুরু করে এবং বিদেশীদের জন্য অভিবাসন আইন শিথিল করে।

ফ্রান্সে কর্মক্ষম জনশক্তির চাহিদা এবং অভিবাসন আইন শিথিল করার ফলে বহু আফ্রিকান মুসলমান এ সময় ফ্রান্সে আগমন করে। তারা সাধারণত শিল্পকারখানা, নির্মাণ কোম্পানী, ফ্যাক্টরী ও খনিতে কাজ করত।

ফ্রান্সে আগত মুসলমানরা ছিল দরিদ্র ও অশিক্ষিত। ফলে তাদেরকে ফ্রান্সের দরিদ্র এলাকায়ই বসবাস করতে হয়। ইতিহাস স্বাক্ষ দেয় যে, এ সমস্ত দরিদ্র ও অসহায় শ্রমজীবী মুসলমানদের মাধ্যমেই ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশে ইসলামের আগমন ঘটে।

বর্তমানে ফ্রান্সে ৪ মিলিয়ন মুসলমান বসবাস করছে। এদের মধ্যে আলজেরীয় মুসলমান ১ মিলিয়ন, তিউনিসীয় মুসলমান ৩ লাখ এবং মরোক্কোর মুসলমান ২ লাখ। অবশিষ্ট মুসলমানরা আফ্রিকা ও তুরস্ক থেকে আগত। এ সমস্ত মুসলমানদের সন্তানরা জন্মগতভাবে ফ্রান্সের নাগরিক।

আলজেরিয়া এক সময় ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। আলজেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করলে অনেক ফরাসী মুসলমান এ স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। ফলে সরকার এদের বন্দি করে এবং অনেককে হত্যা করে। আলজেরিয়ার

www.pathagar.com

স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করার অপরাধে নিহত ফরাসী মুসলমানদের ইয়াতিম ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৫ লাখ। ফ্রান্সে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণকারী নাগরিক ৪ লাখ। তাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন প্যারিস, ১৩ জন দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল, ১০ জন মার্সেলীজ এবং অবশিষ্টরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে।

ফ্রান্সে বসবাসকারী মুসলমানরা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মর্যাদাপূর্ণ কোনো পদে কর্মরত নেই। শুধুমাত্র মুসলমান হবার কারণেই সম্মানজনক পদে নিয়োগ লাভ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। মুসলমানদের শতকরা ৯০জনই শ্রমিক। দৈহিক পরিশ্রম করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। একটি বৈরি পরিবেশে এভাবেই মুসলমানরা বেড়ে উঠছে এবং ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে ফ্রান্সের মুসলমানরা বেশ কটি ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. কেন্দ্রীয় মসজিদ

৭০ বছর পূর্বে আলজেরীয় মুসলমানরা প্যারিসে এ মসজিদটি নির্মাণ করে। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই ফ্রান্সে দাওয়াহ কাজ শুরু হয়। বর্তমানে এ মসজিদটি মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

১৯৭০ সালের পর থেকে মুসলমানরা ফ্রান্সে অনেকগুলো মসজিদ নির্মাণ করেছে। বর্তমানে ফ্রান্সে ১২৭৩ টিরও অধিক মসজিদ ও নামায ঘর রয়েছে। আফ্রিকা, তুরস্ক, তিউনিসিয়া ও মরোক্কোর মুসলমানরা নিজস্ব অর্থায়নে এ সমস্ত মসজিদ নির্মাণ করেছে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে মসজিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩টি। কিন্তু ইরানে সফল ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর মসজিদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে শুধুমাত্র মসজিদের সংখ্যাই ৯৯টি।

২. দ্য কাউন্সিল অন ইসলামিক থট

১৯৯০ সালে আলজেরীয় মুসলমানদের উদ্যোগে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ হলো ঃ

ক. মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।
খ. ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ চিহ্নিত করা ও তা অর্জন করা।

www.pathagar.com

গ. হাসপাতালে মুসলমানদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।

ঘ. ধর্মীয় নিয়মানুযায়ী পশু জবাইয়ের ব্যবস্থা করা।

ঙ. রোববারে টেলিভিশনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

চ. ফরাসী সমাজে মুসলমানদের স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপনে সহযোগিতা করা।

ছ. ফরাসী সরকারের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করা।

জ. শরয়ী নিয়মানুযায়ী রমযানের রোযা রাখা এবং ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা উদযাপনে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

৩. দ্য এ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক স্টাডিজ

১৯৯১ সালে ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। ইসলামী অনুশাসন মানার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষে ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত। বৃটেন, জার্মানী, সাবেক যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও ফ্রান্সের নাগরিক ৫৪ জন ছাত্র ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠা করে। ইউরোপে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার উদ্দেশে মুসলিম স্কলার সৃষ্টি করা ইনস্টিটিউটটির অন্যতম প্রধান লক্ষ। এ স্কলাররাই আগামী দিনের ইউরোপে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে দায়ী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে বলে আশা করা যায়।

৪. ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফ্রান্স মুসলিমস

ফ্রান্সের স্থানীয় মুসলমানরা এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ

ক. স্থানীয় মুসলমানদের সাথে অভিবাসনকৃত মুসলমানদের সম্পর্কোন্নয়ন।

খ. ইসলামী শিক্ষা বিস্তার করা।

গ. প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ. ইসলামী অনুশাসন মানার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা ইত্যাদি।

৫. দ্য ফ্রান্স এসোসিয়েশন ফর ইনফরমেশন অন ইসলাম

১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। Roger Garoudie নামক একজন প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ইসলাম গ্রহণ করার

www.pathagar.com

পর এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মূল লক্ষ হলো ফ্রান্সে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়েও শিক্ষাদান করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৬. রাবেতা আলমে ইসলামী

স্থানীয় মুসলমানদের সহযোগিতা করা এবং ফ্রান্সে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে স্থানীয় সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন এবং বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে অমুসলিমদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার লক্ষে মক্কাভিত্তিক আন্তর্জাতিক সমাজ কল্যাণ সংস্থা রাবেতা আলমে ইসলামী প্যারিসে সংগঠনের শাখা কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিম স্কলারগণ রাবেতার উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

এ সংগঠনগুলোর পাশাপাশি মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গও ফ্রান্সে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের যে সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের অবদানই বেশি। ফরাসী সমাজে তাঁদের দারুণ প্রভাব রয়েছে। এ সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ

১. Rene guenone : তাঁর ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের যুব সমাজে ইসলামের একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। উত্তর আফ্রিকার প্রখ্যাত স্কলার শেখ আবদুল ওয়াহিদ ইয়াহিয়ার সাহচর্যে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। শুধু Rene guenone -ই নন শেখ আবদুল ওয়াহিদ ইয়াহিয়া ফ্রান্সের হাজার হাজার যুবককে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আনতে সক্ষম হন।

২. ডাঃ দলীল আবু বকর ঃ তিনি বর্তমানে ফ্রান্সের সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি Islamic Institute এবং প্যারিসের গ্রান্ড মসজিদের প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তাঁর পিতা হামযা আবু বকর ছিলেন প্রখ্যাত আলজেরীয় ফকীহ। তিনি ফরাসী ভাষায় কুরআনের তাফসীর রচনা করেন। পিতা ও পুত্রের দাওয়াহ কার্যক্রমের ফলে ইসলাম ফ্রান্সে একটি বিকশিত ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ডাঃ দলীল আবু বকর ফ্রান্সের মেডিকেল বোর্ডের একজন প্রভাবশালী সদস্য। স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ইসলাম চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনন্য সাধারণ।

www.pathagar.com

ফ্রান্স সরকার ডাঃ আবু বকরকে দেশের একজন সেরা সন্তান হিসেবে সম্মান করে থাকে।

৩. Roger Garoudie ঃ তিনি একজন প্রখ্যাত লেখক ও সুবক্তা। লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তিনি ফ্রান্সে একটি Islamic Institute প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ইসলামী সংগঠন ও ব্যক্তিত্বদের সামগ্রিক তৎপরতার ফলে ফরাসী সমাজে ইসলাম দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে মুসলমানগণ ফ্রান্সের একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা ফ্রান্সের মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ
১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড, জুলাই ৭, ২০০০, মক্কা।
২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর–ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

বৃটেনে মুসলমান ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। একই রাষ্ট্রীয় সীমানায় এদের সম্পর্ক কখনো দ্বান্দ্বিক ও কখনো সহঅবস্থানমূলক। ফলে সংখ্যালঘুদেরকে সংখ্যাগুরুদের কৃপার পাত্র হয়ে বসবাস করতে হয়। এভাবে বসবাস করতে গিয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে সংখ্যালঘুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তারা সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর এবং বিজিত ও বিজয়ীর এ টানাপড়েনে মানবসভ্যতার ইতিহাস বার বার বিপর্যস্ত হয়েছে, হয়েছে জর্জরিত। সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরুর এ চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে বৃটেনের মুসলমানদের সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করা জরুরী।

বৃটিশ লর্ড সভার সদস্য লর্ড নাজির আহমদ মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নালের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বৃটেনের মুসলমানদের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত করেন। লর্ড নাজির আহমদের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে বৃটেনের মুসলমানদের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

সমস্যাসমূহ আলোচনা করার পূর্বে লর্ড নাজির আহমদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করা হলো। ১৯৫৭ সালে আযাদ কাশ্মীরের মিরপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে লর্ড নাজির আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর পিতা বৃটেনের Rotherham-এর একটি স্টিল ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ছিলেন। ১১ বছর বয়সে জনাব নাজির আহমদ মায়ের সাথে Rotherham এ চলে আসেন। Rotherham এ আসার পর তিনি স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হন। স্কুল জীবন সফলভাবে সমাপ্তির পর তিনি Thomas Rotherham College-এ ভর্তি হন। এ কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কলেজ ছাত্র সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হন। কলেজ জীবনের পাঠ শেষে Rotherham-এ অবস্থিত Sheffield University তে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি নিয়মিত স্থানীয় মসজিদে নামায আদায় করতেন এবং মসজিদে কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৯০ সালে তিনি Rotherham Council-এর সদস্য নির্বাচিত

www.pathagar.com

হন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর। ১৯৯২ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে Rotherham-এর Magistrate নিয়োগ করে। এ পদে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। এখনও তিনি Rotherham এর Councillor ও Magistrate পদে কর্মরত রয়েছেন। ১৯৯২ সালে তিনি National Forum of British Muslim Councillors নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনটি মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। লর্ড নাজির আহমদ এখনো এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে মুসলমানদের কল্যাণার্থে কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং শ্রমিকদের স্বার্থ আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি কাশ্মীরি মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জাতিসংঘে কাশ্মীরি মুসলমানদের সমস্যা তুলে ধরার জন্য ১৯৯৫ সালে তিনি একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৯৫ সালে Labour party-এর বার্ষিক সম্মেলনে কাশ্মীরের সমস্যা ও সমাধানের লক্ষে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন।

১৯৯৮ সালের ২০ জুন রাণী এলিজাবেথ নাজির আহমদকে লর্ড সভার সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৯৮ সালের ১৩ অক্টোবর পবিত্র কুরআনুল করীমে হাত রেখে তিনি লর্ড সভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পরপরই এক বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ

"I donated the Qur'an to the House of Lords and I have a prayer room where I offer my prayers, in this building."

অর্থ ঃ "আমি হাউস অব লর্ডস-এ কুরআন উপহার দিয়েছি এবং নামায আদায়ের জন্য হাউস অব লর্ডস-এ আমার জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।"

লর্ড নাজির আহমদের এ বিবৃতি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শপথ গ্রহণের পূর্বেই লর্ড সভা ভবনের একটি কক্ষ তিনি নামায ঘর হিসেবে নিজের জন্য বরাদ্দ লাভ করেন। নামায কক্ষ বরাদ্দ নেয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রতি লর্ড নাজির আহমদের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। সৈয়দ আমীর আলীর পর লর্ড নাজির আহমদই প্রথম মুসলিম যিনি লর্ড সভার সদস্য হবার গৌরব অর্জন করেন। সৈয়দ আমীর আলী ত্রিশের দশকে Privy council -এর সদস্য ছিলেন।

www.pathagar.com

এখন আমরা বৃটেনের মুসলমানদের সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ পর্যায়ক্রমে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা

বৃটেনের অন্যান্য শ্বেতাংগ ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। ফলে বৃটেনে মুসলিম বেকারদের সংখ্যাই বেশি। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লর্ড নাজির আহমদ বলেন ঃ

"The Muslims have the highest unemployment rate, which is the main cause of social deprivation, we also have the highest number of Muslim inmates; out of the total prison population of about 66,000 there are 4,700 Muslims in British prisons and during 1991-1997, the Muslim population in British prisons has doubled."

অর্থ ঃ "সামাজিক বঞ্চনার কারণে মুসলমানদের বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ এবং কারা নিবাসীদের মধ্যেও মুসলমানদের সংখ্যা বেশি, যেমন কারা নিবাসী ৬৬,০০০ জনের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৪,৭০০ জন। ১৯৯১-১৯৯৭ সালে বৃটিশ কারাগারে মুসলিম বন্দীদের সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ।"

লর্ড নাজির ১৯৯৮ সালের ২০ অক্টোবর লর্ড সভায় প্রথম ভাষণ দেন। তাঁর প্রথম ভাষণেই তিনি মুসলিম কারাবন্দীদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সরকারী উদ্যোগে একজন উপদেষ্টা নিয়োগের প্রস্তাব করেন। উপদেষ্টার কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, কারাবন্দীদের ধর্মীয় জ্ঞান-দানের মাধ্যমে সংশোধন করা এবং হালাল খাবার সরবরাহে সহযোগিতা ও পরামর্শ দানই হবে উপদেষ্টার প্রধান কাজ। লর্ড নাজির আহমদের প্রস্তাব অনুযায়ী বৃটিশ সরকার মুসলিম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-গুলোকে একজন উপদেষ্টার নাম প্রস্তাব করার জন্য অনুরোধ করে। নিয়োগ প্রাপ্ত উপদেষ্টা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন।

মুসলমানদের পেশাগত জীবন

পেশাগত ক্ষেত্রে বৃটিশ মুসলমানরা কিছুটা ইতিবাচক সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে বৃটিশ মুসলমানদের মধ্যে ল'ইয়ার, ব্যারিস্টার, ট্রাইবুন্যাল জজ ও চিকিৎসকের সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

বর্তমানে লর্ড সভায় মুসলিম প্রতিনিধি ২ জন, কমন্স সভায় ১ জন এবং ১৬০ জন কাউন্সিলর কর্মরত রয়েছেন। এঁদের সফল কর্মকাণ্ডের ফলে বৃটিশ মুসলমানদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়সহ কমনওয়েলথ অফিসে অনেক বৃটিশ মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক ও অর্থনীতিবিদ কর্মরত রয়েছেন।

বৃটেনের বর্তমান জনসংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মুসলমানদের অবস্থা খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের পরেই। অর্থাৎ মুসলমানরা বৃটিশ সমাজে দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। বৃটেনের মুসলমানরা বর্তমানে তাদের যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। তবে কোনো পেশায় কতজন কর্মরত রয়েছেন এ ধরনের কোনো সঠিক পরিসংখ্যান মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট নেই। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লর্ড নাজির আহমদ বলেনঃ

> "It would be difficult to determine the percentage of Muslims as there is no proper analysis. There are, however, many successful Muslim doctors and lawyears, besides a very large number of Muslims now in business both big and small businessmen, shopkeepers, taxi operators, people in small manufacturing and wholesale business."

অর্থ ঃ "বৃটেনে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মুসলমানদের শতকরা হার নির্ণয় করা খুবই কঠিন। কারণ আমাদের নিকট এ সংক্রান্ত কোনো পরিসংখ্যান নেই। তদুপরি বহু চিকিৎসক, আইনজীবি ও ব্যবসায়ীরা এখানে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান এখানে ক্ষুদ্র ও বড় ব্যবসায় এবং দোকান পরিচালনা, টেক্সি চালানো, জিনিসপত্র তৈরি ও পাইকারী বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন।"

মুসলমানদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে লর্ড নাজির আহমদ বলেন, 'বর্তমানে Imigration tribunal-এ দু'জন মুসলিম এবং ১৬০ জন কাউন্সিলর কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও Peterborough, Blackburn, sheffield, Bradford-এ মুসলিম Lord Mayor এবং Lalon ও Newham-এ নির্বাচিত মুসলিম Mayor-রা কর্মরত

www.pathagar.com

রয়েছেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান বর্তমানে শিল্পকলা বিভাগ ও তথ্য মাধ্যমে কর্মরত রয়েছেন। এ সমস্ত পেশাজীবীদের কর্মতৎপরতার ফলে বৃটেনের সমাজ জীবনে মুসলমানরা একটি সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। বৃটিশ মুসলমানদের মধ্যে অনেক প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য শিল্পপতিও রয়েছেন যাদের বাৎসরিক টার্নওভার ৭০০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টারলিং-এর উপর।"

শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে মুসলমান

বৃটিশ অর্থনীতি চাঙা করতে সেখানকার মুসলিম শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, টেক্সী চালক, দোকানদার, রেস্তোরাঁর মালিকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। মুসলিম ব্যবসায়ীরাই বৃটেনে সর্বপ্রথম হালাল খাবার উৎপাদন ও বিপণন শুরু করে। আজ হালাল খাবার বৃটেনে একটি পরিচিত নাম। অনেক দোকানে হালাল খাবারের সাইন বোর্ড লাগানো আছে। হালাল খাবারের কালচার. মুসলমানরাই বৃটেনে চালু করে। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লর্ড নাজির আহমদ বলেন, GCSE-এর ক্ষেত্রে খৃস্টানদের তুলনায় মুসলমানদের অগ্রগতি মাত্র ২৩%। বর্তমানে বৃটেনের জনসংখ্যা ৫৬ মিলিয়ন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ২ মিলিয়ন। GCSE (General Certificate of Secondary Education)-এর ক্ষেত্রে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা যেখানে ২৩% সেখানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংখ্যা ১৪%-১৫%। এতে বুঝা গেলো যারা সফলভাবে মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করেছে তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রধান সমস্যাসমূহ

১. প্রধান সমস্যা হলো, ভাষা সমস্যা। যারা South Asian Sub-continent থেকে বৃটেনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তারা ইংরেজী ভাষা ভালোভাবে না জানার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে যাচ্ছে।

২. পিতামাতা স্কুলগামী ছেলেমেয়েদেরকে অনেক সময় স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়। এতে লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। অর্থাৎ Break of studies হয়।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ কম। ফলে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তারা অবচেতন থেকে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

৪. শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের সাথে পিতামাতাদের মতবিনিময় কম হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লর্ড নাজির আহমদ বলেন ঃ

"The 1988 Educational Act allows for the British Muslim children to have a seperate assembly for them, if they do not want to attend their school assembly."

অর্থ ঃ "১৯৮৮ সালের আইন অনুযায়ী বৃটিশ মুসলিম শিশুরা স্কুলে অন্যদের সাথে এ্যাসেম্বলী করতে না চাইলে তাদেরকে পৃথকভাবে এ্যাসেম্বলী করার অধিকার দেয়া হয়।"

কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা এ সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এর প্রধান কারণ হলো পিতামাতাদের সচেতনতার অভাব। মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য লন্ডন শহরে একটি এবং বার্মিংহামে একটি স্কুল সরকারী অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৮ সালের Educational Act অনুযায়ী মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা হয়। মুসলিম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে এ উপদেষ্টা কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানরা অন্যান্যদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো ইংরেজী ভাষা ভালো না জানা, সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য দক্ষতার অভাব, সামাজিক পশ্চাৎপদতা, পেশাগত প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি। এ সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা এবং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন।

এক প্রশ্নের জবাবে লর্ড নাজির আহমদ বলেন, British Media সর্বদাই মুসলমান ও ইসলামের বিপক্ষে প্রচারণা চালায়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি Forced Marriage-এর কথা বলেন। কখনো কোনো মুসলিম যুবকের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বী মেয়ের বিয়ে হলে বৃটিশ মিডিয়া এটাকে Forced Marriage হিসেবে প্রচারণা চালাতে তৎপর হয়ে ওঠে। লর্ড নাজির এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, 'এটা মুসলমানদের সমস্যা নয় বরং Forced Marriage হলো Indian Sub-continent-এর একটি

www.pathagar.com

Culture.' তিনি আরো বলেন, 'এ খারাপ Culture বন্ধ করার জন্য সকল ধর্মাবলম্বীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।' বৃটিশ রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লর্ড নাজির বলেন যে, 'বৃটেনে বসবাসকারী উপমহাদেশীয় মুসলমানরাই অধিক হারে বৃটিশ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে।' তবে বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকে আগত মুসলমানরা রাজনীতির ব্যাপারে অনেকটাই উদাসীন। রাজ নৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নিম্নোক্ত তথ্যাদি তুলে ধরেন ঃ

১. ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য–১জন
২. কমন্স সভার সদস্য–১জন
৩. লর্ড সভার সদস্য–২জন
৪. কাউন্সিলর–১৬০জন

লর্ড নাজির আহমদ বৃটিশ মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী। তিনি বলেন, বৃটিশ মুসলমানরা সেদেশের রাজনৈতিক মূল স্রোতধারায় অচিরেই পূর্ণশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে। তবে এক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে অবশ্যই নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতপার্থক্য ভূলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং যারা মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় বরং বৃটেনের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়ও তাদেরকে কাজ করতে হবে। এভাবেই তারা বৃটেনের সমাজ কাঠামোয় নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো বেগবান করা যাবে। বৃটেনের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো সরকারীভাবে বৃটিশ হজ্জ মিশন চালু করা। লর্ড নাজির আহমদের প্রচেষ্টার ফলে ২০০০ সালে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের পবিত্র হজ্জব্রত পালন করার সুবিধার্থে বৃটিশ হজ্জ মিশন চালু করে। হজ্জ মিশন চালুর ফলে বৃটিশ মুসলমানদের বাধ্যতামূলক একটি ফরয ইবাদাত আদায়ের পথ সুগম হয়।

লর্ড নাজির আহমদ তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, ফোর্সড ম্যারেজ, শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধান করা এবং বৃটিশ মিডিয়াসহ সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা তার লক্ষ। এ লক্ষ অর্জনের

www.pathagar.com

জন্য বিবিসিসহ সকল মিডিয়ায় মুসলমানদের চাকরি নিশ্চিত করার জন্য তিনি তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বলেন, ২ (দুই) মিলিয়ন বৃটিশ মুসলমান লাইসেন্স এর বিপরীতে বিবিসিকে অর্থ প্রদান করে থাকে। অথচ বিবিসিতে চাকরিরত মুসলমানদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। বিবিসির বহির্বিভাগে মাত্র ৮% (আট) এশিয়ান কর্মরত রয়েছেন। এরা সবাই অমুসলিম। অপরদিকে বিবিসির অভ্যন্তরীণ বিভাগে যারা প্রোগ্রাম তৈরির কাজে নিয়োজিত রয়েছেন সেখানেও মুসলমানরা অনুপস্থিত। বিবিসিতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় মুসলমানদের চাকরি নিশ্চিত করার জন্য লর্ড নাজির আহমদ লর্ড সভায় দাবী উত্থাপন করেছেন। বিবিসি তাঁর দাবীর যৌক্তিকতা অনুধাবন করেছে এবং মুসলমানদের চাকরির বিষয়টি সুরাহা করার আশ্বাস দিয়েছে। তিনি BBC এবং ITV (Indipendent Telivision) এবং অন্যান্য চ্যানেলে মুসলমানদের জন্য প্রোগ্রাম চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এ মিডিয়াগুলোর উদ্দেশ্যে এক পত্রে বলেন ঃ

> "Look, we are Muslims, we do not want sex and violence all the time, we want educational programmes. When you show cartoons for children seven days a week, why can't you allot 15 minutes for Qur'an or Hadith for our children."

> অর্থ ঃ "দেখ, আমরা মুসলমানরা যৌনতা ও ভায়োলেন্স দেখতে চাই না, আমরা চাই শিক্ষা বিষয়ক প্রোগ্রাম। তোমরা যখন সপ্তাহের সাত দিনই শিশুদের জন্য কার্টুন প্রোগ্রাম সম্প্রচার করো তখন আমাদের শিশুদের কুরআন বা হাদীস শিক্ষার জন্য কেন ১৫ মিনিট সময় বরাদ্দ করতে পারো না ?"

লর্ড নাজির আহমদের ন্যায় অন্যান্য বৃটিশ মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সোচ্চার হলে আগামী দিনের বৃটেনের রাজনৈতিক স্রোতধারায় মুসলমানরা একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে বৃটেনের মুসলমানদের প্রত্যাশা। বৃটেনের মুসলমানদের এ প্রত্যাশা পূরণ হোক—এটাই আমাদের কামনা।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), মে, ২০০০।

www.pathagar.com

যুক্তরাজ্যে ইসলাম ঃ মসজিদ কাউন্সিলের ভূমিকা

মসজিদ মুসলিম সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তাই মসজিদকে মুসলিম সমাজের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল মনে করা হয়। তাইতো দেখা যায় প্রতিটি মুসলিম জনপদে মসজিদের অস্তিত্ব রয়েছে। মুসলমানরা যখনই কোনো নতুন জনপদে গিয়েছে তখনই তারা সেখানে স্বউদ্যোগে প্রথমেই মসজিদ নির্মাণ করে নামায কায়েম করেছে। এ নামায কায়েমের মাধ্যমে ঐ জনপদের মানুষের নিকট মুসলমানরা ঘোষণা দেয় যে, তাদের উন্নত মস্তক একমাত্র মহান আল্লাহর নিকটই অবনত হয়, অন্য কারো নিকট নয়। এভাবেই মুসলমানরা নতুন জনপদে দাওয়াতী কাজের সূচনা করে। আল্লাহর দরবারে নিজের মস্তক অবনত করার জন্য মুসলমানরা দৈনিক পাঁচবার মসজিদে গমন করে। মসজিদে নামায আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানরা নিম্নোক্ত চারটি গুণ অর্জন করতে পারে।

ক. আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ
খ. আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধন
গ. নামাযী মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং
ঘ. দুনিয়ার জীবনে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

মানব সভ্যতার ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় যে, সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেছে এবং স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনা করছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, স্রষ্টা মানুষকে ধর্মীয় অনুভূতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে তার ধর্মবিশ্বাসের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করা অত্যাবশ্যক। এ উদ্দেশ্যেই মানুষ তার ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডা, মন্দির, চার্চ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে থাকে। ঐতিহ্যগত ধর্মবিশ্বাসের ভিন্নতার মধ্যদিয়েই উপাসনালয় কেন্দ্রিক মানুষের কাঙ্ক্ষিত সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে।

মসজিদের কার্যক্রম

মসজিদ শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ইবাদাতখানাই নয় বরং মসজিদ মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র। মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলমানদের জীবন

www.pathagar.com

আবর্তিত হয়। মসজিদ শুধু ইট-পাথরে নির্মিত কোনো ইমারত নয় বরং এটি মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষতার সুউচ্চ মিনার। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদে যে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

কার্যক্রম

১. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত বাধ্যতামূলক নামায আদায়সহ নফল নামায আদায় করা।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা।

৩. বয়স্কদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানকরা।

৪. আইনসভা হিসেবে সামাজিক আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা।

৫. প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৬. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

৭. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এবং কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

৮. প্রয়োজনে ট্রাইবুনালের দায়িত্ব পালন করা।

৯. মুসলিম সমাজের সকল প্রকার সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

এছাড়াও মসজিদ–

১. মুসলমানদেরকে সৎপথ দেখায়।

২. মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হবার শিক্ষা দেয়।

৩. নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে এবং সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে প্রেরণা যোগায়।

৪. মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ অমুসলিমদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

৫. মসজিদ সম্মানিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

৬. আশ্রয়হীনরা আশ্রয় পায়।

৭. সামাজিক অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করা হয়।

৮. ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৯. জ্ঞান বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে মসজিদ বিভিন্নভাবে উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

www.pathagar.com

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, যে সমাজে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে কায়েম হয়েছে সে সমাজে মসজিদের ভূমিকাও বেড়েছে বহুগুণ। অপরদিকে যে সমাজ থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা হয়েছে সে সমাজে ইসলাম মসজিদের চার দেয়ালে বন্দী হয়ে পড়েছে। তাই মসজিদকে জীবন্ত করতে হলে সমাজে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে কায়েম করতে হবে। এ লক্ষ অর্জনের জন্য সুস্থ-সবল সকল মুসলমানকে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

মসজিদকে মুসলিম সমাজের সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে রাবেতা আলমে ইসলামীর উদ্যোগে ১৯৭৫ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মুসলিম ও অমুসলিম মোট ৮০টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। মসজিদের কার্যক্রমকে জীবন্ত করার লক্ষে সম্মেলনে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. মসজিদ হবে মুসলিম সমাজের সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র।

২. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে নামায আদায়ের লক্ষে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে মসজিদ নির্মাণ করা।

৩. মহিলাদের নামায আদায় ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকল সুযোগ সুবিধাসহ আলাদা কক্ষ নির্মাণ করা।

৪. মসজিদে সুপ্রশস্ত পাঠাগার, পড়ার কক্ষ, সভাকক্ষ এবং সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা রাখা।

৫. কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা।

৬. শিশুদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা রাখা।

৭. শিশুদের সময় কাটানোর জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা রাখা।

৮. জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ক্ষুদ্রাকারে ক্লিনিকের ব্যবস্থা রাখা।

৯. মেহমানদের জন্য আবাসিক হলের ব্যবস্থা রাখা।

১৯৭৫ সালে গৃহীত এ সিদ্ধান্তসমূহ আজও মুসলিম দেশসমূহে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তাই মসজিদগুলোও জীবন্ত কর্মকাণ্ডে ফিরে আসতে পারছে না।

www.pathagar.com

মসজিদ ও বৃটিশ মুসলমান

বর্তমানে বৃটেনে প্রায় দু'মিলিয়ন মুসলমান বসবাস করছে। এদের মধ্যে প্রধানত তিনটি শ্রেণী বিদ্যমান। যেমন ঃ

ক. অভিবাসনকৃত

খ. ধর্মান্তরিত

গ. বৃটেনে জন্মগ্রহণকারী

বৃটেনের বিগত ৪০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, অভিবাসনকৃত মুসলমানরা প্রধানতঃ দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকেই অধিকসংখ্যক হারে আগমন করেছে। এরা প্রধানত কাজের সন্ধানে এবং উন্নত জীবনের আশায়ই বৃটেনে আগমন করেছে। অভিবাসনকৃত মুসলমানরা বৃটেনে এসে সাধারণত পুরনো শহর ও শহরতলীতে বসবাস শুরু করে। কারণ এ সমস্ত এলাকায় জীবন যাত্রার মান খুব সহজ এবং খুব সহজেই কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত হওয়া যায়। তাই পুরাতন শহরগুলোতেই মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করা যায়।

বৃটেনে বর্তমানে মুসলমানরা ধর্মীয় অবস্থানগত দিক দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং মুসলমানদের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বৃটেনের ছোট বড় সকল শহরেই মুসলমানদের সন্তোষজনক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক শহরেই মুসলমানরা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করছে। ফলে তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামী আদর্শ ও নিয়মনীতি অনুসরণ করার সুযোগ পাচ্ছে। মুসলমানরা যেখানেই বসতিস্থাপন করেছে সেখানেই তারা তাদের নিজস্ব কালচার ও সামাজিক স্বাতন্ত্রবোধকে বহন করে নিয়ে গেছে। ফলে স্থানীয় সমাজের সাথে তারা একাকার না হয়ে বরং নিজস্ব বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্রবোধ নিয়েই বেঁচে আছে। মুসলমানদের এ স্বাতন্ত্রবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে মসজিদে। কারণ কোনো শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে মুসলমানরা যখন জামায়াতবদ্ধভাবে দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করার জন্য সমবেত হয় তখন মসজিদে আগমন ও প্রস্থানের সময় একটি অনাবিল দৃশ্যের অবতারণা ঘটে যা অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবেই মুসলমানদের সাহচর্যে এসে এবং তাদের আচার-আচরণে আকৃষ্ট হয়ে অনেক ইংরেজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

লিভারপুলে মুসলমানরা অনেকগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

ক. মসজিদ
খ. ডে-কেয়ার স্কুল
গ. নৈশ বিদ্যালয়
ঘ. লাইব্রেরী
ঙ. ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী
চ. মিউজিয়াম
ছ. গেস্ট হাউজ ইত্যাদি।

এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম লিভারপুলের মুসলমানদের সামাজিক অবস্থানকে খুব সুদৃঢ় করেছে। বর্তমানে বৃটেনে প্রায় ১০০০ মসজিদ রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই পুরনো বাড়ী অথবা গীর্জা। মুসলমানরা নিজস্ব অর্থায়নে এ সমস্ত বাড়ী ও গীর্জা ক্রয় করে এগুলোকে মসজিদে রূপান্তর করেছে। মোট মসজিদের মাত্র ১০% নতুন। মসজিদগুলোর কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন এবং মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষে ১৯৮৩ সালে Council of Mosques for UK & Eire প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩২০ জন সদস্য নিয়ে কাউন্সিল যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে Council তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

ক. Consultative Committee
খ. Executive Committee &
গ. Various Sub-Committees

১৯৮৪-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কাউন্সিল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো।

মুসলিম সংগঠনগুলোর সম্মিলিত প্লাটফর্মের ভূমিকা পালন

বৃটেনে বসবাসরত মুসলমানরা নিজেদের প্রয়োজনে অনেক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এ সমস্ত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা পালন করে আসছে। পৃথক পৃথকভাবে গড়ে ওঠা এ সমস্ত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন এবং বৃটেনে বসবাসরত

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে একটি সম্মিলিত প্লাটফর্মে সমবেত করার লক্ষে মসজিদ কাউন্সিল নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ হলো ঃ

ক. বৃটেনে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করা।

খ. মুসলমানদের প্রয়োজনে উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

গ. বৃটিশ সরকার ও অন্যান্য অমুসলিম সংগঠনগুলোর নিকট মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ ঘটানো।

ঘ. মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

ঙ. মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করা।

চ. ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তা সংরক্ষণ করা।

ছ. নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং মসজিদ ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা পালন করা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মক্কা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা রাবেতা আলমে ইসলামীর লন্ডন অফিসের তদানিন্তন পরিচালক ডঃ হাসিম মাহ্দীর উদ্যোগে ১৯৮৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর রাবেতা অফিসে ইসলামী চিন্তাবিদ ও নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃটেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রখ্যাত ১৫ জন মুসলিম নেতা এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে ডাঃ হাসিম মাহ্দীকে চেয়ারম্যান এবং চৌধুরী মুঈন উদ্দিনকে সেক্রেটারী জেনারেল করে একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে Council of Mosques : UK & Eire-এর যাত্রা শুরু হয়। আজ বৃটেন এবং আয়ারল্যান্ডে মসজিদ কাউন্সিল মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল একটি সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০টি ইসলামী সংগঠন মসজিদ কাউন্সিলের সদস্য পদ গ্রহণ করে এবং কাউন্সিলকে তার অভীষ্ট লক্ষে পৌছানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৮৭ সালের ২৮ অক্টোবর মসজিদ কাউন্সিল একটি চ্যারিটি সংগঠন হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে। এছাড়াও মসজিদ কাউন্সিলটি European Council of Mosques এবং Word Supreme Council of Mosques (Makkah)-এর অনুমোদন লাভ করেছে।

১৯৮৪ সালের ১৮ অক্টোবর লন্ডনের 46, Goodge street-এ রাবেতা আলমে ইসলামীর তদানিন্তন সেক্রেটারী জেনারেল মুহ্তারাম ডঃ

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ ওমর নাসীফ আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদ কাউন্সিলের অফিস উদ্বোধন করেন।

মসজিদ কাউন্সিলের বর্তমান কার্যক্রম

কাউন্সিলের ঘোষিত লক্ষ অর্জনে নিম্নোক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

কর্মসূচি

১. নতুন নতুন এলাকায় মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করা।

২. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমন্বিত মতামত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা।

৩. বৃটিশ সমাজে ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট প্রতিষ্ঠা করা।

৪. ইসলাম প্রচার ও প্রসারে দায়ী, ইমাম ও খতীবদেরকে বৈরী পরিবেশে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৫. অন্যান্য ধর্মাবলম্বী উগ্রবাদীদের হাত থেকে মসজিদকে রক্ষা করা।

৬. বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করা।

৭. মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা ও তা অব্যাহত রাখা।

৮. কুরআনের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে আরবী ভাষা চর্চা ব্যাপকতর করা।

৯. ইমাম, শিক্ষক ও দায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা।

১০. বৃটেন এবং আয়ারল্যান্ডের সকল মসজিদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করা।

১১. মসজিদ কাউন্সিলের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা।

১২. ইউরোপীয় মসজিদ কাউন্সিল ও ওয়ার্ল্ড সুপ্রীম মসজিদ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা।

১৩. যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের মসজিদসমূহের তালিকা সংরক্ষণ করা।

উপরোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে কাউন্সিল দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কন্সালটেটিভ কমিটি গঠন করে। সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে আরো ১৯ জন সদস্যকে

www.pathagar.com

কমিটিতে কো-অপট করা হয়। যুক্তরাজ্যের ১৩টি আঞ্চলিক এলাকা থেকে কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত ও মনোনীত করা হয়।

১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত কাউন্সিল উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কার্যক্রম

১. ১৯৮৪ সালে ডঃ হাসান আলী আল-আহদাল রাবেতা লন্ডন শাখার পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি রাবেতার লন্ডন শাখায় যোগদান করার পর কাউন্সিলের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে তাঁকে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। তাঁর সভাপতিত্বেই ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর কাউন্সিলের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২. দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো হলো ঃ

ক. ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা।

খ. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, মিডিয়া ও ফাইন্যান্স বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা সাব-কমিটি গঠন করা।

৩. মসজিদ কাউন্সিল তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মুসলমানদেরকে তাদের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণের ব্যাপারে অব্যাহতভাবে সচেতন করে তুলছে।

৪. বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের মসজিদসমূহের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনে সম্মেলন আয়োজন করা।

৫. শিক্ষা সংস্কার আইন বাস্তবায়নের লক্ষে ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্মেলন আয়োজন করা।

৬. কাউন্সিলের মুখপত্র হিসেবে Al-Nida নামে পাক্ষিক বুলেটিন প্রকাশ করা।

৭. বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের মসজিদ সংক্রান্ত ডাইরেক্টরী প্রকাশ করা।

৮. ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা শীর্ষক লন্ডনে একটি সম্মেলন আয়োজন করা।

৯. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও জেলখানায় হালাল খাদ্য সরবরাহের জন্য সরকারের নিকট দাবী পেশ ও তা আদায় করা।

www.pathagar.com

১০. জেলখানায় মুসলিম কয়েদীদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য সার্বক্ষণিক ইমাম নিয়োগে সরকারকে সম্মত করানো।

১১. সরকারী ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের জন্য পৃথক কবরস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা।

১২. প্রসূতিদের জন্য সরকারী হাসপাতালে মহিলা গাইনোকোলজিস্ট নিয়োগ দানের ব্যপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রভাবিত করা এবং তা বাস্তবায়ন করা।

১৩. হজ্জ মওসুমে বৃটিশ মুসলিম হজ্জ যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দানের জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক জেদ্দায় অস্থায়ী Consulate অফিস খোলার ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করা।

১৪. হিথ্রো বিমান বন্দরে মুসলিম যাত্রীদের জন্য নামাযের জায়গার ব্যবস্থা করা।

১৫. পার্লামেন্ট নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থীদের জন্য কাজ করা।

১৬. বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, মসজিদ কাউন্সিল তার ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সফল হলে আগামী দিনের বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডে ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে—ইনশাআল্লাহ্। আমরা বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), ডিসেম্বর, ২০০০।

২. মসজিদ ঃ মুসলিম সমাজের কমিউনিটি সেন্টার, কাজী মুহাম্মদ নিজামুল হক, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

বৃটেনে মুসলিম স্বার্থসংরক্ষণে ইসলামী সংগঠনগুলোর ভূমিকা

ইউরোপের দেশে দেশে আজ মুসলমানদের উপস্থিতি ব্যাপকহারে লক্ষ করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ইউরোপের দেশসমূহে ব্যাপকহারে মুসলমানদের আগমন ঘটে। সচ্ছল জীবনের হাতছানিতেই মুসলমানরা স্বদেশ ছেড়ে ইউরোপে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইউরোপের দেশে দেশে মুসলমানদের আগমনের এক পর্যায়ে বৃটেনেও মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এ আগমনের ধারা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে বৃটেনে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দুই মিলিয়ন এবং ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। ফলে বর্তমান বৃটেনে ইসলাম একটি বিকশিত ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, King offa (757-796)-এর শাসনামল ছিল মুসলিম শাসন। এ সময়ের বৃটেনের মুদ্রায় মুসলিম নিদর্শন অংকিত রয়েছে। ইতিহাস গবেষকদের মতে ৭৫৭ সাল থেকেই বৃটেনে মুসলমানদের পদচারণা শুরু হয় এবং তা এখনো অব্যাহত আছে। পরবর্তীকালে সতের শতাব্দীর শুরুতে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য মুসলিম যুবকরা বৃটেনে আগমন শুরু করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। আজো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আগমন করছে। কারণ বিশ্বে যে কটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তাদের মধ্যে এ দুটির স্থান শীর্ষে। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষে মুসলিম যুবকদের অনেকেই বৃটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ফলে বৃটেনে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোনো জনপদে মুসলমানদের স্বরব উপস্থিতির প্রথম বর্হিঃপ্রকাশ ঘটে মসজিদের মিনার থেকে সুমধুর আজানের ধ্বনী থেকে। ১৮৬০ সালে বৃটেনের Cardiff এলাকায় প্রথম মসজিদ নির্মাণ করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন ১৮৫৯ সালে এ মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পরবর্তীকালে বৃটিশ নওমুসলিম Abdullah Qweillam-এর উদ্যোগে Liverpool (লিভারপুল)-এ অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। Abdullah Qweillam উনিশ শতকে ইসলাম গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে বৃটেনের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন মুসলিম জনপদ গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতে East London-এ একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯১০ সালে স্যার সৈয়দ আমীর আলীর আহ্বানে লন্ডনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ১৯২৮ সালে East London Mosque প্রতিষ্ঠা করা হয়। Nizamiyyah Mosque Trust এ মসজিদ নির্মাণে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা দান করে।

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, আফ্রিকা এবং আরবদেশসমূহ থেকে যে সমস্ত মুসলমান ভাগ্যান্বেষণে বৃটেনে আগমন করেছে তারা তাদের কর্মস্থলের আশেপাশেই বসবাস শুরু করে। ফলে বৃটেনের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠে অনেক মুসলিম জনপদ। এ সমস্ত জনপদগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–Greater London, West Midlands, west Yorkshire, central clyderide। বাংলাদেশীরা প্রধানতঃ Greater London-এর Tower Hamlets এ বসবাস করে এবং পাকিস্তানীরা সাধারণত Birmingham, Bradford, Leicester এবং Nottingham-এ বসবাস করে। বৃটেনে আগমনকারী First Generation immigrants মুসলমানরা প্রধানতঃ Working class ভুক্ত ছিল। এ immigrantsরা সবাই ছিল পুরুষ। তারা তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে নিজ নিজ দেশে রেখে আসে। জীবনে কিছুটা স্বচ্ছলতা ফিরে আসলে তারা পরবর্তীকালে স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদেরকেও বৃটেনে নিয়ে আসে। '৬০ এর দশকের শুরু থেকেই বৃটেনে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর প্রধান কারণগুলো হলোঃ

ক. বিভিন্ন পেশার লোকদের আগমন

খ. ব্যাপক হারে শিক্ষার্থীদের আগমন

গ. বৃটেনে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্মহার বৃদ্ধি

ঘ. বৃটিশ নাগরিকদের ইসলাম গ্রহণ।

বৃটেনে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তুলনামূলক হারে মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে মুসলিম বসতি এলাকায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিষ্ঠান। বিগত ৫০ বছরের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বর্তমানে বৃটেনে ১০০০-এর অধিক মসজিদ, ২৫,০০০-এর অধিক মক্তব ও মাদরাসা (মসজিদ ভিত্তিক মক্তবসহ) এবং শত শত সামাজিক, ধর্মীয় ও

www.pathagar.com

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৯৪৪ সালে প্রথম Islamic Cultural Centre প্রতিষ্ঠা করা হয়। নতুন এবং আগামী প্রজন্ম যাতে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বেড়ে না ওঠে বরং স্বকীয় আদর্শ ও তাহজীব তমুদ্দুনের আলোকে গড়ে উঠতে পারে সে লক্ষকে সামনে রেখে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেন। বর্তমানে বৃটেনে ১০০০-এর অধিক সান্ধ্য স্কুল রয়েছে। ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী মুসলিম শিশুদের ৯০%-ই এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা লাভ করছে। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে বর্তমানে অর্ধ মিলিয়ন মুসলিম শিশু স্কুল পর্যায়ে পড়াশোনা করছে। বৃটেনের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় করে কারিকুলাম তৈরির ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. Muslim Education Trust.
২. National Muslim Education Council
৩. Muslim Schools Association
৪. The Islamic Academy

ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সচেতন করার লক্ষে ইসলামিক একাডেমী নিয়মিতভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের সুপারিশমালা ও প্রস্তাবনা পেশ করছে। এছাড়াও একাডেমী Muslim Education Quarterly নামে একটি জার্নাল নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে যাচ্ছে। অপরদিকে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবহিত করার লক্ষে Muslim Schools Association নিয়মিতভাবে Islamia Newsletter প্রকাশ করে যাচ্ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে বৃটেনে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের বেড়ে ওঠা সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে এবং পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদেরকে আদর্শিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিলে আশা করা যায় যে, বৃটেনে বসবাসকারী নবীন প্রজন্ম এবং আগামী প্রজন্মও স্বকীয় আদর্শের আলোকেই নিজেদেরকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। মুসলিম শিশু-কিশোরদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে বর্তমানে বৃটেনে ২৫টি পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল এবং বেশ কয়েকটি কলেজ

www.pathagar.com

রয়েছে। ভবিষ্যতে আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে বলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ জানান। এছাড়া পাঁচ/ছয়টি পূর্ণাঙ্গ মাদরাসাও মুসলমানরা পরিচালনা করছে। বর্তমানে বৃটেনে ৫ লাখ মুসলিম শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত রয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ১% মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে। বাকীরা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে। সফলভাবে শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর এ সমস্ত শিক্ষার্থীরা সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে তাদের পেশাগত জীবন শুরু করে থাকে।

বৃটেনের সমাজ-কাঠামোয় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলমানরা বেশ কয়েকটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. The Central Mosque and Islamic Cultural Centre (1977)
২. UK Islamic Mission (1963)
৩. The Muslim Education Trust (1966)
৪. Union of Muslim organizations of UK & Eire (1970)
৫. The Islamic Academy, Cambridge (1983)
৬. Indian Muslim Federation (London)
৭. The Muslim Institute (London)
৮. Muslim Council of Britain (MCB), 1996

উল্লিখিত সংগঠনগুলোর সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম নিম্নে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।

The Central Mosque and Islamic Cultural Centre :

King George-vi ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে Islamic Cultural Centre-এর উদ্বোধন করেন। কিন্তু সেন্টার সংলগ্ন কেন্দ্রীয় মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে দীর্ঘ ৩৩ বছর ব্যয় হয় এবং ১৯৭৭ সালে The Central Mosque টি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। মসজিদের নির্মাণ কাজ পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার জন্য The Central London Mosque Trust নামে একটি Trust গঠন করা হয়। ১৩টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূত Trust-এর সদস্য মনোনীত হন। এ Trustee দের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই The Central

Mosque প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মসজিদটি আজ বৃটেনের মুসলমানদের গর্ব ও অহংকারের মিনার।

The UK Islamic Mission :

লন্ডনে অধ্যয়নরত পাকিস্তানী ছাত্র ও কিছু সংখ্যক তরুণ পেশাজীবীর উদ্যোগে ১৯৬৩ সালে UK Islamic Mission প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে সংগঠনটি প্রথম বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত আলেমে দীন মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)। ১৯৮৮ সালে Mission-এর ২৫ তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। Mission ৩৮টি শাখার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩,০০০-এর অধিক ছেলেমেয়েকে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা প্রদান করেছে। Mission-এর দাওয়াহ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৩০০-এর অধিক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে। মিশনের কার্যক্রম এখনো অব্যাহত আছে। আশা করা যায় আগামী দিনগুলোতে মিশন ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

The Muslim Education Trust (MET) :

১৯৬৬ সালে MET প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সংস্থাটি মূলত শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করছে। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে পাঠ্যপুস্তক রচনাকেই সংস্থাটি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রকল্পের আওতায় Islam : Beliefs and Teachings নামে একটি বই রচনা করেছে। ১৯৯২ সালের মধ্যে এ বইয়ের ১০,০০০ কপি বিক্রী হয়। অধ্যাপক গোলাম সরোয়ার এ বইটি রচনা করেন। অধ্যাপক গোলাম সরোয়ার একজন বাংলাদেশী। তিনি বৃটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

The Islamic Foundation :

১৯৭৩ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি মূলত একটি গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা। বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করাই এ সংস্থাটির অন্যতম প্রধান কাজ। এ সংস্থাটি নিয়মিতভাবে মাসিক ও পাক্ষিক জার্নাল প্রকাশ করছে। প্রকাশিত জার্নালগুলো হচ্ছে ঃ

১. Central Asia Brief (Monthly)

২. Muslim World Book Review (Quarterly)

৩. Encounter (Quarterly)

www.pathagar.com

শিশু সাহিত্য

এছাড়াও বৃটেনে মুসলমানদের উদ্যোগে বেশ কিছু পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. Impact International :

১৯৭০ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এখনও এর প্রকাশনা অব্যাহত আছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের সংবাদ ও কার্যক্রম এ পত্রিকাটি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে আসছে। সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পত্রিকাটি তার প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে।

২. The Muslim News :

১৯৮৯ সালে মাসিক ইংরেজী ডাইজেস্ট হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় উন্নীত হয়। বর্তমানে বৃটেনে এটি জাতীয় ভিত্তিক একটি পত্রিকা।

৩. The British Muslim Monthly Survey :

১৯৯৩ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। Centre for the study of Islam and christian-Muslim Relation, Birmingham-এর উদ্যোগে এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটির প্রকাশনা এখনো অব্যাহত আছে। মুসলিম ও খৃস্টান স্কলাররা নিয়মিতভাবে পত্রিকাটিতে লিখে যাচ্ছেন। লিখনীর মাধ্যমে তারা মুসলমান ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও মুসলমানদের উদ্যোগে বাংলা, আরবী ও উর্দু পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

শিক্ষা কার্যক্রম

Oxford Universityতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের গবেষণা কার্য-পরিচালনা করার জন্য আলাদা Research Centre রয়েছে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার জন্য কোনো Islamic Research Centre নেই। এ শূন্যতা পূরণের লক্ষে রাবেতা আলমে ইসলামীর সাবেক মহাসচিব ডঃ আবদুল্লাহ্ বিন ওমর নাসীফ এর উদ্যোগে ১৯৮৫ সালে Oxford University তে Islamic Researeh Centre প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে বৃটেনের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৯৪ সালে প্রিন্স চার্লস সেন্টারটি পরিদর্শন করেন এবং

www.pathagar.com

Islam and the west শীর্ষক এক সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তাঁর এ বক্তব্য সারা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলমানদের ভূমিকা

বৃটেনে মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ৮০-এর দশক থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা স্থানীয় নির্বাচনসমূহে অংশগ্রহণ করে এবং কিছু কিছু সফলতা ও লাভ করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালে Bradford-এর স্থানীয় নির্বাচনে মাত্র ৩জন মুসলমান Councillor পদে নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে এসে তা ১১ জনে দাঁড়ায়। এছাড়াও লন্ডনে একটি মেয়র পদে একজন বাংলাদেশী নির্বাচিত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। Bradford এবং Birmingham Council-এ পাকিস্তানী মুসলমান সদস্যদের সংখ্যাই বেশি। মুসলমানদের এ রাজনৈতিক উত্থানকে আরো বেগবান ও সুসংহত করার মুসলিম নেতৃবৃন্দ জাতীয়ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত দুটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়।

রাজনৈতিক দল

১. Islamic party (1989) :

১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনের রিজেন্ট পার্ক মসজিদে এ সংগঠনটির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। দু'জন বৃটিশ নওমুসলিম এ সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী জেনারেল। তাঁরা হলেন, Daud Musa Pidcock এবং Mustaqim Bleher. এছাড়াও ইসলামিক পার্টির অধিকাংশ নেতাই বৃটিশ নওমুসলিম।

২. Muslim Parliament (1994) :

বৃটেনে প্রবাসী মুসলমানদের রাজনৈতিক দল হিসেবে Muslim Parliament ১৯৯৪ সালে আত্মপ্রকাশ করে। মরহুম Dr. Kalim Siddiqui ১৯৯৪ সালের ৪ জানুয়ারী সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাসীদের মধ্যে সংগঠনটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বৃটেনের পরবর্তী নির্বাচনে সংগঠন দুটি অংশগ্রহণ করলে আশা করা যায় যে, বৃটেনের রাজনৈতিক অঙ্গনে সংগঠন দুটি মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

www.pathagar.com

বৃটিশ সরকারের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক

১৯৯৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বৃটেনের মুসলিম নেতৃবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে মুসলমানদের অস্তিত্বের স্বার্থে কিছু সাধারণ দাবী আদায়ের লক্ষে UK Action committee on Islamic Affairs নামে একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম গঠন করেন। বৃটেনের সকল ইসলামী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে UK Action committee গঠন করা হয়।

কমিটি নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে তিনটি প্রধান দাবী আদায়ের ব্যাপারে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দাবীসমূহ ঃ

১. Muslim Commumity-র Identity কে স্বীকৃতি দেয়া।

২. Muslim Community কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি দেয়া এবং নিয়মিত সরকারী অনুদান বরাদ্দ দেয়া।

৩. মুসলিম প্রধান এলাকায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, স্কুলে নামায আদায়ের অনুমোদন দেয়া, পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১৯৯৭ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর Muslim Community-র দাবীর প্রেক্ষিতে তিনটি Muslim School কে সরকার স্বীকৃতি দান করে এবং অনুদান বরাদ্দ দেয়। ফলে এ তিনটি স্কুল বৃটিশ সরকার পরিচালিত স্কুলসমূহের সমমর্যাদা লাভ করে। বাকী স্কুলগুলোকেও বৃটিশ সরকারের Department of Education পর্যায়ক্রমে অনুমোদন দান করবে বলে UK Action committee Iqbal Sacranie আশা করছেন। অপরদিকে পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

ধর্মীয় বৈশিষ্ট

বৃটিশ মুসলিম ও খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য বিদ্যমান থাকার কারণে একই সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও মুসলমানরা খৃস্টানদের ন্যায় সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। বৃটেনের সমাজ থেকে ধর্মীয় বৈষম্য দূর করা সম্ভব হলে মুসলমানরা স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করার সুযোগ পেত। তাই মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ বৈষম্য নিরসনের জন্য বৃটেনের

www.pathagar.com

প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

বৃটেনের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো হলো ঃ

১. রক্ষণশীল দল (Conservative party)

২. শ্রমিক দল (Labour party)

৩. উদার গণতান্ত্রিক দল (Liberal Democratic party)

১৯৯৭ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রথমবারের মত একজন পাকিস্তানী মুসলিম ব্যবসায়ী House of Commons-এর সদস্য নির্বাচিত হন। তার নাম মুহাম্মাদ সরোয়ার। তিনিই কমন্স সভার প্রথম মুসলিম এমপি। অপর দিকে কাশ্মীরী মুসলিম নেতা জনাব নাজির আহমদকে লেবার পার্টি লর্ড সভার সদস্য মনোনয়ন দান করেছে। এভাবে বৃটিশ পার্লামেন্টে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সাক্ষাতকারে লর্ড নাজির আহমদ বলেন, পরবর্তী পার্লামেন্ট নির্বাচনে House of Commons-এ মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও বর্তমান লেবার গভর্নমেন্ট-এর মনোনয়নের ফলে প্রখ্যাত মুসলিম নেতা আনোয়ার পারভেজ Knighthood উপাধী লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনে কোনো মুসলমান নেতার প্রাপ্ত এটাই সর্বোচ্চ উপাধী। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ উপাধী প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মুসলমানরা British Society-র part and parcel-এ পরিণত হবার সুযোগ লাভ করছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনের বৃটেনে মুসলমানরা একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আশা করা যায়।

বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা ও মৌলিক অধিকারসমূহ আদায় করার লক্ষে বৃটিশ মুসলমানদের অন্যতম বৃহত্তম সংগঠন MCB-এর উদ্যোগে Policy Document তৈরী করা হয়েছে। এ Document-কে "Electing to Listen" নামে অভিহিত করা হয়। বিগত নির্বাচনের প্রাক্কালে এ Document policy তৈরি করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এ Document policy-তে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

www.pathagar.com

ক. শিক্ষা
খ. স্বাস্থ্য
গ. সামাজিক বিষয়াদি (বাসগৃহ সমস্যা)
ঘ. আন্তর্জাতিক ইস্যু
ঙ. ক্রাইম এন্ড ভায়োলেন্স
চ. সমাজ কাঠামো
ছ. মুসলিম পারিবারিক জীবন গঠন প্রক্রিয়া
জ. মুসলিম বিবাহ প্রথা ইত্যাদি।

বিগত নির্বাচনের সময় মুসলিম নেতৃবৃন্দ বৃটেনের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে এ Document policy হস্তান্তর করেন। তিনটি দলই অত্যন্ত সানন্দচিত্তে তা গ্রহণ করে। Labour party ক্ষমতায় আসার পর কিছু দাবী ও অধিকার ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন করেছে এবং কিছু দাবী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরদিকে MCB কর্তৃক প্রণীত এ Document policy টি বৃটেনের সকল মুসলিম সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

বৃটেনের মুসলমানরা দীর্ঘদিন যাবত ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে। এ ধর্মীয় বৈষম্য নিরসনের জন্য MCB প্রণীত Document policyতে উল্লেখ করা হয়। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মি. টনি ব্লেয়ার বলেন ঃ

"In order to be a successful nation, we must make sure that we make the most of the talents of everyone in Britain"

অর্থ ঃ "একটি সফল জাতি গঠনের লক্ষে আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, বৃটেনের সকল নাগরিক দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে।"

অপরদিকে পিছিয়ে পড়া বৃটিশ মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপারে সরকারের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেন ঃ

"To ensure we have the best and most effective approach to this vital issue."

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "এ মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত করার লক্ষে আমরা উত্তম ও কার্যকর কৌশল অবলম্বন করবো।"

বৃটিশ মুসলমানদের অধিকার আদায়ের লক্ষে পার্লামেন্টসহ সকল স্থানীয় নির্বাচনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। এভাবেই মুসলমানরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বর্তমানে কমন্সসভায় দু'জন এবং লর্ড সভায় দু'জন মুসলিম প্রতিনিধিসহ স্থানীয় প্রশাসনে অনেক মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী নির্বাচনে এসব প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের লক্ষে তিনটি রাজনৈতিক দল থেকেই মনোনয়ন নেয়া এবং সম্ভব হলে নিজস্ব রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে এখন থেকেই প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির আলোকে বৃটেনের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সকল মুসলিম সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এটা এখন সময়ের দাবী। কারণ ঐক্যই শক্তি। অনৈক্য কিভাবে একটি জাতি ও দেশকে ধ্বংস করে দেয় আফগানিস্তান তার জ্বলন্ত স্বাক্ষী। বিশ্বের কোথাও আফগানিস্তানের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটুক এটা কারোই কাম্য নয়। আমরা আশা করবো বৃটিশ মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে তাদের আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। এভাবে মুসলিম সংগঠনগুলোর কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে কোনো এক সময় বৃটেনে King offar-এর শাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটবে ইনশাআল্লাহ। আমরা বৃটেনের মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), সেপ্টেম্বর, ২০০১।

www.pathagar.com

বৃটেনে ইসলাম ও মুসলমান ঃ শিক্ষা বিস্তারে তাদের ভূমিকা

বৃটেনের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মুসলমানরা জীবিকার সন্ধানে ব্যাপকহারে বৃটেনে আগমন করছে। এ সমস্ত মুসলমানরা নিজেদের আদর্শিক পরিচয় ও তাহযীব তমুদ্দুনকে সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার লক্ষে ব্যাপক চিন্তাভাবনা শুরু করে। এ চিন্তা চেতনার অংশ হিসেবে শিশু কিশোরদের জন্য প্রথমতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু কোর্স কারিকুলাম তৈরি ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে তারা সমস্যায় পড়ে। এমনি সময়ে ১৯৭৭ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বৃটেনের সাবেক পপগায়ক ও নওমুসলিম ইউসুফ ইসলাম এ সম্মেলনে যোগদান করেন। ইউসুফ ইসলাম ১৯৭৭ সালের প্রথমার্ধে ইসলাম গ্রহণ করেন। সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তিনি ব্যাপক ধারণা লাভ করেন। এ সময় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদদের সাথে তিনি মতবিনিময় করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং বিশ্বের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের সাথে আলোচনা করে তিনি যে ধারণা লাভ করেন তার উপর ভিত্তি করে '৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে লন্ডনে একটি ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী স্কুল। ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইউসুফ ইসলাম বলেন ঃ

"Prof. Syed Ali Asraf was undoubtedly one of the first proponents of Islamization of the curricula and knowledge and started Islamic education movement in the various regions of the world. We were greatly inspired in those days by his vision. I had just embraced Islam : in fact I had embraced Islam in the same year in which the conference was held in Makkah in 1977. So when my first child was born, I was faced with the problem of looking for a school for the young one. I was quite interested in the idea of Islamization, but there were few people with whom

www.pathagar.com

to start this work, and in the end, we decided to take up the banner and establish the Islamia school."

অর্থ ঃ "বিশ্বের সর্বত্র বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়া এবং শিক্ষার ইসলামীকরণ তথা পাঠ্যক্রমকে ইসলামীকরণের প্রথম প্রস্তাবকদের মধ্যে নিসন্দেহে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফ অন্যতম। আমরা অতীতের সে দিনগুলোতে তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। ১৯৭৭ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন শুরু হয় এবং ঐ বছরই আমি পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হই। এ সময় আমার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার জন্য তখন একটি ভালো স্কুল পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এ সময় আমি শিক্ষার ইসলামীকরণের ব্যাপারে আগ্রহবোধ করলাম। কিন্তু এ কাজ শুরু করার ব্যাপারে খুব কমসংখ্যক লোককেই সাথে পেলাম। পরিশেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এ উদ্দেশ্যে আমাদেরকেই কাজ করতে হবে এবং ইসলামিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

ইউসুফ ইসলাম বলেন, ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা তাদের জানা না থাকার কারণে স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তিনি বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষে ডঃ খালীদ সিদ্দীকী নামে একজন শিক্ষাবিদকে গবেষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তিনি সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন এবং সমাধানের লক্ষে কতকগুলো প্রস্তাবনা তৈরি করেন। এ প্রস্তাবনার আলোকে স্কুলের কোর্স কারিকুলাম তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু কোর্স কারিকুলাম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দ্বিতীয় যে বড় সমস্যাটির সম্মুখীন তারা হন তাহলো পাঠ্যপুস্তক সংকট। স্কুল চালু করার পর একের পর এক সমস্যা তাদের সামনে এসে ভিড় জমাতে থাকে। কিন্তু সমস্যার সামনে তারা মাথানত না করে সমস্যা সমাধানে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ প্রসঙ্গে ইউসুফ ইসলাম বলেন ঃ

"Despite these negatives, we still felt greatly motivated by our vision, which was, in a way to give a comprehensive education that imparts Islamic Knowledge in all the sciences and skills in order to bring up a new generation to cary on the banner of Islam in Britain."

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "এ সমস্ত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বৃটেনে ইসলামের পতাকা বহন করার জন্য একটি নতুন জেনারেশন গঠন করার লক্ষে ব্যাপক ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়সমূহের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যে উদ্যোগ বা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ইতোপূর্বে আমরা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।"

স্কুলের শ্রেণী কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, মাত্র ১৩ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে শুধু নার্সারী ক্লাস চালু করা হয়। Dr. Khalid siddiqui-কে Islamia School -এর প্রথম প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে স্কুল পরিচালনা করেন। স্কুল ভবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অনেকে ইউসুফ ইসলামকে বলেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে একটি আধুনিক ভবন নির্মাণের পর শ্রেণী কার্যক্রম শুরু করা হোক। এ প্রসঙ্গে তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, মধ্য আকাশ থেকে নয় বরং ভূমি থেকেই আমি শুরু করতে চাই। তাঁর এ সহজ সরল উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি কতটুকু পেরেশানীর মধ্যে ছিলেন। ইউসুফ ইসলামের এ উক্তি থেকে এটা আবার প্রমাণিত হলো যে, যে কোনো মহৎ কাজ শূন্য থেকেই শুরু করতে হয়, তাহলে সে কাজে সফলতা আসবেই। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন ঃ

"Year after year, the school grew. As it grew, it became more and more popular, because the Muslim parents saw that a school to cater for their children could be a working proposition. There was a great doubt in the beginning whether we could at all set up and run a school. Then, from the practical example of our school, parents were convinced that was the right way to go about it."

অর্থ ঃ "বছরের পর বছর স্কুলটি উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এ উন্নতির ফলে স্কুলটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো এবং অভিভাবকেরা দেখলো যে, প্রস্তাবিত স্কুলটি বাস্তবতা অর্জন করেছে এবং স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হচ্ছে। অবশ্য স্কুলটির যাত্রার শুরুতে আমরা সন্দিহান ছিলাম যে, অবশেষে আমরা স্কুলটি প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করতে পারবো কিনা। কিন্তু স্কুলের এ বাস্তব সফলতা দেখে অভিভাবকদের মনে এ আস্থা জন্মেছে যে, স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি।"

পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এমন কি শিক্ষামন্ত্রণালয়ও স্কুলের অব্যাহত অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হয়। স্কুলটি সবার দৃষ্টিতে আসার পর সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্তির পথও প্রশস্ত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের আওতায় সরকারী স্বীকৃতি লাভের জন্য ১৯৮৫ সালে আবেদন করা হয়। কিন্তু আবেদনপত্র জমা দেয়ার পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে দীর্ঘ ১৩ বছর পর ১৯৯৭ সালে স্কুলটি সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে।

সরকারী স্বীকৃতি লাভের পর মাধ্যমিক শাখা খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রথমে বালিকা শাখা খোলা হয়। স্বল্পসময়ের মধ্যেই প্রাইমারী শাখার ন্যায় মাধ্যমিক শাখাটিও সফলতা অর্জন করে এবং এ সফলতার পথ ধরেই পরবর্তীতে বালক শাখাও খোলা হয়। ক্রমবর্ধমান হারে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্রাইমারী স্কুল ভবনের সম্প্রসারণ করা হয় এবং একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। এভাবেই ইউসুফ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া স্কুলটি প্রাইমারী শাখাসহ দুটি মাধ্যমিক শাখা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের পথকে করেছে প্রশস্ত ও বেগবান। ইসলামিয়া স্কুলের পথ ধরে পরবর্তীতে Breant area-য় বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইউসুফ ইসলাম বলেন ঃ

"The development of the school education has really taken off in our area now. There are our four schools, besides our college and an Iranian school. So all these schools have come up after seeing the success of our initiative."

অর্থ ঃ "স্কুলটির শিক্ষান্নোয়নের ফলে আমাদের এলাকায় স্কুলটির বাস্তব ভিত্তিক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আমাদের চারটি স্কুল, কলেজ ও ইরানী স্কুল ছাড়াও আরো চারটি স্কুল রয়েছে। সুতরাং সকল স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের স্কুলের সফলতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য স্কুল পরিদর্শন করেছেন।"

www.pathagar.com

স্কুল প্রতিষ্ঠার vision সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"About vision, we are very clear from the day one, i.e. imparting Islamic comprehensive education to the pupils."

অর্থ ঃ "স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শুরুতেই আমাদের ধারণা ছিল পরিষ্কার, আর তাহলো— ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় করা।"

কিন্তু এ vision অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হলো—শিক্ষকবৃন্দ। কারণ অধিকাংশ শিক্ষকই বৃটিশ সেক্যুলার শিক্ষাকারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষিত। ফলে প্রচলিত শিক্ষাকে ইসলামীকরণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য শিক্ষকদেরকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হলে আশা করা যায় যে, শিক্ষকদের ইসলামী শিক্ষার মানোন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে। ইউসুফ ইসলাম-এর মতে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঃ

ক. একজন মুসলমান হিসেবে এ পৃথিবীতে তার করণীয় কি তা জানা।

খ. কিভাবে আল্লাহ্র দাসত্ব ও ইবাদাত করবে তা জানা ।

কিন্তু প্রচলিত সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় এ মৌলিক শিক্ষা লাভ করা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সম্ভব নয়। অপরদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিষয়সমূহে কুরআনের শিক্ষার বিপরীত পদ্ধতিতে পড়ানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে কুরআনে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেক্যুলার বিজ্ঞান শিক্ষায় তার ঠিক বিপরীত ধারণাই দেয়া হচ্ছে। তাই সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত মুসলিম শিক্ষকদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রণীত শিক্ষা-কারিকুলাম অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদী পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এভাবেই মুসলিম শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে মুসলমানদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের উদ্দেশ্য সফল হবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী স্কুলসমূহ পরিচালনা করা খুবই কঠিন। কারণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগী কোনো পাঠ্যপুস্তক এ সমস্ত

www.pathagar.com

দেশে নেই। কাজেই শুধু ভবন নির্মাণ করলেই কাঙ্ক্ষিত ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন ঃ

প্রথমতঃ কোর্স কারিকুলাম তৈরি করা এবং

দ্বিতীয়তঃ কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

তৃতীয়তঃ কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষকদেরকে পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়া।

এ তিনটি লক্ষকে সামনে রেখে বৃটেনসহ ইউরোপীয় দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়েছেন এবং লক্ষ অর্জনে কিছুটা এগিয়েছেন। ঘোষিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে আশা করা যায় যে, এ সমস্ত স্কুলে আগামী দিনের শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে সত্যিকার মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং মুসলিম উম্মাহর সংকট সন্ধিক্ষণে তারা অবদান রাখতে পারবে। ইসলামিক স্কুলগুলোর Mission সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইউসুফ ইসলাম বলেন ঃ

"A Muslim school as I say is a life long process and mission."

অর্থ ঃ "ইসলামী স্কুল হলো একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া ও লক্ষ।"

ইউসুফ ইসলামের মত দরদী মুসলমানদের এ কাংঙ্ক্ষিত ইচ্ছা পূরণ হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল-(মক্কা), অক্টোবর, ২০০১।

www.pathagar.com

আল-হিজরাহ্ ইসলামিক স্কুল ঃ
বৃটেনে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের পথিকৃত

বৃটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বার্মিংহাম। এখানে বহু সংখ্যক মুসলমানের বসবাস। মুসলমানদের বিভিন্নমুখী সমস্যার ইসলামী সমাধান এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষে বার্মিংহামে বসবাসরত মুসলমানদের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালের ১৭ জুলাই Al-Hijrah Trust প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সরকারী নিবন্ধনকৃত একটি চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠান। জর্দানের প্রিন্স হাসান ইবনে তালাল ও বৃটেনের লর্ড সভার সদস্য লর্ড নাজির আহমদ ট্রাস্টের প্রেটন এবং মুহাম্মাদ আবদুল করীম সাকীব এর চেয়ারম্যান।

ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ও লক্ষ

১. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং বৃটিশ শিক্ষা কারিকুলামের পাশাপাশি শিশু কিশোরদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া।

২. শিক্ষার্থীদেরকে যুগের চাহিদানুযায়ী শিক্ষা দান করা, যাতে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার জন্য তারা মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

৩. বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলে বসবাসরত মুসলমানদেরকে ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

ট্রাস্টের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে বার্মিংহামে Al-Hijrah Islamic School প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি একটি মাধ্যমিক স্কুল। স্কুলে সরকারী কারিকুলাম ও সিলেবাসের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষালাভেরও সুযোগ পাচ্ছে। দু' ধরনের শিক্ষার সমন্বয়ের কারণে স্কুলটি একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

এটি একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ফুলটাইম শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ৪ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা এ স্কুলে লেখাপড়া করছে। স্কুলে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কেও শিক্ষা লাভ করছে। বিষয়সমূহ ঃ

www.pathagar.com

ক. আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা।

খ. একজন মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা।

গ. কমিটমেন্ট (Commitment) রক্ষা করা।

ঘ. আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা।

ঙ. সততা ও আন্তরিকতা

চ. বিচক্ষণতা

ছ. ইন্টেগ্রিটি

জ. অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সহাবস্থান ও সহমর্মিতা বজায় রাখা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পাঠ্যসূচিভুক্ত করা হয়েছে। পাঠ্যসূচি ঃ

ক. ইংরেজী ভাষা
খ. উর্দু ভাষা
গ. ইংরেজী সাহিত্য
ঘ. ইসলামী শিক্ষা
ঙ. ইসলামের ইতিহাস
চ. বিজ্ঞান
ছ. আর্ট বা কলা
জ. ডিজাইন এন্ড টেকনোলজী
ঝ. হিফয (কুরআন মুখস্তকরণ)
ঞ. তথ্য প্রযুক্তি
ট. জিয়োগ্রাফী
ঠ. অংক

ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা

বর্তমানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০০ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ২৭ জন। শিক্ষকরা উচ্চ শিক্ষিত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন। GCSE পরীক্ষার পাসের হার ৮২%।

আল-হিজরাহ স্কুল-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো ছাত্রদেরকে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসনগুলো মেনে চলতে পারে। স্কুল

www.pathagar.com

চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের নামায আদায়ের জন্য স্কুল ক্যাম্পাসে Al-Hijrah Mosque প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ জুমা'র নামায আদায়ের ব্যবস্থা আছে। মসজিদে শুধু ছাত্র-শিক্ষকরাই নয় বরং স্থানীয় মুসলমানরাও জামায়াতের সাথে নামায আদায় করে থাকে। মসজিদে ছাত্র-ছাত্রী ও বয়স্কদের জন্য কুরআন ও হাদীস শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

আল হিজরাহ ট্রাস্ট স্কুল ছাড়াও নিম্নোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও প্রতিষ্ঠা করেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম

১. বৈকালিক স্কুল
২. সাপ্তাহিক স্কুল এবং
৩. আল-হিজরাহ্ কলেজ।

যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আল-হিজরাহ্ স্কুল ছাড়া অন্যান্য স্কুলে পড়াশোনা করে তাদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানের জন্য বৈকালিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সপ্তাহে ৫ দিন বৈকালিক স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিকেল ৫টা থেকে সন্ধা ৭টা পর্যন্ত স্কুল খোলা থাকে।

সাপ্তাহিক স্কুলে সপ্তাহে একদিন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে এখানে শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ কোচিং দেয়া হয়।

১৯৯৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আল-হিজরাহ্ ইসলামিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলেজে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। বিশেষ গুরুত্ব সহকারে কলেজে আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। কারণ ইসলামকে তার মূল উৎস থেকে জানতে হলে আরবী ভাষার কোনো বিকল্প নেই। আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা কোর্স দু' বছর মেয়াদী। যারা সফলভাবে দু' বছরের কোর্স সমাপ্ত করে তাদেরকে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দেয়া হয়। কলেজে 'এ' লেভেলের শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে।

আল-হিজরাহ ট্রাস্ট শিক্ষা কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষে ২০০০ সালের প্রথমার্ধে বার্মিংহামস্থ Cherrywood Grammar

www.pathagar.com

School ভবনটি ক্রয় করেছে। ১১ জুলাই ২০০০ইং এ ভবনে Cherrywood Centre উদ্বোধন কালে স্কুল কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব মুহাম্মাদ ইমরান বলেন ঃ

"In October 1988, Al-Hijrah Day School began with, what was humble start, 12 pupils enrolled and were taught in four rented classroom in the basement of the Birmingham Central Mosque. Pupils number grew rapidly and new premises were acquired on Hobmoor Road known as Midland House to accommodate growing numbers. This office block with accompanying open space was creatively and arduously transformed into a vibrant school comprising of extra classrooms, Science laboratory, I. T. Room and other essential facilities."

অর্থ ঃ "১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে হিজরী দিবসে বার্মিংহাম কেন্দ্রীয় মসজিদের বেজমেন্টের চারটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে মাত্র ১২ (বার) জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে স্কুলটির শ্রেণী কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়। শ্রেণী কার্যক্রম শুরুর পর দ্রুত ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে ছাত্রদের স্থান সংকুলানের লক্ষে হ্যাবমোর সড়কস্থ 'মিডল্যান্ড হাউজ' ভাড়া নেয়া হয়। খোলা জায়গায় অফিস ব্লকের কার্যক্রম শুরু করতে হয়েছে যা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে আমাদেরকে শক্তি যুগিয়েছে এটি ছিল খুব শ্রমসাধ্য কাজ। শিক্ষা কার্যক্রমে স্পন্দনশীলতা সৃষ্টির লক্ষে নতুনভাবে শ্রেণী কক্ষ, বিজ্ঞান গবেষণাগার, আইটি কক্ষসহ অন্যান্য বিশেষ সুবিধাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"

এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, '৮৮ সালে মাত্র ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আল-হিজরাহ ইসলামিক স্কুল যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে স্কুল ও কলেজে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬০০ জনে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বর্তমান সংখ্যা থেকে যায় যে, আল-হিজরাহ-র কর্মকর্তারা যে মহৎ উদ্দেশ্যে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছিলেন সে উদ্দেশ্য আজ সফল হয়েছে।

স্কুল ও কলেজের শিক্ষার মান পর্যায়ক্রমে উন্নত হলে এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আগামীতে আল-হিজরাহ ইসলামিক কলেজটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হতে পারবে বলে

www.pathagar.com

আমাদের বিশ্বাস। আগামী দিনে বৃটেনের মাটিতে মুসলমানদের উদ্যোগে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক এবং মুসলিম শিক্ষার্থীরা স্বতন্ত্র পরিবেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড (সাপ্তাহিক), ৩ আগস্ট , ২০০১, মক্কা।

www.pathagar.com

বৃটেনে ইসলাম ও মুসলমান

যুক্তরাজ্যের ধর্ম-অংগনে বর্তমানে মুসলিম সমাজ একটি বিকশিত নাম। চল্লিশের দশকে মুসলমানরা জীবিকার সন্ধানে ব্যাপক হারে এখানে আগমন করে। এ সমস্ত মুসলমানরা ছিল অর্ধশিক্ষিত ও দরিদ্র। পরবর্তীকালে দক্ষিণ এশিয়া, আরব বিশ্ব ও আফ্রিকার দেশসমূহ থেকে অনেক মুসলমান যুক্তরাজ্যে আগমন করে। এরা ছিল উচ্চশিক্ষিত ও সচ্ছল। ফলে সহজেই এ সমস্ত মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন পেশায় জড়িয়ে পড়ে। তাদের এ সমস্ত পেশার মাধ্যমে তারা সহজেই স্থানীয় লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এভাবেই যুক্তরাজ্যে আগত মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বৃটেনের সমাজ কাঠামোয় নবাগত মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর পর্যায়ক্রমে তারা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, নামায ঘর, গোরস্তান ও ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তারা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের কারণে তাদের উদ্যোগসমূহ পুরোপুরি বাস্তবতার মুখ দেখেনি। এর প্রধান কারণ হলো সংকট মোকাবেলায় মুসলমানদের কোনো পূর্বপ্রস্তুতি না থাকা।

মুসলমানদের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং সংকট মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার লক্ষে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে বৃটেনে বসবাসকারী মুসলমানদের আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ ১৯৯৪ সালের ৩০ এপ্রিল বার্মিংহামে এক সভায় মিলিত হয়। সভায় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে National Interim Commitee on Muslim Unity (NICMU) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

NICMU প্রতিষ্ঠার পর নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মুসলমানদের আশু প্রয়োজন চিহ্নিত করার লক্ষে দেশব্যাপী জরীপ কার্য পরিচালনা করা হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক NICMU-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী জরীপকার্য পরিচালনা করা হয়। এ জরীপের মাধ্যমে

www.pathagar.com

কিছু সমস্যা চিহ্নিত করে তার সামাধানও পেশ করা হয়। সমস্যা ও সমাধানসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সমস্যাসমূহ

১. মুসলিম সমাজের অনিশ্চিত ভবিষ্যত এবং
২. বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে আদর্শিক শূন্যতা সৃষ্টি হওয়া।

সমাধান

১. মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা।
২. পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা।

মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ঐক্য ও সংহতি আরো জোরদার করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করার লক্ষে ১৯৯৬ সালের ২৫ মে Bradford-এ NICMU-এর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে NICMU-কে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করে Muslim Council of Britain (MCB) নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৯৬ সালের ২৫ মে MCB প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৯৭ সালের ২৩ নভেম্বর Brent Town Hall-এ MCB-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। আনুষ্ঠানিক যাত্রার পর MCB ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড-এ শাখা কায়েমের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। অল্প দিনের মধ্যেই সংগঠনটি বৃটেনে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। সংগঠনের কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯৯৮ সালের ১ মার্চ লন্ডনে-এর প্রথম সাধারণ সভা (First General Assembly) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৫০টি মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট গঠন করা হয়। সেক্রেটারিয়েটের সদস্যগণ উপস্থিত প্রতিনিধিদের ভোটে দু' বছরের জন্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত কর্ম-কর্তাগণ হচ্ছেন ঃ

জনাব ইকবাল সাকরানী—সেক্রেটারী জেনারেল
জনাব বাসিল মোস্তফা—ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল
ড. আবদুল বারী—সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল
জনাব ইউসুফ ইসলাম—ট্রেজারার

www.pathagar.com

MCB মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করছে। এ সমস্ত আলোচনার ফলে বৃটেনে বসবাসকারী মুসলমানরা সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করছে।

বর্তমানে ২৮০টি মুসলিম সংগঠন MCB-এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। এ সমস্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. Federation of students Islamic Societies in UK (FOSIS)

২. Muslim Doctors and Dentists Associations

৩. UK Islamic Mission

৪. Jamiatul Ulema, UK

৫. Jamiate-Ahle Hadith, UK

৬. Ahle sunnah Association, UK

MCB- সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব ইকবার সাকরানী বলেন ঃ

"The Muslim Council of Britain is indeed a unique structure, not only in Britain but in Europe. We have managed by Allah's Grace, to bring together all heads of different groups of the Muslim community from different sections and different school of thought. All these groups have been brought together for the first time. They have been able to sit together and tackle issues of concern to the Muslim community. "

অর্থ ঃ "মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেন যুক্ত রাজ্যসহ গোটা ইউরোপে একটি অনুপম সাংগঠনিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বৃটেনে বসবাসকারী মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপ ও চিন্তাধারার লোকদেরকে এ সংগঠনটি ঐক্যবদ্ধ করে একটি সভায় সমবেত করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানদের যে কোনো সমস্যা সমাধানে তারা একত্রে বসতে সম্মত হয়েছে এবং যে কোনো জটিল সমস্যা সমাধানে তারা সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।"

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন ঃ

"When the Muslims have the willingness to join together they can work together."

অর্থ ঃ "যখন মুসলমানদের মধ্যে একত্রে বসার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তখন তারা একত্রে কাজ করতেও সক্ষম হবে।"

MCB-এর সহযোগী সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে ভিন্নতা থাকায়। নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক পৃথকভাবে বাস্তবায়ন করছে।

কার্যক্রমসমূহ ঃ

ক. শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা

খ. ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা

গ. পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা

ঘ. সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা

ঙ. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা

চ. বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করা।

বৃটেনে বসবাসকারী মুসলমানরা বর্তমানে সেদেশে মুসলিম হিসেবে বসবাস করার অধিকার ভোগ করছে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার জন্য তারা মসজিদ ও নামায ঘর নির্মাণ করছে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল তাদের নিজস্ব কোনো গোরস্থান ছিল না। খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে একই গোরস্তানে তাদের দাফন করা হতো। MCB-এর কর্মকর্তাগণ এ ব্যাপারে সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে বহু দেনদরবার করে আলাদা গোরস্থানের সুযোগ লাভ করেন। বর্তমানে বৃটেনে মুসলমানদের বেশ কয়েকটি নিজস্ব গোরস্থান রয়েছে। এ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ইকবাল সাকরানী বলেন ঃ

"Previously there used to be cementeries which were mixed for Muslims, christians and other religious communities. We took this matter up with the government and local authorities who appreciated the need for seperate prayer place and cementeies for Muslims. Today Muslims have separate cementeries. Alhamdo Lillah, more and more Muslim cementeries are being established."

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "পূর্ববর্তী সময়ে একই গোরস্থানে মুসলমান, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দাফন করা হতো। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেছি এবং বিষয়টি তারা উপলব্ধি করেছেন যে, মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রার্থনার স্থান এবং গোরস্থান থাকা দরকার। আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে মুসলমানদের জন্য পৃথক গোরস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো মুসলিম গোরস্থান স্থাপন করা হবে বলে তিনি জানান।"

ইসলামের শিক্ষা হলো, একজন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তাকে দ্রুত দাফন করতে হয়। কিন্তু বৃটেনে কোনো মুসলমান মারা গেলে কমপক্ষে চার দিন অপেক্ষা করতে হয়। কারণ দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো মৃতদেহের দাফনকার্য সম্পন্ন করা যায় না। তবে স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ বিলম্বের প্রয়োজন হয় না। মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রচলিত আইনী জটিলতা নিরসনের জন্য সরকারের সাথে আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন। আশা করা যায় এ সমস্যারও সমাধান হবে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব ইকবাল সাকরানী বলেন ঃ

"We believe that when death come, it is Allah's will but the law of the country demands postmortem."

অর্থ ঃ "আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, তবে দাফনের পূর্বে রাষ্ট্রীয় আইনে মৃত ব্যক্তির পোস্টমর্টেম করতে হয়।"

একজন সুস্থ মানুষ যে কোনো সময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। অসুস্থ মানুষগুলো সাধারণতঃ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গিয়ে থাকে। হাসপাতালে চিকিৎসার পাশাপাশি তাদেরকে খাদ্যগ্রহণও করতে হয়। কিন্তু একজন মুসলমান হালাল খাবার ছাড়া অন্য কোনো খাদ্যগ্রহণ করতে পারে না। অথচ একটি অমুসলিম দেশে সম্পূর্ণ বিধর্মী পরিবেশে একজন রোগগ্রস্ত মানুষের পক্ষে হালাল খাবারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য MCB সরকারের সাথে আলোচনা করে হাসপাতালগুলোতে একজন ধর্মীয় উপদেষ্টা নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় যে, বৃটেন সরকার মুসলমানদের এ মৌলিক সমস্যা সমাধানে MCB-এর প্রস্তাব অনুমোদন করবে। অপরদিকে সামাজিক জীব হিসেবে জীবন চলার পথে যে কোনো কারণে যে কোনো ব্যক্তিকে কারাগারে যেতে হয়। আইনী জটিলতার কারণে অনেক নিরপরাধ

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন কারাগারে অবস্থান করতে হয়। এ সময় বৈরি পরিবেশে কোনো ধর্মীয় শিক্ষকের সাহচর্য না পেলে বন্দীদের অনেকেই নিয়মিত ধর্মীয় বিধান পালন ছেড়ে দেয়। মুসলিম বন্দীদেরকে এ সমস্যা থেকে উদ্ধার করার লক্ষে MCB কারাগারগুলোতে একজন করে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন চেয়ে সরকারের নিকট আবেদন করেছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব ইকবাল সাকরানী বলেন ঃ

> "I think, the government has now understood and it has already allowed Muslim prisoner, to be visited by chaplains."

> অর্থ ঃ "আমি বিশ্বাস করি সরকার আমাদের এ সমস্যাটি উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং ইতোমধ্যেই সরকার জেল বন্দীদের পরিদর্শনের জন্য ধর্মীয় শিক্ষকদের অনুমতি প্রদান করেছে।"

বর্তমান তিনটি সংগঠন কারাগারে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করছে এবং বন্দীদের জন্য ইসলামী বই পুস্তক সরবরাহ করছে। সংগঠনগুলো হলো ঃ

১. Islamic Cultural Centre, London
২. The Central Mosque, London
৩. The Iqra Trust, UK

কারাগারে বন্দী মুসলমানদের উপদেশ প্রদান এবং ধর্মীয় শিক্ষকদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করার জন্য বৃটেন সরকার MCB-এর দাবীর প্রেক্ষিতে একজন মুসলমানকে National Muslim prison Advisor নিয়োগ করেছে। এটা বৃটেনের মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অর্জন। মুসলমানরা অনেক পূর্ব থেকেই এ দাবী করে আসছিল, কিন্তু সরকার তখন বলেছিল এ ধরনের কোনো উপদেষ্টা নিয়োগ করা হলে তার বেতন ভাতা মুসলমানদের কোনো সংগঠনকেই বহন করতে হবে। কিন্তু বর্তমান বৃটেন সরকার নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনায়ই National Muslim prison Advisor পদে একজন মুসলমানকে নিয়োগ করেছে। Ministry of Defence on Islamic Affairs-এর আওতায় জনাব ইকবাল সাকরানীকে সরকার Advisor পদে নিয়োগ দান করেছে। এটি বৃটেন সরকারের একটি সর্বোচ্চ সম্মানজনক পদ। ইকবাল সাকরানী বলেন, মুসলমানদের দাড়ি সমস্যার কারণে উপযুক্ত ও যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা বৃটেনের সেনাবাহিনী ও পুলিশে নিয়োগ পেত না। এ ব্যাপারে MCB-এর কর্মকর্তারা সরকারের সাথে দেনদরবার করার পর

www.pathagar.com

বর্তমান সরকার মুসলমানদের দাবী মেনে নিয়েছে। ফলে দাড়ি নিয়েও মুসলমানরা সেনাবাহিনী ও পুলিশে যোগদান করতে পারছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশে কর্মরত মুসলমানদের জন্য সরকার হালাল খাবারের ব্যবস্থা করছে। এ ধরনের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে MCB-এর ভূমিকাই মুখ্য। শুধু সেনাবাহিনী ও পুলিশেই নয় বরং বর্তমানে রয়েল নেভী ও বিমান বাহিনীতেও মুসলমানরা বেশ সংখ্যায় যোগদান করার সুযোগ লাভ করেছে। এ সমস্ত বাহিনীতে কর্মরত মুসলমানরা হালাল খাবারের সুযোগ লাভ করার পাশাপাশি তাদের নামায আদায়ের জন্যও আলাদা স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। বর্তমান সরকার হিথরো বিমান বন্দরসহ দেশের উল্লেখযোগ্য বিমান বন্দরগুলোতে মুসলিম স্টাফ ও যাত্রীদের নামায আদায়ের জন্য নামায ঘরের ব্যবস্থা করেছে। হিথরো বিমান বন্দরের নামায ঘরটি সুবিশাল ও সুসজ্জিত। বৃটেনের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে যাতে ইসলাম ও মুসলমানদের সংবাদ প্রচার করা হয় সে লক্ষ্যে MCB-এর কর্মকর্তাগণ বেশ ক'বার বিবিসি-র মহাপরিচালক, রয়টার, দ্য টাইমস, দ্য গার্ডিয়ান, দ্য ডেইলি এক্সপ্রেসের সম্পাদকসহ সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেছেন। এ সমস্ত বৈঠকের কারণেই বর্তমানে The Guardian পত্রিকায় নামায, সাহরী ও ইফতারের সময়সূচি ছাপা হচ্ছে। এছাড়াও বৃটেনের দৈনিকগুলোতে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক অধ্যাপক আকবর আহমাদ-এর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। জনাব ইকবাল আশা করছেন প্রচার মাধ্যমে বর্তমান গতি অব্যাহত থাকলে অন্যান্য দৈনিকগুলো থেকেও ইসলাম সম্পর্কে লেখা আহ্বান করা হবে।

বৃটেনে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা অতীতের যে কোনো সময় থেকে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সরকারের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে সহজেই সিনিয়র মন্ত্রী, কেবিনেট মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ লাভ করছে। জনাব ইকবাল সাকরানী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে সরকারের যে কোনো বিভাগে মুসলমানদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করেছেন। বৃটেনের মুসলমানরা আজ দাবী তুলেছে তারা বৃটেনে প্রবাসী নয় বরং সে দেশের নাগরিক। বৃটেনের অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় তাদেরও সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

www.pathagar.com

মুসলিম মহিলারা বর্তমানে চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। যে সমস্ত মহিলারা মাথায় স্কার্ফ পরিধান করে সে সমস্ত মহিলারা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ বৈষম্য সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের স্বতন্ত্র পরিচিতি নিয়েই বৃটেনের পরিবেশে বেড়ে উঠছে। স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচিতি প্রত্যেকের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার। এ অধিকার খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ভোগ করার সুযোগ পেলে মুসলমানরাও আইনগতভাবে সমান অধিকার ভোগ করার অধিকার রাখে। এ অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মুসলমানরা দিনে দিনে আরো সোচ্চার হয়ে উঠছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বৃটেনের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় বৃটেনের মুসলমানরাও তাদের সকল ধর্মীয় অধিকার ভোগ করার সুযোগ লাভ করবে।

২০০১ সালে খৃস্টান বিশ্ব হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মোৎসব মহা ধূমধামের সাথে পালন করেছে। এ উপলক্ষে বৃটেনের মুসলিম সম্প্রদায়ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে দিনটি উদযাপন করেছে। সরকার একবিংশ শতাব্দীকে স্বাগত জানানোর জন্য Millennium commission গঠন করেছে। সরকারী এ কমিশনে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহা পরিচালক ডঃ মানাযির আহসানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের উদ্যোগে বৃটেনে একটি সহস্রাব্দ গম্বুজ নির্মাণ করা হবে। কমিশন আশা করছে এ গম্বুজ দেখার জন্য দৈনিক ১৩ হাজার দর্শনার্থীর আগমন ঘটবে। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৬০% থেকে ৭০% জন হবে। মুসলিম দর্শনার্থীর জন্য গম্বুজ এলাকায় নামায ঘর নির্মাণ করা হবে যাতে মুসলিম অতিথিগণ তাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে সমস্যার সম্মুখীন না হন। MCB-র অব্যাহত কর্মকাণ্ডের ফলে বৃটেনের মুসলমানরা ধীরে ধীরে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। MCB-র এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আগামী দিনের বৃটেনে ইসলাম একটি অপ্রতিরুদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে বৃটেনের মুসলমানদের প্রত্যাশা। বৃটেনের মুসলমানদের এ প্রত্যাশা পূরণ হোক এটাই আমাদের কামনা।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), ফেব্রুয়ারি '৯৯, মার্চ '৯৯।

www.pathagar.com

জার্মানীতে ইসলাম ও মুসলমান

কখন কিভাবে ইউরোপে ইসলামের আগমন ঘটে তার সঠিক তথ্য জানা না গেলেও ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ও উৎসাহী পাঠক হিসেবে জানা যায় যে, তুর্কী সালতানাতের আমলে মুসলমানদের ইউরোপ বিজয় শুরু হয় এবং দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র শাসন করে তাঁদের উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। ইউরোপের দেশে দেশে ইসলামের আগমনের এক পর্যায়ে জার্মানীতে মুসলমানদের আগমন ঘটে এবং ধীরে ধীরে জার্মানীর সমাজ ব্যবস্থায় ইসলাম স্বীয় অন্তর্নিহীত সৌন্দর্যের ফলে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে জার্মানীর মোট জনসংখ্যা ৮৩ মিলিয়ন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৩.৫ মিলিয়ন। জার্মানীর বর্তমান মোট মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে ২১ লাখই তুর্কী মুসলমান এবং মাত্র ১ লাখ স্থানীয় জার্মানী। অবশিষ্ট মুসলমানরা দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে আগত। বর্তমান জার্মানীর মোট জনসংখ্যার ৪%-৫% মুসলমান।

জার্মানীর Berlin, Cologne, Frankfurt, Munich, Aachen এবং Mulheim এলাকায় প্রধানতঃ মুসলমানরা বসবাস করে। তবে Aachen শহরে মুসলমানদের সংখ্যা ১০% এবং বার্লিনে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় অর্ধমিলিয়ন। Berlin ও Aachen-এর মুসলমানরা অত্যন্ত প্রভাবশালী।

জার্মানীতে বর্তমানে মসজিদের সংখ্যা ২০০০। এর মধ্যে ৪০০ থেকে ৫০০টি মসজিদ শুধু মসজিদ হিসেবেই নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্টগুলো পুরাতন ভবনকে মসজিদ বা নামায ঘরে রূপান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও জার্মানীতে অনেকগুলো ইসলামিক সেন্টার রয়েছে। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এ সমস্ত সেন্টারগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামিক সেন্টারগুলোর পাশাপাশি ছোট বড় অনেকগুলো ইসলামী সংগঠনও ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি বৈরী পরিবেশে মুসলমানদের স্বার্থসংশিষ্ট বিষয়সমূহ দেখাশুনা করে থাকে। এ সমস্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রধান তিনটি সংগঠন হলো ঃ

১. Supreme Council of Muslims in Germany.

২. Central Council of Muslims.

www.pathagar.com

৩. Union of Turkish Muslims.

জার্মানীর প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও জার্মানীর প্রাচীনতম ইসলামিক ইনস্টিটিউট 'Islamic Institute of Aachen'-এর পরিচালক Dr. Muhammad Hawari জানুয়ারী, ২০০২ পবিত্র মক্কা নগরীতে Muslim World League Journal-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে জার্মানীর মুসলমান এবং সেখানকার ইসলামী সংগঠনগুলোর অবস্থা তুলে ধরেন। মুসলমানদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেনঃ

"Muslims without shariah or without Islamic culture are nothing. Shariah is the very reason for our existence and we must make ulmost efforts to enable our children study shariah and Islamic culture from cradle to grave."

অর্থ ঃ "শরীয়াহ্ এবং ইসলামী সংস্কৃতি ছাড়া মুসলমানদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আমাদের অস্তিত্বের জন্যই শরীয়াহ্ অনুসরণ করা প্রয়াজন এবং আমাদের সন্তানদেরকে শরীয়াহ্ এবং ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে সমর্থ করে তোলার জন্য দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।"

Institute-এর দাওয়াহ্ কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"We organize a gathering every month which is attended by about 1,500 persons from all over Europe. We have educational programmes and events for the teaching and training of children and youth, both male and female. There is also a meeting for young women held every saturday, Which is attended by about 300 women from different age groups. For every age group there is a special programe of education, focusing on Islamic teaching. we have mosques attached to these centres."

অর্থ ঃ "আমরা প্রতি মাসে একটি সমাবেশের আয়োজন করি যেখানে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৫০০ লোক অংশগ্রহণ করে।

www.pathagar.com

এছাড়াও আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম ও খেলাধুলার প্রোগ্রাম রয়েছে যেখানে ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আমরা প্রতি শনিবার যুব মহিলাদের জন্য একটি সভার আয়োজন করে থাকি যেখানে বিভিন্ন বয়সের ৩০০জন মহিলা অংশগ্রহণ করে। এ সভায় ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। লোকদের নামায আদায় করার জন্য এ সমস্ত সেন্টারগুলোর সাথে মসজিদেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।"

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "সরকার পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামী শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। মুসলিম শিশু-কিশোর ও তরুণদেরকে ইসলামী শিক্ষাদানের লক্ষে মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার ও ইসলামিক ইনস্টিটিউটগুলোতে আরবী ভাষা, কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। শ্রেণী কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেণী কার্যক্রম দুপুরে শেষ হলে বিকেলে ইসলামিক সেন্টারগুলোতে ইসলামী ও আরবী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি আরো বলেন, মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক শ্রেণী কার্যক্রমের পাশাপাশি একই প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ও আরবী ভাষা শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জার্মানীর মুসলমানদের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন Supreme Council of Muslims ইতোমধ্যেই ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষার উপর একদল যোগ্য শিক্ষক গড়ে তুলেছে। সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা ইসলামী ও আরবী ভাষা শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে কাউন্সিল ইতোমধ্যেই সরকারের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে। আশা করা যায় সরকার মুসলিম শিক্ষার্থীদের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার লক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এ উদ্যোগের পাশাপাশি বার্লিন, সিডনি ও বন-এ মুসলমানরা তিনটি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকার এ তিনটি স্কুলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আশাকরা যায়, সীমিত পরিসরে হলেও সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকারী সিলেবাসের পাশাপাশি মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিক হারে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে আগামী দিনের জার্মানীতে মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষার পথ সুগম হবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

ডঃ মুহাম্মাদ হাওয়ারী এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষা শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা তুরস্ক, মরক্কো ও তিউনিসিয়ার সরকার বহন করে থাকে। আমেরিকার টুইন টাওয়ারের ঘটনা জার্মান মুসলমানদেরকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে চরম প্রতিকূলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে Dr. Hawari বলেন ঃ

> "The government has changed some rules and systems. Before September 11 we had some immunity for our Islamic centres and institutions. But this freedom has now been withdrawn. Now, the interior ministry can interrogate any Islamic Institution under the provisions of general system."
>
> অর্থ ঃ "সরকার সম্প্রতি কিছু নিয়ম-নীতি পরিবর্তন করেছে। ১১ সেপ্টেম্বর-এর পূর্বে ইসলামিক সেন্টার ও ইনস্টিটিউট পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা থেকে আমাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এ অধিকার বা স্বাধীনতাকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী মহোদয় যে কোনো ইসলামিক সেন্টার এ ইনস্টিটিউটে তল্লাশি করতে বা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন।"

তিনি আরো বলেন, জার্মান সরকারের এ কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁদের চলমান কার্যক্রম সংকোচিত করেননি এবং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য তারা উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। ইতোমধ্যেই একজন প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক Dr. Nadeem Elyas-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জার্মান প্রেসিডেন্ট, চ্যান্সেলর ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করে সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে তাঁদেরকে অবহিত করেছেন। ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে জার্মান নাগরিকদের মনোভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "অধিকাংশ জার্মান নাগরিক মনে করে, ইসলাম অর্থ শান্তি এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী।" Dr. Hawari আরো বলেন, জার্মান মুসলমানরা তাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েদের পরামর্শ দিয়েছেন, তারা যেন তাদের বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে ইসলামের সঠিক চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরে এবং সন্ত্রাসবাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই তা যেন

www.pathagar.com

যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করে। তিনি আরো বলেন, মুসলিম নেতৃবৃন্দের এ সাহসী তৎপরতার ফলে ইতোমধ্যে Electronic and printed media-তে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, Media গুলোতে ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী একটি শক্তিশালী গ্রুপ কাজ করছে। এদের কারণে মাঝে মধ্যে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে একিভূত করে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। তিনি আরো বলেন, ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী এ প্রচারণার জবাব দেয়ার মত জার্মানীতে কোনো মুসলিম সাংবাদিক নেই। ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলমানরা এগিয়ে আসলে এ সংকট কেটে যাবে বলে আশা করা যায়।

টুইন টাওয়ারের ঘটনা মুসলিম উম্মাহকে এক মহা সংকটে নিক্ষেপ করেছে। এ সংকট সন্ধিক্ষণে মুসলমানদেরকে আরো কঠোরভাবে ইসলামী শরীয়ার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে মন্তব্য করে Dr. Hawari বলেন ঃ

> "We cannot lose our Islamic culture. That is our life, our way of living and our entity. We cannot do away with shariah."
>
> অর্থ ঃ "আমরা আমাদের সংস্কৃতি হারাতে পারি না। আমাদের সংস্কৃতি হলো আমাদের জীবন, আমাদের বেঁচে থাকা এবং আমাদের অস্তিত্ব। আমরা ইসলামী শরীয়াহ থেকে দূরে থাকতে পারি না।"

ইসলামিক শরীয়াহ তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে Dr. Hawari-র এ মনোভাব সকল জার্মান মুসলমান সঠিকভাবে অনুধাবন করলে এবং সে অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন যাপন করলে আশা করা যায় যে, জার্মান মুসলমানদের আকাশ থেকে কালো মেঘের পর্দা সরে যাবে এবং আগামী দিনের জার্মানীতে মুসলমানরা একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে–ইনশাআল্লাহ।

আমরা জার্মান মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), মার্চ ২০০২।

www.pathagar.com

আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলমান ঃ শিক্ষা বিস্তারে তাদের ভূমিকা

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে ধর্ম সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সপ্তম শতাব্দীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর 'জাযীরাতুল আরব'-এ ইসলামের আগমনের ফলে তাই পৃথিবী হয়েছিল আলোকিত। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ইসলামের অত্যুজ্জ্বল, শাশ্বত এবং অনির্বাণ আলোক শিখা যখনই কোনো জনপদে পৌঁছেছে তখন থেকেই সেই জনপদ থেকে অন্ধকার ধীরে ধীরে দূর হয়েছে এবং কালক্রমে সেই জনপদ একটি আলোকিত জনপদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আমেরিকায় কখন কিভাবে ইসলামের আগমন ঘটে তার সঠিক তথ্য উদঘাটন করা খুবই কঠিন। তবে একথা ঠিক যে, বিশ্বময় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের এক পর্যায়ে ইসলামের সাথে আমেরিকার জনগণের পরিচয় ঘটে।

বর্তমানে আমেরিকায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় সাত মিলিয়ন। মুসলমানরা আমেরিকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠি। একজন কানাডীয় মুসলিম নেতা Mr. Fareed Nu'man বলেন, প্রতি বছর গড়ে ১,৩৫,০০০ আমেরিকান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন। এদের মধ্যে African Americans 50%, South Asians 25% এবং White Americans 1.6%।

১৯৯৪ সালে The American Muslim Study Group শিকাগোর ১৪টি Urban Area-য় মুসলমানদের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য একটি জরীপ কার্য পরিচালনা করে। এ জরীপে দেখা যায় যে, শিকাগোতে মুসলমানদের মোট সংখ্যা ৪ হাজার। এর মধ্যে–

আফ্রিকান আমেরিকান ঃ	২%
ইন্ডিয়ান-পাকিস্তানী ঃ	২৫%
আরব ঃ	২৫%
অন্যান্য ঃ	৪৮%

www.pathagar.com

১৯৬৬ সালে অভিবাসন আইন শিথিল করার পর মুসলিম দেশসমূহ থেকে উচ্চশিক্ষা ও জীবিকার সন্ধানে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। মুসলিম দেশসমূহ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই ব্যাপকভাবে আমেরিকায় আগমন করে। ফলে চাকরির ক্ষেত্রসহ অন্যান্য পেশায় তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, National per capita Income-এর তুলনায় আমেরিকান মুসলমানদের Income প্রায় দ্বিগুণ। তাদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতাই এর মূল কারণ। ফলে আমেরিকায় মুসলমানদেরকে বোঝা মনে না করে সম্পদই মনে করা হয়। এ পেশাজীবি মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ, বিজনেস এক্সিকিউটিভ, কম্পিউটার প্রোগ্রামার ও এনালিস্ট।

শিক্ষা কার্যক্রম

৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে মুসলিম দেশসমূহ থেকে অনেক শিক্ষার্থী আমেরিকায় আগমন করে। এ সমস্ত মুসলিম ছাত্রদের উদ্যোগে ১৯৬৩ সালে Muslim Students Association (MSA) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Islamic Society of North America (ISNA)। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এ সংগঠন দুটি আমেরিকায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্র শিক্ষা দেয়ার জন্য ৬০ ও ৭০ দশকের গোড়ার দিকে আমেরিকায় মুসলমানদের উদ্যোগে মাত্র ২/৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে উত্তর আমেরিকায় ২০০-এর অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আমেরিকায় ক্রমবর্ধমান হারে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই তাদের উদ্যোগে বহু সংখ্যক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মুসলমানদের উদ্যোগে অনেক নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি সরকারী সিলেবাসের সকল বই পড়ানো হয়। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলো প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত। তবে এগুলো চ্যারিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ব্যবসার জন্য মুসলমানরা এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্ত মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে Accomodate করা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে

www.pathagar.com

মাত্র ১%–২% মুসলিম শিক্ষার্থী পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। বাকী শিক্ষার্থীদেরকে Public School -এ যেতে হচ্ছে। Public School গুলো অত্যন্ত ব্যয় বহুল। অপরদিকে এ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত মুসলিম শিক্ষার্থীরা নিজস্ব তাহ্জীব ও তমদ্দুন সম্পর্কে শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যত আদর্শিক পরিচিতি নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছে।

এছাড়াও যে সমস্ত এলাকায় মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে মুসলিম পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে খৃস্টান মিশনারী স্কুলে ভর্তি করাতে বাধ্য হচ্ছে। মিশনারী স্কুলগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ফি ১৫,০০০-২৫,০০০ মার্কিন ডলার।

৫০টি অঙ্গ রাজ্যের সমন্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য আবার কতকগুলো County-তে বিভক্ত। প্রতিটি County-তে দুটি করে School districts রয়েছে। Public School গুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

আরব্যান এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান যেমন সন্তোষজনক নয় তেমনি মুসলিম ছাত্রীদের জন্যও নিরাপদ নয়। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা প্রায়ই ধর্ষণের শিকার হয়। তাই মুসলিম পিতামাতারা তাদের মেয়েদেরকে সাব-আরব্যান এলাকায় প্রতিষ্ঠিত Public School গুলোতে ভর্তি করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে Chicago -র East-West University-র Chancellor Dr. Wasiullah khan বলেন ঃ

> "But in the suburban areas, there are some good Schools, so, the Muslim parents have to live in an area where their children can go to free and better school. But again there comes the question of school culture. Any Muslim, Jewist or good christian parent will become very concerned about what their children will learn from their peer groups, not, just what the teachers teach them. So, here the Muslim schools can provide an alternative."

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "শহরতলিতে কিছু ভালো স্কুল থাকায় মুসলিম শিশুদেরকে সেখানে ভর্তি করার সুবিধার্থে মুসলমানরা সে সমস্ত স্থানে বসবাস করছে। কারণ এ সমস্ত এলাকার স্কুলগুলোতে মুসলিম ছেলেমেয়েরা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু এ স্কুলগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। মুসলমান, ইহুদী এবং ভালো খৃস্টানরা তাদের ছেয়েমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে খুবই সতর্ক। এ ব্যাপারে স্কুলের শিক্ষকরা কি পড়ায় তার চেয়ে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিজাত গ্রুপের শিক্ষাদানের ব্যাপারেই তারা বেশি সংশ্লিষ্ট।"

আমেরিকান মুসলমানদের মাঝে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষে ISNA-র উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে একটি শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বিস্তারিত আলোচনা করে বিভিন্ন পর্যায়ে ৫টি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিগুলো হলো ঃ

১. সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী শিক্ষাদানের পদ্ধতি উদ্ভাবন কমিটি।

২. সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কারিকুলামের সর্বজনগ্রাহ্যতা যাচাই কমিটি।

৩. পাশ্চাত্য শিক্ষা-কারিকুলামের সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বিত করণের সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি।

৪. স্বল্প মেয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি।

৫. সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ ও ইসলামী পুস্তকের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ কমিটি।

আমেরিকায় মুসলমানদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ২০০টি ইসলামিক স্কুলের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে এ কমিটিগুলো গঠন করা হয়। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাত্র ১%-২% জন মুসলিম শিক্ষার্থী (স্কুল শিক্ষার্থী) লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করেছে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীরা সরকারী ও খৃস্টান মিশনারী স্কুলগুলোতে অধ্যয়ন করছে।

নিজস্ব পরিমণ্ডলে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন বলে মুসলিম শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দ মনে করছেন।

www.pathagar.com

ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

আমেরিকান মুসলমানদের উদ্যোগে ১৯৮০ সালে Chicago শহরে East-west University প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাবেতা আলমে ইসলামীর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল এবং সাবেক সউদী ডেপুটি স্পীকার মান্যবর ডঃ আবদুল্লাহ বিন ওমর নাসীফ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিবোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট এবং Dr. Muhammad wasiullah khan এর প্রতিষ্ঠাতা Chancellor হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হলো East-west University. এটি Chicago-তে অবস্থিত।

ডঃ ওয়াজিউল্লাহ খান একজন পাকিস্তানী নাগরিক। ১৯৭৭ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত ইসলামী শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে Chancellor Dr. Khan বলেন, প্রধানতঃ দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

Dr. Khan-এর ভাষায় উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. "In terms of students we wanted to primarily enrol disadvantaged students, those who are almost bartred from mainstream colleges. In the begining, mostly African- American Students enrolled at the University."

অর্থ ঃ "ছাত্রদের ক্ষেত্রে আমরা প্রধানত সুবিধা বঞ্চিত ছাত্রদেরকেই ভর্তি করে থাকি, যারা প্রধান প্রধান কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পায় না। শুরুতে আফ্রিকান-আমেরিকান ছাত্রদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়।"

২. "The second aspect of our mission was to deliver an education which is truly global, multi-cultural and

www.pathagar.com

future oriented, which is not the norm in the US Colleges and Universities."

অর্থ ঃ "আমাদের দ্বিতীয় লক্ষ হলো এমন একটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন, বহু সাংস্কৃতিক এবং ভবিষ্যত নির্ভর হবে যা আমেরিকার বর্তমান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা কার্যক্রমের অনুরূপ হবে না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬০% আফ্রিকান-আমেরিকান এবং ৪০% সারা বিশ্ব থেকে আগত। এরা সাধারণত পূর্ব ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া থেকে আগত। পাকিস্তান ও ভারত থেকে অধিক হারে শিক্ষার্থীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হয়ে থাকে।

পঠিত বিষয়সমূহ

সময়ের চাহিদানুযায়ী নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়।

–বিজ্ঞান

–ব্যবসায় প্রশাসন

–ইলেকট্রোনিক্স

–সোস্যাল বিহেভিয়ারাল সায়েন্স

–মেডিকেল টেকনোলজি

–নিউরো সায়েন্স

–ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য

–যোগাযোগ

–অংক

–অফিস ব্যবস্থাপনা/প্রশাসন ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে Dr. Khan বলেন ঃ

"We have the best laboratories that are available anywhere in the world. Our building are modest and recently a very large building has been added."

অর্থ ঃ "আমাদের রয়েছে উন্নতমানের বিজ্ঞানাগার যা পৃথিবীর যে কোনো উন্নত বিজ্ঞানাগারের সমতুল্য। আমাদের ভবনগুলো পরিমিত

www.pathagar.com

আকারের। অতি সাম্প্রতিককালে বৃহদাকারের একটি ভবন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।"

East-west Universityটি আমেরিকার একটি অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে শিক্ষার মান ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশ অত্যন্ত উন্নত। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে Dr. Khan বলেন ঃ

"We are very happy that we are among the 140 top Colleges and Universities listed in a directory of best American Colleges and Universities. It was about five years ago that the famous 'weekly US News & World Report' listed East-west University in its directory of best colleges and Universities."

অর্থ ঃ "আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমেরিকার প্রধান ১৪০টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা সম্বলিত ডাইরেক্টরিতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও আমেরিকার প্রখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা "ইউএস নিজউ এও ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট"-এর নিজস্ব ডাইরেকটরিতে পাঁচ বছর পূর্বে প্রধান প্রধান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এর তালিকায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও সংযুক্ত করেছে।"

ছাত্র-সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৮৮৫ জন। আগামী বছর এ সংখ্যা ১০০০ জনে উন্নীত হবে বলে Dr. Khan জানান। তিনি আরো বলেন, আগামী ৫ বছরের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২০০০ এ উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভবনটি ৪৪,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট। অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের সংকুলানের জন্য সম্প্রতি ৯৬,৫০০ বর্গফুটের আরো একটি ভবন ক্রয় করা হয়েছে। এ দুটি ভবনকে একটি Bridge দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষক সংখ্যা

বর্তমানে ১৭জন ফুলটাইম এবং ৫০ জন পার্টটাইম শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন। শিক্ষকদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে Chancellor Dr. Wasiullah khan বলেন ঃ

www.pathagar.com

"Our teachers come from all over the world. At the East-West, the teacher-student ratio is very low. The norm here is one teacher for Zo (twenty) students and very few classes heve more than 30 students with quite a few having less then 12 students."

অর্থ ঃ "বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগ্য শিক্ষকরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের অনুপাত খুবই কম। এখানকার বৈশিষ্ট হলো ১জন শিক্ষকের অধীনে ২০জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে। তবে খুব স্বল্পসংখ্যক ক্লাসে একজন শিক্ষকের অধীনে ৩০জনের অধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এছাড়াও কোনো কোনো ক্লাশে একজন শিক্ষকের অধীনে ১২জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে।"

তিনি আরো বলেন ঃ

"There are 14 Colleges or Universities in the downtown chicago area, but as I told you our labs are the best among all of them."

অর্থ ঃ "শিকাগো এলাকার ডাউন টাউনে ১৪টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবগুলো অত্যন্ত উন্নতমানের।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা। এ বৃত্তির অর্থ ফেডারেল সরকার বরাদ্দ করে থাকে। আমেরিকার নাগরিক এবং অভিবাসনকৃত সকল শিক্ষার্থীদের জন্যই তা সমানভাবে প্রযোজ্য। বৃত্তির টাকার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ছাত্রদের বেতনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই কার্যত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ লাভ করেছে। যে সমস্ত গরীব শিক্ষার্থী ফেডারেল সরকারের বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয় তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকেই বৃত্তি প্রদান করা হয় বলে চ্যান্সেলর জানান।

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা স্বাধীন। প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব Course outline রয়েছে। তবে শিক্ষার মান সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের Professional Associationsগুলো দায়িত্ব পালন করে থাকে। আমেরিকার শিক্ষানীতির প্রধান বৈশিষ্ট হলো দুটি। যথা ঃ

www.pathagar.com

১. Academic freedom অর্থ ঃ অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা

২. Institutional Autonomy অর্থ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্ত্বশাসন

Academic freedom-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে East-West University-এর সম্মানিত চ্যান্সেলর বলেন ঃ

"The academic freedom means once a person is hierd by a college, he cannot be asked to teach this or that subject. Once the requirements of academic appointment have been fulfilled, a teacher cannot be forced by the academic dean to teach some other subject. Once the catalogue has been developed and the course outlines are there, the teacher may use whatever textbooks he wants to. The teacher may make changes or alternations in the course, so long as he can defend or justify the change."

অর্থ ঃ "অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা বলতে বুঝায় যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো কলেজে নিয়োগ দেয়া হয় তখন তাকে অন্য কোনো বিষয়ে পড়ানোর জন্য অনুরোধ করা যাবে না। কারণ যখন অ্যাকাডেমিক নিয়োগের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয় তখন অ্যাকাডেমিক ডীন কর্তৃক অন্য বিষয় পড়ানোর জন্য কাউকে বাধ্য করা যায় না। যখন পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয় এবং তাতে কোর্স আউট লাইন্সসমূহ বর্ণনা করা হয়, তখন শিক্ষক যে কোনো পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করতে পারেন। শিক্ষক প্রয়োজন মনে করলে কোর্স কারিকুলামের আউট লাইনে পরিবর্তন আনতে পারেন যাতে তিনি এ পরিবর্তনকে যুক্তিপূর্ণ বলে প্রমাণ করতে পারেন।"

Institutional Autonomy সম্পর্কে বলতে গিয়ে Dr. Khan বলেন ঃ

"The Institutional Autonomy means that the degree which we have awarded to a student, we are not accountable to anybody about that, except the membership requirement of aceredition. The concened state or federal authorities have nothing to do with how we are managing our institution.

www.pathagar.com

Presently, ours are four year Colleges, in the next five years, they will form a comprehensive university."

অর্থ ঃ "প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্বশাসন বলতে বুঝায়, আমরা ছাত্রদেরকে যে ডিগ্রী প্রদান করি সে ব্যাপারে কারো নিকট জবাবদিহি করতে আমরা বাধ্য নই, তবে সদস্য পদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি বা সর্বজনমান্যতা দরকার হয়। আমরা কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করি সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কোনো কিছু করার নেই। বর্তমানে আমাদের কলেজগুলোতে চার বছর মেয়াদী কোর্স রয়েছে যা পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কম্‌প্রিহেন্‌সিভ ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত হবে।"

আমেরিকায় শিক্ষা খাতে ব্যয় খুব বেশি। চার বছর মেয়াদী কোর্সের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে প্রতি বছর ১৬,০০০ মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হয়। অপরদিকে East-West University-তে এ ব্যয়ের পরিমাণ ৫০% কম।

East-West University-র অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, যে কোনো শিক্ষার্থী যে কোনো সময় Chancelor -এর কক্ষে প্রবেশ করে তাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে Chancellor Dr. Khan বলেন ঃ

"Our doors are always open for the students to see us whenevere there a need."

অর্থ ঃ "ছাত্রদের যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য আমাদের দরজা সুবসময় খোলা থাকে।"

ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ

ইসলামী শিক্ষা বিস্তার এবং ইসলামী শিক্ষার উপর গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে Institute of Islamic studies নামে একটি Institute প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৮৫ জন শিক্ষার্থী বর্তমানে এ ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

খুব শীঘ্রই আরো দুটি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী এবং দুটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী চালু করার পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রয়েছে।

www.pathagar.com

আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০০-এ উন্নীত হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা করছেন।

আমেরিকায় বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা

বিগত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ আমেরিকার গর্ব ও অহংকারের প্রতীক টুইন টাওয়ার আত্মঘাতি হামলায় ধ্বংস হবার পর এর সমস্ত দায়দায়িত্ব মুসলমানদের উপর চাপানোর এক তরফা প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ অব্যাহত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বর্তমানে সমগ্র আমেরিকা জুড়ে চলছে ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী প্রচারাভিযান। এর মাধ্যমে ঢালাওভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে আমেরিকায় মুসলমানদের জীবন ও সম্পদ হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যেই মসজিদসহ অনেক ইসলামী প্রতিষ্ঠান আমেরিকানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং জীবন হানীর ঘটনাও ঘটেছে প্রচুর। ফলে আমেরিকায় মুসলমানরা তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়েছে।

ইসলাম বিরোধী মার্কিনীদের বর্তমান এ অপপ্রচার মোকাবিলা করে সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে আশা করা যায় যে, বৈরী পরিবেশেও East-West University আমেরিকায় ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হতে পারবে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে আমেরিকান মুসলমানদের উদ্যোগে আরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে—ইনশাআল্লাহ্। আমরা আমেরিকান মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), সেপ্টেম্বর ২০০১।

www.pathagar.com

ক্রিমিয়ান তাতার মুসলমান ঃ হারিয়ে যাওয়া একটি জাতির ইতিকথা

জার শাসনামলে ১৭৮৩ সালে ক্রিমিয়াকে জোরপূর্বক রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাশিয়ার শাসনাধীনে ক্রিমিয়ার এ অন্তর্ভুক্তিকে ক্রিমিয়ান মুসলমানরা মেনে নিতে পারেনি। তাই স্বাধীনচেতা ক্রিমিয়ান মুসলমানরা ১৭৮৩ সাল থেকেই জাতীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মুক্তি সংগ্রাম শুরু করে। Black Sea -তে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা ছিল ক্রিমিয়া। তাই রুশ সরকারের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে Black sea -এ অবাধ যাতায়াতের পথ সুগম করা। জার সরকার ১৭৮৩ সালে এ স্বপ্ন পূরণ করে।

১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯২১ সালে ক্রিমিয়া নিয়ন্ত্রিত স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত স্বায়ত্বশাসনের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু স্ট্যালিন ১৯২৭ সালে ক্রিমিয়ার স্বায়ত্বশাসন রহিত করে এক ডিক্রি জারী করে। ফলে ক্রিমিয়া তার স্বায়ত্বশাসনের মর্যাদা হারায়। স্ট্যালিনের নির্দেশে ক্রিমিয়ান মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধ্বংস করার লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে সরকার Crimean Language-কে প্রথমে Latin এবং পরে Cyrillic script-এ রূপান্তর করে। পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের সাহিত্য সংস্কৃতি ও কৃষ্টির শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে মুসলিম শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদেরকে ক্রিমিয়া থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয় অথবা হত্যা করা হয়। এ নির্বাসন ও হত্যাকাণ্ডের কর্মসূচিকে আরো সম্প্রসারিত করে ক্রিমিয়ান মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক নির্বাসনে পাঠানো হয়। যারা নির্বাসনে যেতে অস্বীকার করে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় এ সময় স্ট্যালিনের ঘাতক বাহিনীর হাতে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ক্রিমিয়ান মুসলমান নিহত হয়। তবে অভিজ্ঞমহলের ধারণা নিহতের সংখ্যা দ্বিগুণ হবার আশংকা রয়েছে। কারণ হত্যাকাণ্ডের কোনো সঠিক পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা হয়নি। ক্রিমিয়ান মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমাজ তান্ত্রিক রুশ সরকারের এ নির্মম নির্যাতন ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ছিলো—ক্রিমিয়ান মুসলমানরা পরিপূর্ণভাবে নাস্তিক হতে অস্বীকার করছিল। ইসলামের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসই তাদেরকে স্ট্যালিনের

www.pathagar.com

ঘাতক বাহিনীর শিকারে পরিণত করে। নির্বাসন ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে স্ট্যালিন ক্রিমিয়াকে মুসলমান শূন্য করে ফেলে। ক্রিমিয়া পরিপূর্ণরূপে মুসলিম শূন্য হলে সেখানে Ethnie Russians এবং Ukranians দেরকে পুনর্বাসিত করা হয়। ক্রিমিয়াকে মুসলিম শূন্য করেই নরপিশাচ স্ট্যালিন ক্ষান্ত হয়নি বরং Tatar Historical Monument গুলোও মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও যে সমস্ত সড়ক ও ভবনের নাম মুসলমানদের নামে নামকরণ করা হয়েছিল তাও পরিবর্তন করা হয়। স্ট্যালিনের শাসনামলে মুসলমানদের সনাতন ধর্মীয় ও পারিবারিক বন্ধন, কৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভঙ্গুর করে দেয়া হয়। নির্বাসিত মুসলমানদেরকে উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়। এ সমস্ত অঞ্চলে নির্বাসিত মুসলমানরা মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকে। তারা চাহিদানুযায়ী খাবার ও বিশুদ্ধ খাবার পানি থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের বাসগৃহ ছিল অস্বাস্থ্যকর। ফলে তারা বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। অথচ চিকিৎসার কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। ফলে স্ট্যালিনের ঘাতক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েও সহায় সম্বলহীন অসহায় মানুষগুলো বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুর হার ছিল সর্বোচ্চ। অপরদিকে বলশেভিক সরকার নির্বাসিত মুসলমানদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেনি। ফলে অশিক্ষার অন্ধকারে নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠতে থাকে।

স্ট্যালিনের পর কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ক্রুসেভ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মনোনিত হয়। ১৯৪৫ সালে তাঁর নির্দেশে ক্রিমিয়া ইউক্রেন-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অন্তর্ভুক্তির ফলে ক্রিমিয়া চূড়ান্তভাবে স্বায়ত্বশাসন হারায়। অবশ্য এ সময় ক্রুসেভ একটি ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাতার মুসলমানদেরকে ক্রিমিয়ায় ফিরে আসার অনুমতি দান করেন। ফলে সহায় সম্বলহীন মুসলমানরা ধীরে ধীরে পুনরায় ক্রিমিয়ায় ফিরে আসতে থাকে। ক্রিমিয়ায় ফিরে এসেই তারা দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করার আন্দোলন জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশের বাইরেও জনমত সৃষ্টির লক্ষে প্রবাসী তাতার মুসলমানরা তৎপরতা শুরু করে।

নির্বাসিত সকল ক্রিমিয়ান তাতার মুসলমানদের স্বদেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করার লক্ষে ১৯৫৬ সালে Crimean Tatar National Movement নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংগঠনটি শুরুতেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন শুরু করে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ

www.pathagar.com

হিসেবে প্রথমেই সংগঠনটি কমিউনিস্ট পার্টির নিকট লিখিতভাবে আবেদন জানায় যাতে নির্বাসিত মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করা হয়। ১৯৬০ সালে মস্কো থেকে সংগঠনটি আন্দোলন শুরু করে। সংগঠনটি তার কার্যক্রম বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে বহির্বিশ্বে পাঠানোর অনুমোদন লাভ করে। এ সংগঠনটির আন্দোলনের ফলে ক্রিমিয়ার মুসলমানদের উপর থেকে নাজী বাহিনীর সহযোগিতার অপবাদ দূর হয়। অথচ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধত্তোরকালে ক্রিমিয়ান মুসলমানদেরকে Nazi collaborators হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়।

Crimean Tatar National Movement এর আন্দোলনের ফলে ১৯৬৭ সালে নির্বাসিত মুসলমানরা ব্যাপকহারে স্বদেশে ফিরে আসা শুরু করে। কিন্তু ক্রিমিয়ায় ফিরে আসার পর তারা নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়। কারণ সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য কোনো কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। অপরদিকে ফিরে আসা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ফলে ভয়ে অনেক মুসলমান পুনরায় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এভাবে এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্য দিয়ে তাদেরকে জীবন কাটাতে হয়।

মুসলমানদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন যখন ধীরে ধীরে জোরদার হলো তখন সরকার প্রখ্যাত মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিচার কার্য শুরু করে। এ সমস্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মোস্তাফা জামিলেভ। মোস্তাফা জামিলেভ ১৯৪৩ সালে ক্রিমিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য তাতার মুসলিম পরিবারের সাথে ১৯৪৪ সালের মে মাসে তার পরিবারকেও মধ্যএশিয়ায় নির্বাসন দেয়া হয়। ১৯৬১ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে মোস্তাফা জামিলেভ "Union of Young Crimean Tatars" সংগঠনে যোগাদান করেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তারা নির্বাসিত মুসলমানদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যোগদান করে। ১৯৬৯ সালে আন্দ্রে শাখারভের শাসনামলে মোস্তাফা জমিলেভ ইউ. এস. এস. আর এ মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ক্রিমিয়ান তাতার মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং রাশিয়ায় মানবাধিকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার অপরাধে ১৯৬৭ সাল থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর পর্যন্ত শ্রমশিবির ও কারাগারে তাকে বন্দী জীবনযাপন করতে হয়। ক্রিমিয়ান মুসলমানদের নির্যাতনের কথা বিশ্ববাসীকে অবহিত করার লক্ষে ১৯৭৫ সালে তিনি Hunger strike শুরু করেন। তার এ Hunger strike-এর ফলে তাতার মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার কথা বিশ্ববাসী

www.pathagar.com

জানতে পারে এবং তাতার মুসলমানদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রতি বিশ্ববাসী সমর্থন জানায়।

গর্বাচেভ-এর শাসনামলে তার glasnost অথবা openness policy-এর আওতায় ক্রিমিয়ান তাতার মুসলমানরা তাদের হৃত অধিকার ফিরে পাবার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এ সময় তারা Red Square-এ এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে তারা তাদের অধিকার ও সম্পদ ফিরিয়ে দেবার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানায়। সমাবেশের পর থেকে তাতার নেতৃবৃন্দ বেশ ক'বার সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সমস্ত সাক্ষাৎকার ও সমাবেশের ফলে গর্বাচেভ সরকার ১৯৮৯ সালে ক্রিমিয়ান মুসলমানদের দাবী মেনে নেয় এবং একই বছর Supreme Soviet-এ মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে একটি Resolution গ্রহণ করে। এ Resolution-এর মধ্য দিয়ে স্ট্যালিন সরকার কর্তৃক কেড়ে নেয়া সম্পদ ও অধিকার ফিরে পাবার ব্যাপারে মুসলমানরা আইনগত অধিকার লাভ করে।

তাতার মুসলমানরা তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ১৯৮৯ সালে জনাব মোস্তাফা জামিলভকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। অর্থাৎ মুসলমানদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন Crimean Tatar National Movement organization (Organizatsya Krimsko Totarskogo Natsyonalnogo Dvijienya –OKND) ১৯৮৯ সালে প্রথমবারের মত জনাব মোস্তাফা জামিলভকে দলের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে।

Prestroika-এর সুযোগে মুসলমানরা ধীরে ধীরে ক্রিমিয়ায় ফিরে আসা শুরু করে। ইতোমধ্যে নির্বাসিত তাতারদের মধ্য থেকে .২৫ মিলিয়ন তাতার মুসলমান স্বদেশে ফিরে আসে। কিন্তু স্থানীয় সরকার মুসলমানদেরকে নিজস্ব ভূমিতে পুনর্বাসিত হতে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে বাধ্য হয়ে ফিরে আসা মুসলমানদেরকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

Crimean Tatar National Movement Organization মুসলমানদের এ সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হয়ে উঠছে। ১৯৯১ সালের জুন মাসে OKND-এর দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগ্রেসে মোস্তাফা জামিলভ দ্বিতীয়বারের মত চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং Refat

www.pathagar.com

Chubarov ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়াও সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মজলিস গঠন করা হয়। এ মজলিস সংগঠনের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ।

জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৯৩ সালের ২৭ নভেম্বর OKND-এর এক বিশেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এ কংগ্রেসে নিম্নোক্ত দুটি বিষয় আলোচনা করা হয় ঃ

১. জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাতার ডেপুটিদের নির্বাচিত করা প্রয়োজন আছে কিনা ?

২. প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের মধ্যে কাউকে সমর্থন দেয়া প্রয়োজন কিনা ?

দীর্ঘ আলোচনার পর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত ডেলিগেটদের মধ্যে নির্বাচনের পক্ষে ১২৭ জন এবং বিপক্ষে ২৫ জন ভোট দান করেন। তবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিষয়টি মজলিসের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। মজলিসের সভায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করে Pro-Ukrainian Candidate Mr. Bagrov -কে সমর্থন জানানো হয়।

১৯৪৪ সালের মে মাসে ক্রিমিয়ান মুসলমানদেরকে গণহারে নির্বাসন দেয়ার পর ১৯৯৪ সালের ২৯ মার্চ প্রথম বারের মত ক্রিমিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে OKND-এর ১৪ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন। ক্রিমিয়ান তাতার মুসলমানদের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে এটি একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো। নির্বাচনের পর OKND-এর ১৪ জন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে Ilmi Umerov (ইলমি ওমরভ)-কে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী, Ennan Ennanov (এন্নান এন্নানভ) কে সমাজকল্যাণমন্ত্রী এবং OKND-এর ডেপুটি চেয়ারম্যান Mr. Refat chubarov-কে পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পীকার মনোনীত করা হয়। সরকারের সদিচ্ছার অভাবে নির্বাসিত সকল ক্রিমিয়ান মুসলমান এখনও স্বদেশে ফিরে আসতে পারেনি। তবে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সকল তাতার মুসলমান স্বদেশে পুনর্বাসিত হবে। এক্ষেত্রে Mustafa Jamilev-এর নেতৃত্বাধীন OKND-কে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৯৯৬ সালের জুন মাসের ২৬-৩০ তারিখ পর্যন্ত Akmescit (Simferopol)-এ OKND-এর তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় কংগ্রেসেও মোস্তাফা জামীলভ এবং Refat chubarov পুনরায়

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ক্রিমিয়ান তাতার মুসলমানদের অধিকার আদায়ের দীর্ঘ সংগ্রামের পরীক্ষিত নেতা Mr. Izzt Khairov (ইয্যত খায়রভ) তাসখন্দ থেকে এ সময় OKND-এর তৃতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। তৃতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়েই OKND একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতনের পর ১৫টি অঙ্গরাজ্য স্বাধীনতা অর্জন করে। বর্তমানে এ সমস্ত দেশগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সুসংহত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ক্রিমিয়াও স্বাধীনতা অর্জনের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্রিমিয়ার নেতৃবৃন্দের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো নির্বাসিত তাতার মুসলমানদের সসম্মানে স্বদেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করা। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কাজ সমাপ্ত হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে তীব্রতর করতে হবে। ক্রিমিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়েই তাতার মুসলমানদের দীর্ঘদিনের নির্যাতনের অবসান ঘটবে এবং তাতার মুসলমানরা স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখবে। বর্তমানে ক্রিমিয়া ইউক্রেনের একটি অংশ। ইউক্রেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ইউক্রেন ইচ্ছে করলেই এককভাবে ক্রিমিয়ার সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। এজন্য রাশিয়া ও উজবেকিস্তানের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। বর্তমানে ক্রিমিয়ান তাতার মুসলমানদের প্রধান সমস্যা হলো আবাসন সমস্যা। কিন্তু ক্রিমিয়ার বর্তমান সরকার মুসলমানদের এ জটিল ও মানবিক সমস্যা সমাধানে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। বর্তমানে ক্রিমিয়ার ক্ষমতাসীন সরকার রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকারের অনুগত। তাই রাশিয়ার অতীত সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বর্তমান সরকার দ্বিধা সংকোচ করছে। অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মুসলমানদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করছে তাও আঞ্চলিক সরকার সঠিক খাতে ব্যয় না করে সর্বশ্রেণীর জনগণের সাধারণ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষে বাথরুম, টয়লেট ও পার্ক নির্মাণের কাজে ব্যয় করছে। এতে মুসলমানদের আবাসিক সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মুসলমানদের এ মানবিক সমস্যা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষে Shaukat yarulli নামে একজন যুবক ১৯৮৯ সালে নিজ শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। তার এ আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে ক্রিমিয়ার মুসলমানদের বর্তমান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে বিশ্ববাসী জানতে পারে। বর্তমানে মুসলমানরা তাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এ লক্ষ

www.pathagar.com

অর্জনের জন্য তারা OKND-কে অফিসিয়ালী স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে। পুনর্বাসিত ক্রিমিয়ান মুসলমানরা এখনো ক্রিমিয়ার নাগরিকত্ব পায়নি। তারা বর্তমানে ইউক্রেনের নাগরিক হিসেবে গণ্য। কারণ ক্রিমিয়া বর্তমানে ইউক্রেনের একটি প্রদেশ মাত্র। তাই ক্রিমিয়ার মুসলমানদেরকে বর্তমানে ইউক্রেনের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। ক্রিমিয়ার মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের জন্য মোস্তাফা জামিলভ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। UNHCR-এর কর্মসূচি বাস্তবায়নেও তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। তাঁর এ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি UNHCR AWARD লাভ করেন। ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর জেনেভায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনাব মোস্তাফা জামিলভকে এ এওয়ার্ড দেয়া হয়। সম্প্রতি ক্রিমিয়ায় ফিরে আসা ক্রিমিয়ান মুসলমানদের পুনর্বাসিত করার জন্য UNHCR ২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে। এ অর্থ দ্বারা গৃহহীনদের জন্য গৃহের ব্যবস্থা করা হবে বলে মোস্তাফা জামিলভ জানান।

ক্রিমিয়া বর্তমানে রাশিয়ার শাসনাধীনে। ফলে সেখানকার রাষ্ট্রীয় ভাষা হলো রুশ ভাষা। ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট ক্রিমিয়ার জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করে থাকে। অথচ পালার্মেন্টে রাশিয়ান সদস্যদের সংখ্যাধিক্য থাকায় মুসলমানদের কল্যাণার্থে কোনো আইন পাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। এখনো ক্রিমিয়ান মুসলমানদের Linguistic Rights প্রতিষ্ঠিত হয়নি। Linguistic Rights প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানরা অব্যাহতভাবে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই মুসলমানরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্রিমিয়ান ভাষায় কিছু বই প্রকাশ করেছে। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনের ক্রিমিয়ায় ক্রিমিয়ান ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করবে বলে আশা করা যায়। ক্রিমিয়ান ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষে ইতোমধ্যেই মুসলমানদের উদ্যোগে কিছুসংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সমস্ত স্কুলে ক্রিমিয়ান ভাষায় লেখাপড়া করানো হয়। ফলে নতুন প্রজন্ম নিজস্ব ভাষার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করছে। ইতোমধ্যেই যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী অর্জন করেছে তাদেরকে নিজ দায়িত্বে ক্রিমিয়ান ভাষা শিক্ষা লাভ করতে হবে। এভাবে সর্বশ্রেণীর লোক নিজস্ব পরিমণ্ডলে ক্রিমিয়ান ভাষা চর্চা শুরু করলে অচিরেই এ ভাষাটি আবার জীবন্ত ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে ক্রিমিয়ান মুসলমানদের বিশ্বাস।

www.pathagar.com

ক্রিমিয়ার মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার এবং দীনী কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার লক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি মোস্তাফা জামিলেভ আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুটি ইসলামী কমপ্লেক্স নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক সম্মত হয়েছে। এছাড়াও Turkish Agency for International Development (TIKA) ক্রিমিয়ান মুসলমানদের আবাসন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে। সংস্থাটি নিজস্ব উদ্যোগে গৃহ নির্মাণ করছে। এ সমস্ত গৃহ গৃহহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তুরস্কের সাথে ক্রিমিয়ানদের রয়েছে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত এবং ধর্মীয় বন্ধন। ইতোমধ্যেই তুরস্কের ব্যবসায়ীরা ক্রিমিয়ানদের সাথে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করেছে। ক্রিমিয়ান মুসলমানদের সাথে তুর্কী মুসলমানদের বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষে দু' দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ ও মতবিনিময় শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৮ সালের মে মাসে তদানিন্তন তুর্কী প্রেসিডেন্ট সোলেমান ডেমিরেল ক্রিমিয়া সফর করেন।

সমাজতান্ত্রিক শাসনামলে যে সমস্ত মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল সে সমস্ত মসজিদ পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে অর্থাৎ ১৯১৭ সালের পূর্বে ক্রিমিয়ায় ১৭৫০টি মসজিদ ছিল। বর্তমানে মসজিদের সংখ্যা মাত্র ১০০টি। ইতোমধ্যেই Asian Muslim Committee, International Development Corporation এবং International Fundation Zamzam তিনটি মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে।

লেনিন-স্ট্যালিনের সমাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত ক্রিমিয়ান মুসলমানদেরকে একটি আত্মমর্যাশীল জাতি হিসেবে আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে ইসলামী বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনে সব ধরনের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি জাতি এভাবেই আবার বিশ্বের মানচিত্রে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা ক্রিমিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রতিক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), সেপ্টেম্বর, ২০০০।

www.pathagar.com

দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলন

ফিলিপাইন সমুদ্র বেষ্টিত একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। ৭১০০টি দ্বীপের সমন্বয়ে দেশটি গঠিত। এর আয়তন ২,৯৯,৪০০ বর্গ কিলোমিটার।

ফিলিপাইনে ইসলামের আগমন সম্পর্কে সঠিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও বলা যায় যে, এশিয়ায় ইসলামের বিস্তৃতির এক পর্যায়ে ফিলিপাইনে ইসলামের আগমন ঘটে। তবে ইতিহাস গবেষকদের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা পর্বেই ফিলিপাইনে ইসলামের আগমন ঘটে। সম্প্রতি সুলু দ্বীপপুঞ্জের দাতু পাহাড়ের উপর জনৈক আরব মুসলমানের একটি কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। এ কবরের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৩১০ খৃস্টাব্দ থেকেই মুসলমানরা ফিলিপাইনে বসবাস করতো। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আরবীয় ব্যবসায়ী এবং সূফীদের মাধ্যমেই ফিলিপাইনে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। ফিলিপাইনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তুয়ান মাশায়েখ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনি সুলু দ্বীপে আগমন করার পর এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং এখানকার একজন গোত্র প্রধানের কন্যার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে এখানকার সমাজকাঠামোয় নিজের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি তার সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন এবং ফিলিপাইনে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের নিয়োজিত করেন। এভাবেই পিতা ও পুত্রদের দাওয়াহ কাজের মাধ্যমে ফিলিপাইনে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে। পরবর্তীকালে 'করীমুল মাখ্‌দুম' নামে একজন দরবেশ ফিলিপাইনে আগমন করেন এবং তিনিও ইসলাম প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৩৪০ সালে মালয় থেকে ফিলিপাইনের সুলু দ্বীপে তিনি আগমন করেন এবং তাঁর উদ্যোগেই সুলুতে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে সুমাত্রা দ্বীপ থেকে রাজা বাগুইন্দার নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি নৌবহর বর্তমান জুলু দ্বীপে আগমন করে এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই নিজেকে সুলু মুসলমানদের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে আবু বকর নামক রাসূলে করীম (স)-এর একজন উত্তর পুরুষ সুলু দ্বীপে আগমন করেন এবং রাজা বাগুইন্দারের এক মেয়েকে বিয়ে করে তার

www.pathagar.com

মৃত্যুর পর সুলু সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'সুলতান শরীফুল ইসলাম' খেতাব ধারণ করে শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত হন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিন্দানাও দ্বীপেও ইসলামের প্রসার ঘটে। এভাবেই ফিলিপাইনের মাটিতে ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ফিলিপাইনে মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে মুসলমানদের চির দুশমনরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৫৭৮ সালে স্পেন ফিলিপাইনের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় ১৫৯৬ সালে মিন্দানাও দ্বীপের স্পেনীয় শাসক মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। ফলে যুদ্ধের প্রাথমিক পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে ডাচ ও স্পেনীয় শাসকগোষ্ঠী যৌথভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধের ফলে ১৬৩৭ সালে মিন্দানাও এবং ১৬৩৮ সালে সুলু দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী জুলুর পতন ঘটে। কিন্তু মুসলমানরা বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। এ যুদ্ধ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এভাবেই ফিলিপাইনে স্পেনীয় ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয়। কিন্তু স্পেন দীর্ঘ দিন তার ঔপনিবেশিক শাসন অব্যাহত রাখতে পারেনি। ১৮৯৮ সালে ফিলিপাইনের কর্তৃত্ব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে স্পেন পরাজিত হয় এবং সমগ্র ফিলিপাইনে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা ফিলিপাইনের কিছু অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৯১৩ সালে 'বুদ বাজাসক' যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে এবং ফিলিপাইনের মুসলমানরা মার্কিন ঔপনিবেশিক শাসনের শৃংখলে আবদ্ধ হয়।

১৯৪৯ সালে ফিলিপাইন স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পরপরই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের লক্ষে মুসলিম নেতৃবৃন্দ দাবী জানাতে থাকে। ফলে ম্যানিলা সরকার ও মুসলিম রাষ্ট্রের দাবীদারদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। এ সংঘাতই আজ স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ লাভ করেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মিন্দানাও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি অঞ্চল। এখানকার মরো মুসলমানরা এ এলাকার স্বদেশজাত বাসিন্দা। এখানকার ১৫টি প্রদেশ দরিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে। দেশের শিক্ষার হার ৭৫% এবং

জনগণের গড় আয়ুষ্কাল ৫৭ বছর। মিন্দানাওয়ের সবচেয়ে দুর্গম এলাকায় এ অঞ্চলের ১৯% লোক বসবাস করে। এদের অধিকাংশই মুসলমান। সম্পদের দিক থেকে মিন্দানাও একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের মোট বার্ষিক আয়ের ১৮% এ অঞ্চল যোগান দিয়ে থাকে।

স্পেন এবং আমেরিকার ঔপনিবেশিক শাসকরা কখনই জোরপূর্বক বা শক্তির বলে মিন্দানাও-এ পৌঁছতে পারেনি। অথচ মরো মুসলমানরা স্পেনের রাজার সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে মিন্দানাওয়ের কর্তৃত্ব তাদের নিকট হস্তান্তর করে। এ হস্তান্তরেরর মধ্য দিয়ে মিন্দানাও ৩৭৭ বছর পর্যন্ত স্পেন ও আমেরিকার ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড়ে আবদ্ধ থাকে। পরবর্তীকালে মরো মুসলমানরা নিজেদের ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ৩৭৭ বছর পর্যন্ত এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়েও মরো মুসলমানরা তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

বিশ শতকের শুরুতে আমেরিকা Bates Treaty (1902), Carpenter Agreement (1915) এবং Treaty of paris (1898)-এর শর্তানুযায়ী ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে স্পেন থেকে ফিলিপাইনের কর্তৃত্ব লাভ করে। কর্তৃত্ব লাভের পর মার্কিন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অবৈধ ও অমানবিক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মিন্দানাওয়ের সমস্ত জমির মালিকানা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করে এবং মরো মুসলমানদেরকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে খৃস্টানদেরকে সে সমস্ত জমি বরাদ্দ দেয়। ফিলিপাইনের উত্তরাঞ্চল থেকে এ সমস্ত খৃস্টানদেরকে এনে মিন্দানাওয়ে বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়া হয়।

মিন্দানাওয়ে খৃস্টানদের বসতি স্থাপনের এ প্রক্রিয়া ১৯৩৫ সালে শুরু হয় এবং ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল থেকে ৪ (চার) মিলিয়ন খৃস্টান এ এলাকায় এসে বসবাস শুরু করে। এভাবেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মিন্দানাওকে খৃস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত করা হয়। মিন্দানাওয়ে মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত করার মার্কিন ফিলিপাইন চক্রান্তের বিরুদ্ধে মরো মুসলমানরা ফিলিপাইনের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় থেকেই সোচ্চার প্রতিবাদ করে আসছে। ১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই ফিলিপাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

ফিলিপাইনের জুলু দ্বীপটিতে মুসলমানদের সংখ্যা বর্তমানে ৯৮%। এ দ্বীপটি ম্যানিলা থেকে ৯৬০ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত। এ দ্বীপবাসীর প্রধান জীবিকা হলো মাছ শিকার করা। ৭০% মুসলমান মাছ শিকার করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বাকীরা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত।

জুলু দ্বীপের মোট জনসংখ্যার ৫০% বেকার। শিক্ষার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে মরো মুসলমানরা স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে বিগত ৩০ বছরে ফিলিপাইন সরকার ১,২০,০০০ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বিগত ত্রিশ বছর যাবত যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় এ দ্বীপাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে এ অঞ্চলের জনগণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থায় উপনীত হয়েছে। তারা আজ চরম আর্থিক সংকট মোকাবেলা করে চলছে। কিন্তু মুসলমানদের এ আর্থিক সংকটও তাদেরকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিরত রাখতে পারছে না। ম্যানিলা সরকার মুসলিম স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে কৌশলে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষে Divide and rule policy অবলম্বন করেছে। এ বিভেদ নীতির অংশ হিসেবে ১৯৯৬ সালে নূর মিশৌরীর নেতৃত্বাধীন Moro National Liberation Front (MNLF)-এর সাথে ম্যানিলা সরকার এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। এ চুক্তির ফলে মিন্দানাও অঞ্চলের ৪টি প্রদেশে MNLF -এর নেতৃত্বে মুসলমানদের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নূর মিশৌরী ম্যানিলা সরকারের অধীনে মিন্দানাওয়ের নির্বাচিত গভর্নর হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অবশ্য ফিলিপাইনের বর্তমান সরকারের সাথে তাঁর মতদ্বৈতার কারণে তিনি ক্ষমতাচ্যূত হন।

বর্তমান সংকট

মরো মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম গেরিলা গ্রুপ Moro Islamic Liberation Front (MILF) বর্তমানে সশস্ত্র আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছে। MILF এর এ সশস্ত্র আন্দোলন সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে যোশেপ এস্ট্রাডার ক্ষমতারোহণের (বর্তমানে ক্ষমতাচ্যূত) পর থেকেই MILF সশস্ত্র যুদ্ধের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। এর পেছনে প্রধানত ৪টি কারণ বিদ্যমান রয়েছে। কারণগুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রথমতঃ সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত কট্টোরপন্থী নেতা আবু সায়েফ গ্রুপ মিন্দানাওয়ের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রাখার

www.pathagar.com

লক্ষে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ফিলিপাইন সরকারের উপর অব্যাহত চাপ বৃদ্ধি করার লক্ষে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে তারা সরকারী কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপহরণ করছে। এতে সরকারের উপর দেশী ও বিদেশী চাপ বৃদ্ধি পাবে এবং সরকার বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত মিন্দানাওয়ের স্বাধীনতা মেনে নেবে বলে তাদের বিশ্বাস।

দ্বিতীয়তঃ MILF-এর ১৫,০০০ সশস্ত্র যোদ্ধা রয়েছে যারা মিন্দানাওয়ের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করেছে। ফলে যুদ্ধ আলোচনার টেবিলের পরিবর্তে ময়দানে ছড়িয়ে পড়েছে।

তৃতীয়তঃ MNLF-১৯৯৬ সালে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি অব্যাহত রাখার পক্ষে। এ চুক্তির ফলে মিন্দানাও সীমিত স্বায়ত্বশাসন ভোগ করছে।

চতুর্থতঃ ম্যানিলা সরকার মরো মুসলমানদের দাবী অনুযায়ী মিন্দানাওয়ের স্বাধীনতা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সরকার মনে করে এ ধরনের দাবী মেনে নেয়া হলে দেশের অখণ্ডতা বিনষ্ট হবে।

সংকটের কারণ ও সমাধানের দাবী

ম্যানিলা সরকারের দমননীতি এবং মিন্দানাওয়ের প্রতি উপেক্ষার কারণে মরো মুসলমানদের মনে ম্যানিলা সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। এ আগুন প্রোজ্জল থেকে প্রোজ্জলিত হচ্ছে এবং প্রতিটি ফিলিপিনো মুসলমানের হৃদয়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এ দাবানলের বর্হিঃপ্রকাশই হলো সশস্ত্র গ্রুপের উত্থান। বর্তমানে মুসলমানদের দুটো গ্রুপ মিন্দানাওয়ের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। এ গ্রুপ দুটো হলো MNLF (Moro National Leberation Front) ও MILF (Moro Islamic Leberation Front)। এ গ্রুপ দুটির নেতৃত্বে রয়েছেন যথাক্রমে নূর মিসৌরী ও আবু সায়েফ। আবু সায়েফের নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি ছোট হলেও মিন্দানাওয়ের স্বাধীনতার ব্যাপারে দলটি আপোসহীন। অপর দিকে নূর মিসৌরী একজন মধ্যমপন্থী নেতা। তিনি মনে করেন মিন্দানাওয়ের স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি সরকারের সাথে আলোচনাও অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিঘোষিত নীতিমালার আলোকে ১৯৯৬ সালে নূর মিসৌরী ম্যানিলা সরকারের সাথে একটি শান্তিচুক্তিতে

www.pathagar.com

স্বাক্ষর করে মিন্দানাওয়ের সীমিত স্বায়ত্বশাসন লাভ করেন। অপরদিকে আবু সায়েফ একজন কট্টরপন্থী নেতা। তিনি যে কোনো আলোচনার বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করেন মিন্দানাওয়ের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধই একমাত্র পথ। আবু সায়েফের মতে মিন্দাওয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকে এ পর্যন্ত লাখ লাখ মরো মুসলমান শাহাদাতবরণ করেছে এবং কয়েক লাখ পার্শ্ববর্তী মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। ইতোমধ্যেই এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, মালয়েশিয়ার সাবা অঞ্চলে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন ফিলিপিনো মুসলমান আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের পাইকারী হারে গণহত্যা ও দেশ থেকে বিতাড়নের প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করার জন্য সশস্ত্র গেরিলা নেতা আবু সায়াফ একটি আর্ন্তজাতিক কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। Radical Militant Group নেতা আবু সায়াফ তাদের এ মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থনও কামনা করেছেন। ইতোমধ্যেই একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে মুসলিম নিধন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত চিত্র জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আসিয়ান ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থাকে তারা অবহিত করেছেন।

দক্ষিণ ফিলিপাইনের বর্তমান সংকট অত্যন্ত কঠিন ও গভীর। এ সংকট নিরসনের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকারের সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু ম্যানিলা সরকার এ ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে আসছে। ফলে সংকটের সুরাহা না হয়ে তা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। মুক্তিকামী মরো মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবী চিরতরে মিটিয়ে দেয়ার জন্য সরকার অব্যাহতভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করছে। এ অঞ্চলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার তার সামরিক শক্তির মোট ৬০% অংশ প্রয়োগ করছে। সামরিক শক্তি শুধু মুসলিম গেরিলা নেতা আবু সায়াফের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হচ্ছে না বরং এ অঞ্চলের নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্টদের সশস্ত্র সংগঠন New peoples' Army ও অন্যান্য নিষিদ্ধ ঘোষিত ক্ষুদ্র উপদলগুলো দমন করার কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্ষমতাচ্যূত প্রেসিডেন্ট এস্ত্রাডা সরকারের শাসনামলে সামরিক অভিযানের ফলে হাজার হাজার মরো মুসলমান নিহত হয়েছে এবং যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশের অঙ্গহানীর ফলে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে। এছাড়াও ত্রস্ত্রাডার সামরিক অভিযানের ফলে দক্ষিণ ফিলিপাইন থেকে প্রায় ৫ লাখ লোক গৃহহারা হয়েছে। ত্রস্ত্রাডা

www.pathagar.com

সরকারের এ নির্মম সামরিক অভিযানের লক্ষ ছিল মিন্দানাওকে মুসলিম শূন্য করা। এ লক্ষ অর্জনের জন্য সরকার Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte এবং North Cotaleato প্রদেশসমূহ থেকে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন মুসলমানকে গৃহত্যাগে বাধ্য করেছে।

মিন্দানাও সংকট নিরসনের উপায়

"যুদ্ধ নয় আলোচনা"-এ নীতিই মিন্দানাওয়ের বর্তমান সংকটের একমাত্র পথ বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছেন। অবশ্য ফিলিপাইনের সাবেক একনায়ক ফার্দিনান্দ মার্কোস বিশ্বাস করতেন যে, বন্দুকের নলই মরো মুসলমানদের স্বাধীনতার স্বপ্ন চিরতরে মিশিয়ে দিতে সক্ষম। এ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই ১৯৭০ সালে স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারের এ ভুল সিদ্ধান্তের ফলে পুরো দক্ষিণ ফিলিপাইনে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে সরকারকে প্রচুর সামরিক ও আর্থিক ব্যয়ের ঝুঁকি নিতে হয়। কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণতি সরকারের জন্য শুভ হয়নি। এ যুদ্ধের ফলে ম্যানিলা সরকারের উপর যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত থাকে। যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধিশালী দেশটি চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সংকট নিরসনের জন্য সরকারের নিকট বর্তমানে তিনটি বিকল্প পথ খোলা আছে। সম্ভাব্য সমাধানের পথগুলো হলো ঃ

প্রথমতঃ মিন্দানাও অঞ্চলের পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করা।

দ্বিতীয়তঃ ফেডারেল সরকার পদ্ধতি কায়েম করা।

তৃতীয়তঃ আলোচনার মাধ্যমে মিন্দানাও অঞ্চলের স্বাধীনতা প্রদান করা।

মরো মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী প্রধান ও বৃহৎ সংগঠন MNLF (Moro National Liberation Front) প্রথম বিকল্পটি মেনে নেয়। কিন্তু সরকার পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে সীমিত স্বায়ত্বশাসন প্রদানে সম্মত হয়ে ১৯৯৬ সালে একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। শান্তি চুক্তি অনুযায়ী মিন্দানাওয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে ঘোষিত তিনটি বিকল্প প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

www.pathagar.com

স্বায়ত্বশাসন

১৯৯৬ সালে MNLF এর সাথে ম্যানিলা সরকার এক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির ফলে মিন্দানাওয়ের ৪টি প্রদেশ সীমিত স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। স্বায়ত্বশাসন প্রাপ্ত প্রদেশগুলো হলো ঃ

ক. Lanao del Sur

খ. Maguindanao

গ. Sulu

ঘ. Tawi Tawi

আবু সায়াফের নেতৃত্বাধীন MILF-এ শান্তি চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। তাদের মতে এ চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের দাবীর যৌক্তিকতা তুলে ধরতে MNLF ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ভাষায় মুক্তিকামী মরো মুসলমানদের একমাত্র দাবী হলো স্বাধীন মিন্দানাও প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত MILF তাদের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। অবশ্য প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় MNLF চেয়ারম্যান ও মিন্দানাওয়ের বর্তমান গভর্নর জনাব নূর মিসৌরীও শান্তি চুক্তির সমালোচনা করছেন। তিনি বলেন, চুক্তির শর্তানুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদেরকে দ্রুত পুনর্বাসিত করা হবে এবং এ অঞ্চলের ব্যাপক পুনর্গঠনের জন্য সরকার মার্শাল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু কার্যত সরকার চুক্তির শর্তানুযায়ী উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা পালন করেনি। বরং প্রথম তিন বছর ছিল চরম ব্যর্থতায় ভরা। এক সাক্ষাতকারে জনাব নূর মিসৌরী বলেন, অবিলম্বে সরকার যদি ত্রিপোলী চুক্তি অনুযায়ী মিন্দানাওয়ের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসন প্রদান না করে এবং শান্তি চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলী পূরণে আন্তরিকতার পরিচয় না দেয় তাহলে মরো মুসলমানরা তাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই মিন্দানাওয়ের স্বাধীনতার জন্য আবার মুক্তিসংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হবে। ১৯৯৬ সালে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে The Arab News এক বিশেষ সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছে ঃ

"The problem in the past has been that Manila refused to talk to the various Muslim groups together. Instead it adopted a divide and rule strategy and culminated with the Moro National

www.pathagar.com

Liberation Front signing a peace treaty in 1996 and Nur Misuari being elected the Governor of the "Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM)." This left out the MILF and other disgrunted Muslim groups. In any event ARMM has turned out to be a failure."

অর্থ ঃ "অতীতের প্রধান সসস্যা ছিল ম্যানিলা সরকার স্বাধীনতাকামী মুসলিম গ্রুপগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে যৌথ আলোচনা সভার আয়োজন না করে "পৃথক কর" এবং "শাসন কর"-নীতি অবলম্বন করে। এ নীতির আওতায় ১৯৯৬ সালে নূর মিসৌরীর নেতৃত্বাধীন মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট এর সাথে ম্যানিলা সরকার একটি শান্তিচুক্তি করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী নূর মিসৌরী "স্বায়ত্বশাসিত মুসলিম মিন্দানাও"-এর গর্ভনর নির্বাচিত হন। এম আই এল এফ সহ অন্যান্য গ্রুপগুলোকে এ চুক্তির বাইরে রাখা হয়। ফলে আশংকা করা হচ্ছে যে কোনো এক সময় এ চুক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।"

শান্তিচুক্তির এ ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে Nur Misuari মনে করেন যে, ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তীমুরের সংকট নিরসনের লক্ষে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত গণভোটের ন্যায় একটি গণভোটই মিন্দানাওয়ের বর্তমান সংকট নিরসনের একমাত্র পথ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

ফিলিপাইনের বর্তমান সংবিধান সংশোধন করে একটি ফেডারেল শাসনব্যবস্থার অধীনে মিন্দানাওকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদানের লক্ষে ১৯৮৭ সালে ৩ জন সিনেটর সিনেট অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপন করেন। সরকার এ বিলের বিরোধিতা করে বলে, বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয়ই সমস্যার সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসন প্রদানই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ স্বায়ত্বশাসন প্রদানের জন্য সংবিধানের কোনো সংশোধনী আনা প্রয়োজন হবে না। অপরদিকে সংবিধান সংশোধন করা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। তাই বর্তমান সংবিধানের আওতায়ই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন বলে সরকার পক্ষের আলোচকরা মনে করেন। এ প্রসঙ্গে Chief Government Negotiator Mr. Aventajado বলেন ঃ

www.pathagar.com

"Autonony is an existing mechanism and we can offer this now to solve the hostage crisis. Autonomy is the first step. Later on if we are ready to offer federalism, then that's the time we can offer it to them."

অর্থ ঃ "স্বায়ত্বশাসন একটি বিদ্যমান পদ্ধতি এবং এ পদ্ধতির আওতায়ই বর্তমান সংকট নিরসনের জন্য তাদেরকে স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব দেয়া যায়। স্বায়ত্বশাসন প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীতে আমরা উভয় পক্ষ প্রস্তুত থাকলে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার গঠনের লক্ষে প্রস্তাবনা পেশ করা যাবে।"

অভিজ্ঞ মহলের মতে, ম্যানিলা সরকারের সামনে এখন দুটি বিকল্প পথ খোলা আছে। প্রথমটি হলো MILF নেতাদের সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে মিন্দানাওয়ের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা অথবা দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামোয় স্বাধীনতা প্রদান করা যাতে মরো মুসলমানরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী মিন্দানাও শাসন করতে পারে।

স্বাধীনতা

শতাব্দীর এ পুরনো সংকটের স্থায়ী সমাধান হলো মিন্দানাওকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা। কারণ সীমিত স্বায়ত্বশাসন বা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা মরো মুসলমানদের দীর্ঘদিনের সংকটের স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। এ প্রেক্ষাপটে প্রভাবশালী খৃস্টান নেতা Mr. Rasti Delizo বলেন, মরো মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিপূর্বে মার্কোস, এ্যাকিনো ও রামোস প্রশাসন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সকল উদ্যোগই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তিনি মনে করেন মরো মুসলমানদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের অবসান ঘটাতে হলে মিন্দানাওকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ম্যানিলা সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমরাও মনে করি ম্যানিলা সরকার যত দ্রুত এ বাস্তবতা মেনে নেবে তত দ্রুতই এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৭০ সাল থেকে মরো মুসলমানরা মিন্দানাওয়ের স্বাধীনতার জন্য ম্যানিলা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। এ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তারা তাদের দাবীর ব্যাপারে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে অনেকাংশেই সফলতা অর্জন করেছে। এ

www.pathagar.com

অর্জনের প্রথম মাইল ফলক হলো ১৯৯৬ সালে ম্যানিলা সরকার ও নূর মিসৌরির নেতৃত্বাধীন MNLF-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি। এ শান্তিচুক্তির ফলেই মিন্দানাও প্রদেশসমূহ স্বায়ত্বশাসন লাভ করে এবং নূর মিসৌরি নবগঠিত ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao)-এর গভর্নর নির্বাচিত হন। শান্তিচুক্তির বার বছর পর নূর মিসৌরি ঘোষণা করতে বাধ্য হন যে, শান্তিচুক্তির অর্জন শূন্যের কোটায়। তিনি বলেন, শান্তিচুক্তি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসন কায়েম না হলে মিন্দানাওয়ের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব তীমুরের ন্যায় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোটের আয়োজন করতে হবে। প্রস্তাবিত গণভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম মিন্দানাও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবী। স্বাধীন মিন্দানাও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মরো মুসলমানদের দীর্ঘদিনের রক্তাক্ত সংগ্রামের অবসান ঘটুক এবং স্বাধীন মিন্দানাওকে ঘিরে তাদের সোনালী স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন ঘটুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্রঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), সেপ্টেম্বর, ২০০০।
২. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড (সাপ্তাহিক), মক্কা, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০০০।

www.pathagar.com

পশ্চিম বঙ্গে মুসলমান ঃ অধিকার বঞ্চিত মানুষের কিছু কথা

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত। বিশ্বের বৃহত্তম প্রধান গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের একটি রাজ্য পশ্চিম বঙ্গ। এক সময় বাংলার মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। অথচ সাড়ে পাঁচশ' বছর যাবত এ বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজো ইতিহাসের সোনালী পাতায় লিপিবদ্ধ আছে আমাদের জাতীয় বীর মুর্শীদ কুলী খান, আলীবর্দী খান ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার শাসনামলের গৌরবগাঁথা।

মুসলিম শাসনামলে বাংলাকে Golden Bengal নামে অভিহিত করা হতো। কারণ এ সময় বাংলায় পাট ও ধানের বাম্পার ফলন হতো। সারা বাংলা ছিল কৃষিজাত পণ্যে সমৃদ্ধ। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলাকে বলা হতো বাংলার শস্যাগার (Granary of Bengal)। বাংলার এ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণেই ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে দানবীর হাজী মুহম্মদ মহসিন। হাজী মুহম্মদ মহসিন পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে তাঁর সমুদয় অর্থ ও সম্পদ দান করেন। তাঁর এ দানের কথা ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে আজো লেখা আছে। এ সময় পশ্চিম বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ভারত বিভাগের পূর্বে যাদের ইতিহাস ছিল গৌরবদীপ্ত ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতায় ভরপুর কালের পরিক্রমায় বিজাতীয় শাসন ও শোষণের ফলে আজ তারা দরিদ্র ও নিঃস্ব। তারা আজ অদক্ষ ও বেকার জনশক্তি হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে বাঙালী মুসলমানরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে (ভারত) বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা এখন আর এক দেশ ও এক পতাকায় পরিচিত নয়। অবশ্য মুসলমান হিসেবে তারা একই জাতিভুক্ত এবং মুসলিম উম্মাহর সদস্য।

এ প্রবন্ধের মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও শিক্ষাদীক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত চালচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

www.pathagar.com

বাংলায় মুসলমানদের আগমন

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তের শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানরা সর্বপ্রথম পশ্চিম বঙ্গে আগমন করে। অবশ্য অনেক মুসলিম স্কলার ও বুদ্ধিজীবী এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মনে করেন যে, তের শতকের পূর্বেই মুসলমানরা পশ্চিম বঙ্গে আগমন করে। পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানদের আগমনের ফলে গ্রামাঞ্চলে দ্রুত গতিতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। এর প্রধান কারণ হলো গ্রামাঞ্চলের মানুষ সাধারণতঃ সহজ-সরল হয়ে থাকে এবং নিজেরাই নিজেদের ভালো-মন্দের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। তের ও চৌদ্দ শতক ছিল ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের স্বর্ণোজ্জল সময়। এ সময় পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৮৭২ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৪৮% ভাগই ছিল মুসলমান। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখানো হলো ঃ

মোট জনসংখ্যা ঃ ৬০ মিলিয়ন
মুসলমান ঃ ২০ মিলিয়ন
মুসলমানদের শতকরা হার ঃ ৩০%
মোট জেলা ঃ ১৭টি
মুসলিম প্রধান জেলা ঃ ২টি
(ক) মুর্শিদাবাদ–৫৮.৬৬%
(খ) উত্তর দিনাজপুর –৬০%
শিক্ষার হার ঃ ৬০%
মুসলমানদের শিক্ষার হার ঃ ২৫%
মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়নরত
মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ঃ ২.৩%
কলেজে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ঃ ০.৫
মেডিকেল কলেজে মুসলিম ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ঃ ০.২%
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ঃ ০.১%
মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুল সংখ্যা ঃ ১২টি
মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কলেজের সংখ্যা ঃ নেই
সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা ঃ ২%
মুসলিম এস. পি. ঃ ৫ জন
মুসলিম এম. এল. এ. ঃ ৪৩ জন

www.pathagar.com

এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৮৭২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪৮% এবং ১৯৮১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী তা এসে দাঁড়ায় ২১.৫১%-এ। এর প্রধান কারণ হলো '৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর ভারতীয় সরকার মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতন ও যুলুম শুরু করে। সরকারের এ ঘৃণ্য নির্যাতনের শিকার হয়ে বহু মুসলমান তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় অনেক মুসলমান নিহত হয়। প্রধানতঃ এ তিনটি কারণেই পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে তা পর্যায়ক্রমে হ্রাস পায়।

পশ্চিম বঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা

১৯৮১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা ১,১৭,৪৩,২৫৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬১,০০,৫১৭ জন এবং মহিলা ৫৬,৪২,৭৪২ জন। অপর এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে ভারতীয় মুসলমানদের ৫০% অংশ বাস করে উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিম বঙ্গে। পশ্চিম বঙ্গে বসবাসকারী মুসলমানদের জেলাভিত্তিক একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

জেলাভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যা

মুর্শিদাবাদ	৫৮.৬৬%
মালদহ	৪৫.৩%
পশ্চিম দিনাজপুর	৩৫.৮%
বীরভূম	২৯.১৬%
নদিয়া	২৪.১%
২৪ পরগণা	২৩.৯%

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বর্তমানে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায়ই মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমান

ভারতীয় মুসলমানদের দুর্ভাগ্য এই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে তারা চরম বৈষম্যের শিকার। অথচ ভারতীয় সংবিধানের ৩০-২ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

"The state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language."

অর্থ ঃ "ধর্ম, ভাষা কিংবা সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনোরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করে না।"

৩০-১ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"All minorites, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

অর্থ ঃ "ধর্ম ও ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের তাদের পসন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকর রয়েছে।"

১৫-১ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

অর্থ ঃ "ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, সেক্স, জন্মস্থান ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করে না।"

ভারতীয় সংবিধানের উল্লিখিত ধারাসমূহে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ভারত সত্যিকার অর্থেই অসাম্প্রদায়িক, উদার গণতান্ত্রিক ও সব নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী একটি রাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবে আদৌ তা সত্য নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত চরিত্রের এ দিকটি অত্যন্ত ভয়াবহ ও কুৎসিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষায় হিন্দুদের চেয়ে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। ১৯১১, ১৯২১ এবং ১৯৩১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী মুসলমানদের শিক্ষার হার ছিল যথাক্রমে ৫, ৯ ও ১১। উনিশ ও বিশ শতকে মুসলমানদের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সে হারে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়নি।

www.pathagar.com

'৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে মুসলিম রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, আমলাসহ সচ্ছল ব্যক্তিরা তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে। ফলে পশ্চিম বঙ্গে মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজে বড় ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ও রক্তপাত এড়াতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানরা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে। তাদের এ আগমনের গতি '৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মুসলমানদের পক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে বড় ধরনের কোনো উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়নি। এ সমস্ত কারণেই পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানরা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে।

এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, প্রাইমারী স্কুলে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির হার সন্তোষজনক হলেও জুনিয়র লেবেলে এসে তাদের ড্রপ আউটের পরিমাণ ৬০.০১% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এর পেছনে মূল কারণ হলো আর্থিক সংকট। ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ২%-৩%। অপরদিকে মাদরাসা শিক্ষায় ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম বিধায় অধিকাংশ মুসলিম শিশু-কিশোররা মাদরাসায় লেখাপড়া করে থাকে। এ সমস্ত মাদরাসার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাদরাসাই পশ্চিম বঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের এফিলিয়েটেড নয়। এতে ব্যক্তি বা সমাজকল্যাণ সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদরাসা হতে শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে বৈষয়িক জ্ঞানে পিছিয়ে পড়ে। ফলে সরকারী চাকরিতে নিয়োগ ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা সফলতা অর্জন করতে পারছে না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম ছাত্রদের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে পশ্চিম বঙ্গের এম. এল. এ. জনাব সুলতান আহমদ মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ

> "Every year, after Merit test, 800 students get admission in the medical stream, out of 800 only 10 are Muslim students. Similarity, out of about 1200 students getting admission in the engineering course, only 12 or 13 are Muslim, Just barely one percent."

অর্থ ঃ "প্রতি বছর মেধা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ৮০০জন ছাত্র-ছাত্রী মেডিকেলে ভর্তি হয়। এর মধ্যে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র

www.pathagar.com

১০জন। অনুরূপভাবে প্রতি বছর প্রকৌশল বিভাগে ১২০০জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ১২-১৩জন। যার শতকরা হার ১জন।"

মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষে ইসলামিয়া কলেজ ও লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং '৪৭-এর দেশ বিভাগের পূর্বপর্যন্ত এ দুটি কলেজ শুধুমাত্র মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা নেই। বর্তমানে ইসলামিয়া কলেজ (মাওলানা আযাদ কলেজ) ও লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯০%। অবশিষ্ট ১০% মাত্র মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী। এ ১০% ছাত্র-ছাত্রীকে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হয় না। তাদেরকে শুধুমাত্র উর্দু, ফার্সী ও আরবী বিভাগেই অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হয়। এভাবেই পশ্চিম বঙ্গে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনাব সুলতান আহমদ বলেন, "এ বিশ্ববিদ্যালয়টি মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে এখানে ৮০% শিক্ষকই অমুসলিম।" অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিসংখ্যান উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"Hindus are competing particularly for the medical and engineering course. 60% or 70% of the boys in the medical and engineering faculties are non-Muslims in the Aligarh Muslim University. What do you expect from other educational institutions."

অর্থ ঃ "আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ও প্রকৌশল বিভাগে ৬০% বা ৭০% জনই হিন্দু ছাত্র ভর্তি হয়। ফলে অন্যান্য মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কি আশা করা যায় ?"

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানরা নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিজস্ব কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৬ (ছয়) বছর পূর্বে সরকারের অনুমোদন প্রার্থনা করেছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিগত ৬ (ছয়) বছর যাবৎ তাদের আবেদনপত্রটি ঝুলিয়ে রেখেছে। দেশের প্রচলিত

www.pathagar.com

আইনঅনুযায়ী পূর্বাহ্নে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা আইনসম্মত নয়। অপরদিকে South India-য় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে মুসলমানরা Medical ও Enginering কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের কমিউনিস্ট সরকারই শুধুমাত্র রিলাক্ট্যান্ট (Reluctant) -এর ভূমিকা পালন করছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সুলতান আহমদ বলেন, সিপিএম-এর শাসনামলে বিগত বিশ বছর যাবত পশ্চিম বঙ্গে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে ইসলামিয়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। হাসপাতালটিতে আধুনিকায়নের কাজ চলছে। এ ব্যাপারে জেদ্দাভিত্তিক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছে। জনাব সুলতান আহমদ হাসপাতালটির সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। হাসপাতালটিকে কেন্দ্র করে একটি নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতি বছর ২৫ জন ছাত্রী এখানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। ২৫ জন ছাত্রীর মধ্যে ২০ জন মুসলমান এবং ৫ জন অমুসলিম। বর্তমানে কলকাতা শহরে ২২০টি বালক এবং ১৯১টি বালিকা বিদ্যালয় চালু রয়েছে। এর মধ্যে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা মাত্র ১২টি যা চাহিদার তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। মাদরাসা শিক্ষা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন রয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য 'পশ্চিম বঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড' কর্মরত রয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হলো—এখানে শিক্ষার মান একেবারেই নিম্নমানের। ফলে মাদরাসা বোর্ড থেকে ডিগ্রী অর্জন করার পর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা নিজেদেরকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারছে না। অপর দিকে সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

পশ্চিম বঙ্গে মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রমের একটি চিত্র ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

www.pathagar.com

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মাদরাসার শ্রেণী বিভাগ	অনুমোদিত মাদরাসার সংখ্যা (১৯৯৯)	ছাত্র সংখ্যা (১৯৯২)	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯৯২)
উচ্চ মাদরাসা (High Madrasah) শ্রেণী ঃ ৫ম–১০ম	১৭৪	৫৬,৫০০	১১,৭৫৬
জুনিয়র হাই মাদরাসা (Junior High Madrasah)	১৪০	৩২,৫০০	--
জুনিয়র মাদরাসা (Junior Madrasah	১৩	২,৫০০	--
সিনিয়র মাদরাসা (Senior Madrasah)			৮০০
ক) আলিম	৭৪	১৫,২০০	৬০০
খ) ফাজিল	১৫	৩,৭৫০	২৫০
গ) কামিল	৪	৫০০	(১৯৯১ইং)
মোট	৪২০	১১০,৯৫০	১৩,৪০৬

শিক্ষক ও অন্যান্য স্টাফদের সংখ্যা

৪২০টি মাদরাসার জন্য মোট শিক্ষক সংখ্যা ৪,২৯৮ জন

৪২০টি মাদরাসার জন্য অন্যান্য স্টাফ সংখ্যা ১,২১৮ জন।

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক নয় এবং অস্থিতিশীল। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, ৭০% মুসলমান দারিদ্রসীমার নীচে জীবন যাপন করছে। অবশিষ্টদের অবস্থাও খুব ভালো নয়।

www.pathagar.com

সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের অবস্থা

সরকারী বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকরিতে যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এভাবেই সরকারী চাকরিতে তাদের যোগদানের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। '৪৭-এর দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের সরকারী চাকরিতে যোগদানের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরতে গিয়ে পশ্চিম বঙ্গের এম. এল. এ. জনাব সুলতান আহমদ বলেন ঃ

"For the last 50 years, after partition/independence, Muslims have been denied jobs in government services. Now their representation has come to 2% out of total govt. Jobs. This is very miserable. Out of 25% of Muslim population, Muslims are making only 2% in government services."

অর্থ ঃ "স্বাধীনতা উত্তর বিগত ৫০ বছর যাবত মুসলমানরা সরকারী চাকরি করা থেকে বিরত থাকে। বর্তমানে মুসলমানরা সরকারী চাকরিতে যোগদান করছে এবং তাদের সংখ্যা মোট সরকারী চাকরিজ ীবীদের ২% অংশ। এটা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত করুণ একটি অবস্থা। মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ২৫% হওয়া সত্ত্বেও সরকারী চাকরিতে তাদের অংশগ্রহণ মাত্র ২% জন।"

Indian Administrative Service (IAS) ভারতীয় ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে অত্যন্ত Prestigious service। এই Prestigious Service-এ মুসলমানদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ক. আই. এ. এস ও আই. পি. এস	১.৩%
খ. নির্বাহী ও জুডিসিয়াল পদ	২.৬%
গ. পুলিশ বিভাগ	৬.৪%
ঘ. কলকাতা কর্পোরেশন	১০.৪%

India Administrative service-এর আওতায় পশ্চিম বঙ্গের কর্মকর্তাদের সংখ্যা ২৪৮। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৫ জন। ১৯৯৫ সালের এক পরিসংখ্যানে পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ বাহিনীতে

www.pathagar.com

মুসলমানদের অবস্থান সম্পর্কে যে তথ্য জানা যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. মোট পুলিশ সংখ্যা	৫৯,১৩৭ জন
খ. মুসলমান পুলিশ	৩,৪৪২ জন
গ. মুসলমান পুলিশের শতকরা হার	৫.৮%
ঘ. মুসলিম জনসংখ্যার হার	২৩.৬১%

জনাব সুলতান আহমদ Muslim World League Journal-কে জানান, প্রতি বছর পশ্চিম বঙ্গ ক্যাডার সার্ভিসে (WBCS) ৭০০ লোককে নিয়োগ দেয়া হয়। এতে মুসলমানদের সংখ্যা ৩০%-৩৫%। এ ৩৫% জনের মধ্যে উর্দুভাষী ২০%-২৫% জন এবং অবশিষ্টরা বাংলাভাষী মুসলমান।

রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলমান

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানরা একেবারেই দ্বিধা বিভক্ত। কারণ তাদের জাতীয় বা আঞ্চলিক কোনো রাজনৈতিক দল নেই। অবশ্য সব দলেই তাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে কংগ্রেস এবং সিপিএম এর সাথেই মুসলমানরা বেশি সম্পৃক্ত। এর মধ্যে গ্রামীণ মুসলমানরা বেশিরভাগই সিপিএম এর রাজনীতির সাথে জড়িত। সিপিএম-এর রাজনীতির সাথে মুসলমানদের অধিক হারে সম্পৃক্ততা প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি খুবই কম। অথচ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী অনুশাসন চর্চা করতে হলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা প্রশ্নের উর্ধে নয়।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে লোকসভা ও রাজ্য সভায় পশ্চিম বঙ্গ থেকে নির্বাচিত মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

ক. রাজ্যের মোট লোকসভা প্রতিনিধি	৪২ জন
খ. রাজ্যের লোকসভার মুসলিম প্রতিনিধি	৫ জন
গ. রাজ্যসভায় মোট সদস্য	১৬ জন
ঘ. রাজ্য সভায় মুসলিম সদস্য	২ জন

লোক সভায় নির্বাচিত ৫ জন মুসলিম সদস্যের পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালে লোকসভায় নির্বাচিত মুসলিম সদস্যবৃন্দ ঃ

ক্রঃ নং	নাম	রাজ্য	নির্বাচনী এলাকা	দলীয় পরিচয়
০১.	মোঃ ইদ্রিস আলী	পশ্চিম বঙ্গ	জাহাঙ্গীর পুর	কংগ্রেস (আই)
০২.	মাসুদুল হোসাইন	„	মুর্শিদাবাদ	সিপিআই (এম)
০৩.	হান্নান মোল্লা	„	উলুবেরিয়া	ঐ
০৪.	মেহবুব জিহাদী	„	কোতওয়া	ঐ
০৫.	এ. বি. এ. চৌধুরী	„	মালদহ	ঐ

জনাব সুলতান আহমদ জানান ২৯৪ জন নির্বাচিত এম. এল. এ-এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৪৩ জন। এ ৪৩ জনের মধ্যে ২০ জন কংগ্রেস এবং ২৩ জন বাম ফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত হন।

গণ মাধ্যমে মুসলমানদের অবস্থান

পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানদের উদ্যোগে কোনো বাংলা দৈনিক প্রকাশ করা হয় না। তবে ৪টি উর্দু দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত বাংলা সাপ্তাহিকগুলো প্রকাশিত হচ্ছে ঃ

সাপ্তাহিকগুলোর নাম ও প্রচার সংখ্যা ঃ

ক্রঃ নং	নাম	প্রচার সংখ্যা	মন্তব্য
০১.	কলম	১২,০০০	-
০২.	নতুন গাও	৪,০০	-
০৩.	মিজান	নিয়ন্ত্রিত সার্কুলেশন	জামায়াতে ইসলামী হিন্দ পরিচালিত
০৪.	পয়গাম	বর্তমানে বন্ধ	-

কমিউনিস্ট শাসিত পশ্চিম বঙ্গ

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মুসলমানদের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের মুসলামনরা আদর্শিক দিক থেকে বিভিন্নমুখী সমস্যা ও চাপের মধ্যে রয়েছে। সিপিআই (এম) সরকার মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

www.pathagar.com

স্কুল ও কলেজগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অপরদিকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে সিলেবাসে এমন সব বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা পড়ে একজন শিক্ষার্থী তার ধর্মীয় পরিচয় ভুলে গিয়ে একজন Atheist (নাস্তিক) হিসেবে গড়ে উঠবে। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে তাদের Brain Washed হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদেরকে Atheists হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করবে। তাই আগামী দিনের পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানদের জন্য এক কঠিন অবস্থা অপেক্ষা করছে।

আশার আলো

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের জীবনে আমানিশার গাঢ় অন্ধকার বিরাজ করলেও ভবিষ্যতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে উদীয়মান সূর্যের ক্ষীণ আলোক রশ্মীর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যালঘুদের সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান পেশ করার জন্য Minority Commission নামে একটি কমিশন গঠন করেছে। কমিশন ইতোমধ্যেই দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রের মুসলমানদের অবস্থা জরীপ করা শুরু করেছে। সরকার শুভচিন্তা থেকে কমিশন গঠন করে থাকলে আশা করা যায় ভবিষ্যতে নির্যাতিত ও আশাহত মুসলমানরা আশার আলো খুঁজে পাবে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা আশা করছে কমিশনের কার্যক্রমের আওতা পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে এবং তাদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সুপারিশ করবে। কিন্তু কমিশনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা এখনো নেতিবাচক। আমরা আশা করবো সরকার তার নেতিবাচক ভূমিকা পরিহার করবে এবং পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের জন্য অপর একটি আশার কথা হলো, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর সাইয়্যেদ হামীদ মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে All India Education Movement নামে একটি আন্দোলন শুরু করেছেন। এ আন্দোলনে পশ্চিম বঙ্গের মুসলিম শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ শিক্ষা আন্দোলনকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁরা নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ইতোমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের মুসলিম নেতৃবৃন্দ Islamic Educational & Welfare Trust নামে একটি

১৫—

www.pathagar.com

ট্রাস্ট গঠন করেছেন। এটি একটি রেজিস্টার্ড সংগঠন। সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ

১. সকল মুসলমানের জন্য ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষা নিশ্চিত করা।

২. শিক্ষার মানোন্নয়ন করা যাতে মুসলিম শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় সফলতার ছাপ রাখতে পারে।

(৩) শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণভাবে শিক্ষার্থী এবং বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া। এ শিক্ষা আন্দোলনের অংশ হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আবাসিক ইসলামিক মিশনারী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই কলকাতা শহর সংলগ্ন ২৪ পরগনায় একটি আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

Islamic Educational & Welfare Trust ছাড়াও ১৯৯৪ সালে পশ্চিম বঙ্গের মুসলিম নেতৃবৃন্দ Institute of Islamic Education and Research নামে অপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। এটিও একটি রেজিস্টার্ড সংগঠন। এর মূল্য উদ্দেশ্য হলো ঃ

এক. আল কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা।

দুই. ইসলামী শিক্ষা বিস্তার করা।

তিন. মেধাবী, গরীব ও ইয়াতিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা দেয়া।

চার. বৃদ্ধ ও বিধবাদের আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা দেয়া।

পাঁচ. কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করা।

ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে হুগলী জেলায় ৫টি কুরআনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আগামীতে দাতব্য চিকৎসালয়, ইয়াতিম খানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বেসরকারী মুসলিম সংগঠনগুলোর কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের সক্রিয় ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের অমাবশ্যার রাত কেটে যাবে এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সোনালী সূর্য উদিত হবে—ইনশাআল্লাহ্!

সেদিন বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীনতার প্রতীক এবং বিশ্বের স্বাধীনচেতা মানুষের প্রেরণার উৎস শহীদ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার রক্তমাখা শার্টই হবে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের

www.pathagar.com

স্বাধীনতার প্রেরণার উৎস। আমরা পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রতিক্ষায় রইলাম।

তথ্যসূত্র ঃ

১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), ডিসেম্বর '৯৮ ও জানুয়ারী '৯৯।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

৩. আর কোনো পলাশী নয়, ১৯৯৭।

www.pathagar.com

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুসলমান ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত একটি বিশাল দেশ। সংবিধান অনুযায়ী দেশটি অসাম্প্রদায়িক, উদার গণতান্ত্রিক ও জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সব নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী একটি রাষ্ট্র। কিন্তু বিগত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস কি তা প্রমাণ করে ? ১৯৪৭ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সরকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর কি আচরণ করেছে চলমান ইতিহাস তার নির্মম সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বিবেকবান মানুষ যখন ইতিহাসের এ পাতাগুলো উল্টায় তখন সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের নির্মম নির্যাতন ও বিভৎসতা দেখে হতবাক হয়ে যায়। ইতিহাসের এমনি এক প্রেক্ষাপটে উত্তর-পূর্ব ভারতের মুসলমানদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

উত্তর-পূর্ব ভারত সাতটি রাজ্য নিয়ে গঠিত। রাজ্যগুলো হলো ঃ

(ক) আসাম (খ) মনিপুর (গ) নাগাল্যান্ড (ঘ) ত্রিপুরা (ঙ) মেঘালয় (চ) মিজোরাম ও (ছ) অরুণাচল। এ সাতটি রাজ্যের (প্রদেশ) মোট আয়তন ২৫৫০৩৭ বর্গ কিলোমিটার যা ভারতের মোট আয়তনের ৮% অংশ এবং ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ৩২ মিলিয়ন যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩.৯%। বর্তমানে এ অঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখে ভারতীয় শাসক গোষ্ঠির ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে। কারণ এ সাতটি রাজ্য ইতোমধ্যেই ভারতীয় অক্টোপাশ থেকে মুক্তির লক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছে।

স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরীদের অব্যাহত মুক্তি সংগ্রাম এক দিকে ভারতীয় শাসক গোষ্ঠিকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে অপর দিকে এ সাতটি রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা অবিভক্ত ভারতের জন্য এক মহাবিপদ সংকেত হিসেবে দেখা দিয়েছে। কারণ ভারতের ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এ অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম।

এ অঞ্চলের জনগণ তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে এবং তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করছে। সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে কেন্দ্রীয় সরকার এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেও কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা

www.pathagar.com

করেনি। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি এ অঞ্চলের জনগণের মনে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ক্ষোভ ও বিদ্বেষের চূড়ান্ত পরিণতি হলো ৭টি রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এ সাতটি রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে পাকিস্তান ভিত্তিক এন. জি. ও, বিভিন্ন মুসলিম সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের ইন্ধন রয়েছে বলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময় অভিযোগ করেছে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট দেশ, ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থাসমূহ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এ অঞ্চলের গোলযোগের প্রকৃত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করছে। অবশ্য এ অঞ্চলের Historical Back ground -এর দিকে লক্ষ করলে সহজেই বিদ্রোহের কারণ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব বলে সচেতন মহলের ধারণা।

ঐতিহাসিক পটভূমি

স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর সীমানা চিহ্নিতকরণ ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র স্বীকৃত হলেও এ সাতটি রাজ্যের সীমানা ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ স্বাধীনতা লাভের সময়ই আসাম সিলেট জেলা (দুটি মহকুমা আসামের সাথে থেকে যায়) এবং Cachar district-এর বিরাট অংশ হারায়। ফলে আসামের মূল সীমানায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় আসামের কিছু কিছু অংশ অন্য রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৫০ সালে Golaghat-এর Dimapur অঞ্চলটি নাগা পার্বত্য জেলার অর্ন্তভুক্ত করা হয়। ১৯৬৩ সালে নাগাল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হলে পুরো ডিমাপুরকে নাগাল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও ১৯৭২ সালে আসামকে খণ্ডিত করে মেঘালয় রাজ্য গঠন করা হয়। ফলে বিশাল আসাম রাজ্যটি খণ্ড-বিখণ্ড করে ক্ষুদ্রাকার রাজ্যে পরিণত করা হয়। ভবিষ্যতে বৃহৎ আসামের জনগোষ্ঠী যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারে সেজন্যই কেন্দ্রীয় সরকার আসাম রাজ্যটিকে খণ্ড বিখণ্ড করে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আসামের জনগণের মনে ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকেই ভারতের এ অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে এখানে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী আন্দোলন দানাবেঁধে ওঠে। এ আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়েই ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের

www.pathagar.com

রাজ্যগুলোতে এখন স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এ অঞ্চলের জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের যৌক্তিক কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে "Identity and Nation-building in Northeast India" গ্রন্থের লেখক Mr. A.C. Talukder বলেন,

"The ethnic movements in the North-east are mainly directed towards the recuperation of traditional rights and maintaining their legitimate cultural, social, linguistic and political rights. They are not products of parochialization of social consciousness, but a product of long years of neglect, discrimination and misunderstanding and the consequence of all ill-chosen strategy of development and nation-building, which could not meet the requirements within the framework of the Indian constitution and a liberal democratic society."

অর্থ ঃ "উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় নৃতাত্ত্বিক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সংখ্যালঘু জাতিসত্তার লোকদের ঐতিহ্যগত অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের বৈধ সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভাষাগত এবং রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করা। তারা সংকীর্ণ সামাজিক চেতনার সৃষ্টি নয় বরং দীর্ঘ অবহেলা, বৈষম্য, ভুল বুঝাবুঝি এবং উন্নয়ন ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে কৌশল নির্ধারণে ভারতীয় সংবিধান এবং উদার গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর আওতায় তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়নি।"

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সকল উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া কোনো অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের মুসলমানরা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৈষম্যেরই শিকার নয় বরং রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত রয়েছে। সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে এ বৈষম্য সবচেয়ে বেশি। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিম্নে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর Indian Administrative Service-এ মুসলমানদের অবস্থানগত একটি চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

www.pathagar.com

States	Authorised cadre strength	Total No. of officers in position	No. of Muslims	Percentage of Muslim	Percentage of Muslim population as per 1971 census
Assam	170	148	1	0.68	24.03
Manipur	126	84	2	2.38	6.61
Meghalaya	0	0	0	0	2.60
Nagaland	48	42	0	0	0.58
Tripura	0	0	0	0	6.68

১. নাগাল্যান্ড ঃ

নাগাল্যান্ডের মোট জনসংখ্যা ১.৮ মিলিয়ন। মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এ রাজ্যটি খৃস্টানদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে।

২. মনিপুর ঃ

মনিপুরের মোট জনসংখ্যা ২ মিলিয়ন। মুসলমানদের সংখ্যা ১ লাখ ৫০ হাজার।

৩. মিজোরাম ঃ

মোট জনসংখ্যা ৮ লাখ। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ১ হাজার। এ মুসলমানরা এখানকার স্থানীয় নয়। এরা অন্যান্য রাজ্য থেকে এসে এখানে বসতিস্থাপন করেছে।

৪. অরুণাচল ঃ

অরুণাচলের জনসংখ্যা ১.৭ মিলিয়ন। এখানে খৃস্টানদের সংখ্যা ৯৫% এবং হিন্দু ৪% থেকে ৫%। মুসলমানদের অবস্থান সংক্রান্ত কোনো তথ্য অরুণাচলে পাওয়া যায়নি। রাজ্যটি খৃস্টানদের দ্বারা শাসিত।

৫. মেঘালয় ঃ

মেঘালয়ের মোট জনসংখ্যা ২.৫ মিলিয়ন। এখানেও খৃস্টানদের সংখ্যা ৯৫% এবং হিন্দুদের সংখ্যা ৫%। এ রাজ্যটিতেও কোনো মুসলমান নেই। রাজ্যটি খৃস্টানদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

৬. আসাম ঃ

আসামে মুসলমানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এখানে মোট জনসংখ্যার ২৯% মুসলমান।

নিম্নে ভারতের এ ৬টি রাজ্যের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো।

আসাম

৬টি রাজ্যের মধ্যে আসামে মুসলমানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হলেও এখানকার মুসলমানরা অত্যন্ত দরিদ্র। এ দরিদ্রতার কারণে তারা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে। আসামে মুসলমানদের শিক্ষার হার ২১%। এ হার বৃদ্ধির জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ চেষ্টা করছেন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শহরে প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে মুসলিম ছেলেমেয়েরা ছাত্রাবাসে থেকে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ ছাত্রাবাসের খরচ যোগান দেয়া মুসলিম পিতামাতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই উচ্চশিক্ষার পথ স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের জন্য রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক দৈন্যতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব না হলে এ সংকট উত্তরণের আর কোনো বিকল্প পথ নেই। তাই আসামের মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য চেষ্টা করা এখন সময়ের দাবী। সরকারী ও বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রেও মুসলমানরা বৈষম্যের শিকার। মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় তাদেরকে যে হারে চাকরিতে নিয়োগ দেয়ার কথা তার চেয়ে ৩৩.৩৪% কম হারে তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়।

অপর এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, Indian Police Service এর আওতায় ১৯৭৬ সালের জানুয়ারীতে আসামে পুলিশ অফিসারের সংখ্যা ছিল ৬৮ জন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র দু'জন।

১৯৮৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আসামে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ৩১৩৫জন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ২৫৫ জন।

সরকারী চাকরিতে নিয়োগ প্রাপ্ত মুসলমানদেরকে ক্যাটাগরি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা সত্যিই হাতাশাজনক। যেমন–

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা = শূন্য

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা = ২২ (৪.৬৮%), মোট কর্মকর্তা–৪৭৯ জন

www.pathagar.com

৩য় শ্রেণীর কর্মচারী = ১৯২ (৮.৭১%), মোট কর্মচারী–২২০৫

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী = ৪১ (৮.৮৫%), মোট কর্মচারী–৪৫৮

বিচার বিভাগে এ চিত্র আরো ভয়াবহ। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসের চিত্র অনুযায়ী গৌহাটি হাইকোর্টে মোট বিচারপতির সংখ্যা ছিল ৮জন। এর মধ্যে মুসলমান ছিল মাত্র ১জন।

১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসের এক তথ্যে জানা যায় যে, ভারতের ৮০টি বড় বড় কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৭৫৫ জন।

মনিপুর

১৯৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত মনিপুর এক স্বাধীন দেশ ছিল। একজন রাজা দেশটি শাসন করতেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে দেশটিকে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করা হয়। অথচ মোঘল শাসনামলেও মনিপুর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। কিন্তু আজ মনিপুর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে একটি অঙ্গ রাজ্য (প্রদেশ) মাত্র।

মনিপুরের রাজধানীতে বড় দুটি মসজিদ এবং রাজ্যটির বিভিন্ন অঞ্চলে আরো ৩৫০টি ছোট ছোট মসজিদ রয়েছে। বড় মসজিদ দুটিতে যথাক্রমে ৫০০ ও ১০০০ লোক একত্রে নামায আদায় করার সুযোগ পায়। অপরদিকে ছোট মসজিদগুলোতে ৫০ থেকে ১০০ জন লোকের নামায আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদ নির্মাণের পুর্বে মনিপুরের মুসলমানরা নিজেদের বাসগৃহে নামায আদায় করতো। মসজিদ নির্মাণের ফলে মুসলমানরা সামাজিকভাবে নামায কায়েমের সুযোগ লাভ করে। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতির পথ প্রশস্ত হয়। এ সমস্ত মসজিদগুলো আজ মনিপুরের মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়েছে।

১৯৪০ সালে মনিপুরে প্রথম "মাজাহারুর উলুম" নামে একটি জুনিয়র মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মুসলিম কিশোরদের দীনী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৪৪ সালে "মারকায-ই-তাবলীগ" নামে একটি জুনিয়র আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে মনিপুরে চারটি জুনিয়র মাদরাসা রয়েছে। তবে কোনো সিনিয়র মাদরাসা নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানরা খুব পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ

www.pathagar.com

করে মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার হার একেবারেই শূন্যের কোটায়। গোটা মনিপুরে ১৫ জন মুসলিম ডাক্তার, ২৫ জন ইঞ্জিনিয়ার ও ১৫ জন আইনজীবি রয়েছে। শতকরা ৯০% মুসলমান কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তবে কিছু সংখ্যক মুসলমান ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত। মনিপুরে কোনো শিল্প কারখানা নেই। ফলে শিক্ষিত যুবকরা বেকারের তালিকায় নাম লিখাতে বাধ্য হচ্ছে।

মুসলমানরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মসজিদ-গুলোতে প্রেরণ করে। সকালে এবং বিকালে মসজিদগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়।

মনিপুরের সব মসজিদগুলোতে খতমে তারাবীহ্ হয় না। কারণ দেশটিতে হাফিযে কুরআনের সংকট রয়েছে। পুরো মনিপুরে মাত্র ১৫ জন কুরআনে হাফেয রয়েছে। ফলে অল্পসংখ্যক মসজিদেই খতমে তারাবীহ্ নামাযের ব্যবস্থা রয়েছে। মনিপুরে কোনো হাফিযিয়া মাদরাসা নেই। যে কয়জন হাফেয আছেন তারা বাইর থেকে জীবিকার সন্ধানে এখানে এসেছেন।

মনিপুরে দুটি ইসলামী সংগঠন দাওয়াহ্ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সংগঠন দুটি হচ্ছে—

১. Islamic Development Council of Manipur
২. Manipur Muslim welfare Association

এ সংগঠন দুটো তাদের কর্মসূচির ৫০% অংশই দাওয়াহ্ কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। আশাকরা যায় যে, এ তৎপরতা অব্যাহত থাকলে মনিপুরে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ পর্যায়ক্রমে প্রশস্ত হবে-ইনশাআল্লাহ।

এখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানরা পিছিয়ে রয়েছে। আইনসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৬০ জন। মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ১ জন। অবশ্য ১৯৯৫ সালের নির্বাচনে ৪ জন মুসলমান আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এঁদের মধ্যে একজনকে মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালামকে গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। মন্ত্রী আবদুস সালামের পর জনাব মুহাম্মাদ হাসেম উদ্দীনকে সেচ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়।

www.pathagar.com

মনিপুরের মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করার জন্য মনিপুর পিপলস পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। মরহুম মোহাম্মদ আলিম উদ্দিন দলটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭২-৭৪ সালে তিনি মনিপুরের মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনিই প্রথম মুসলমান যিনি মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। ক্ষমতায় থাকাকালীন মুসলিম সমাজের উন্নয়নের লক্ষে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেন। তার এ সমস্ত কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১। Manipur Muslim University
২। ১টি মেডিকেল কলেজ
৩। ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
৪। মাঝারী ও বৃহৎ আকারের সেচ প্রকল্প

জনাব মোহাম্মদ আলীম উদ্দিনের শাসনামলে আইন সভায় ৭ জন মুসলমান নির্বাচিত হয়েছিলেন। মনিপুর কংগ্রেস শাসিত একটি রাজ্য। মনিপুরের হিন্দু জনগণ দেশটির স্বাধীন মর্যাদা ফিরে পাবার জন্য বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। দেশটি বর্তমানে চরম বৈষম্যের শিকার। স্বাধীনতা উত্তর বিগত ৫০ বছরে রাজ্যটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি রাজ্যের সাধারণ নাগরিকদের ক্ষোভ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষোভের ধূমায়িত বিস্ফোরণই হলো স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা।

কেন্দ্রীয় সরকার এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ না নিলে এবং স্থানীয় খনিজ সম্পদের উপর এ অঞ্চলের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হবে এবং এ ৬টি রাজ্য ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের অর্গল মুক্ত হয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। ইতোমধ্যেই এ ৬টি রাজ্যের ১২টি স্বাধীনতাকামী গেরিলা গোষ্ঠী ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের সকল কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই সরকার বড় ধরনের অঘটন মোকাবিলা করার জন্য ইতোমধ্যেই এ এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করেছে। সৈন্য মোতায়েনের মধ্য দিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রমাণ করেছে যে, এ অঞ্চলের জনগণের উপর ভারত সরকারের আস্থা ও বিশ্বাসের দেয়াল ভেঙে গেছে। অবিশ্বাস আর সন্দেহই এখন তাদের পুঁজি। যে জনপদের

www.pathagar.com

মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যায় এবং সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাসের ভীত ধীরে ধীরে মজবুত হয় সেই জনপদের মানুষ সর্বোচ্চ ত্যাগ করে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের শৃংখল মুক্ত হয়ে একদিন স্বাধীনভাবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবেই—এটাই ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারা। এর ব্যত্যয় কখনো ঘটেনি। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর ব্যাপারে ইতিহাসের এ স্বাভাবিক গতিধারার পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সাধারণভাবে ভারতের মুসলমানরা বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মুসলমানরা অধিকাংশই দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। এতে তারা আর্থিক দৈন্যের কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ফলে অশিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠির মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এর স্বাভাবিক পরিণতিই হলো সরকারী চাকরিতে তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য। ভারতীয় মুসলমানদেরকে এ দৈন্য কাটিয়ে ওঠার জন্য শিক্ষার প্রতি তাদেরকে জোর দিতে হবে এবং বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ শিক্ষা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে এবং তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

তাই আমরা আশা করবো ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জনপদের মুসলমানরা এবং সাধারণভাবে ভারতের সকল মুসলমানরা তাদের বর্তমান ও আগামী দিনের নতুন প্রজন্মকে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন করে তুলবেন। এভাবেই একটি জনপদের মানুষ তাদের ভাগ্যোন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত প্রদেশ ভিত্তিক ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে মুসলমানদের অবস্থান ঃ

প্রদেশের নাম (অঙ্গরাজ্য)	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	মুসলমানদের সংখ্যা	মুসলমানদের শতকরা হার
আসাম	৭৯	৬৮	২	২.৯৪%
মনিপুর	০	০	০	০
ত্রিপুরা	৫১	১৬	০	০
নাগাল্যান্ড	০	০	০	০

www.pathagar.com

আমরা ভারতের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অধিকার হারা মুসলমানদের সোনালী ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), জুন, ২০০০।

২. দৈনিক ইত্তেফাক, জানুয়ারী ২৩, ২০০১।

www.pathagar.com

ভারতীয় মুসলমানরা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আইডেন্টিটি সংরক্ষণের সংগ্রামে নিয়োজিত

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্ণ, ভাষা ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ নয় বরং 'ধর্মই' মানুষের পরিচয়ের প্রধান ফ্যাক্টর। এ ধর্মীয় পরিচয়ের ফলেই একটি জাতি পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিন্নতায় এবং ভৌগোলিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে কোথাও সংখ্যাগুরু এবং কোথাও সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে পরিচয় বহন করে চলছে।

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম এবং এ ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা প্রায় ১ শত ৪০ কোটি। এ বিপুল সংখ্যক মুসলমান মুসলিম ও অমুসলিম দেশে বসবাস করছে। মুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা ৬০%-৮৫% এবং অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা ১৫%-৪০%। অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশই ভারতে বসবাস করে। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে বহু ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির অনুসারীরা বসবাস করছে। ভাষা, বর্ণ, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা শান্তিপূর্ণভাবে সহঅবস্থানে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। কিন্তু উগ্র হিন্দুবাদী দেশ ভারতের সংখ্যালঘু জাতিগুলো কি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পেরেছে ? এ প্রেক্ষাপটে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের একটি সংক্ষিপ্ত চালচিত্র পাঠকদের সামনে পেশ করা হলো।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে উগ্রবাদী হিন্দুরা ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা শুরু করে। এ প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে। উগ্রহিন্দুদের এ অশুভ তৎপরতার মোকাবেলায় মুসলমানরা তাদের ধর্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র রক্ষার জন্য অব্যাহতভাবে সংগ্রাম করে আসছে। এ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলেই প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশেও ভারতীয় মুসলমানরা তাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে তখন মদীনায়ও তারা সংখ্যালঘু জাতি হিসেবেই যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু মুসলমানগণ দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে অমুসলিমদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার পথকে প্রশস্ত করে তোলে। এ প্রশস্ত রাজপথ দিয়েই মদীনার অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের মিছিলে এসে শামিল হয় এবং কালক্রমে

www.pathagar.com

মদীনার সংখ্যালঘু মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিতে উন্নীত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মঙ্গল ও তাতারদের দুর্ধর্ষ আক্রমণের ফলে ১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের মধ্যদিয়ে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে মঙ্গল ও তাতারদেরকে ইসলামী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। ফলে মঙ্গল ও তাতাররা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে ইসলাম আবার বিজয়ী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ প্রেক্ষাপটেই নতুন তিনটি মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। এ সাম্রাজ্যগুলো হলো ঃ

(ক) ওসমানী খেলাফত (ইস্তাম্বুল ভিত্তিক)

(খ) পারস্য সাম্রাজ্য (ইস্পাহান ভিত্তিক)

(গ) মোঘল সাম্রাজ্য (ভারতীয় উপ-মহাদেশ ভিত্তিক)

১২৫৮ সাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা অত্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে এ তিনটি সাম্রাজ্য শাসন করে এবং এ সময় মুসলিম শাসকরা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বন্ধাত্ব দূর করার লক্ষে অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসন স্থান করে নিতে থাকে এবং এ শাসনামলে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যকীকরণ করা ও রাজনীতিকে ধর্ম নিরপেক্ষতার মোড়কে বন্দী করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যকীকরণ করা এবং রাজনীতিকে পুরোপরি সেকুলার আদর্শে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী Mr. Ernest Gellner বলেন, "... No secularization has taken place in the World of Islam .... Islam is secularization resistant, and the striking thing is that this remains true under the wide range of political resiges." এ সময় মুসলিম বিশ্বের কুলাংগার কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে সেকুলার রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ধর্মীয় তৎপরতা নিষিদ্ধ করে দেশটিকে পশ্চিমা মডেলে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। এ প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে। কিন্তু এতো চেষ্টা করেও তুরস্ক থেকে ইসলামকে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। জানবাজ মুসলমানদের সাহসী ভূমিকা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সকল প্রচেষ্টাকে বার বার বাধাগ্রস্ত করে তুলেছে। ঈমানদারদের এ সাহসী প্রতিরোধ নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে

www.pathagar.com

চলছে। সকল প্রকার যুলুম ও নির্যাতনকে সহ্য করে তারা তাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রখ্যাত পশ্চিমা Scholar Mr. Robert N. Bellah বলেন, "বিভিন্ন নতুন নতুন পদ্ধতি ও মুসলমানদের আচার আচরণের মাধ্যমে তুরস্কের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামের উপস্থিতি অব্যাহত থাকবে।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাসকগোষ্ঠী ইচ্ছে করলেই একটি জনপদের মানুষের হৃদয় থেকে ইসলামকে মুছে ফেলতে পারে না এবং ইসলাম তার নিজস্ব সৌন্দর্যেই মানুষের হৃদয়ে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি ভেঙে নেশ্‌ন স্টেট-এর আওতায় পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ফলে বিংশ শতাব্দীতে অর্ধশতাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ইসলাম আজ একটি বিকাশমান ধর্ম। এ বিকাশের ধারা অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতিতে ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। এ শক্তিকে আদর্শিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলন আজ একটি পরিচিত নাম। অবশ্য ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামী আন্দোলনের এ অব্যাহত অগ্রযাত্রায় শংকিত হয়ে পড়েছে। কারণ ইসলামী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনের আদলে মুসলিম বিশ্ব আবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে একটি একক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং এ যুগের খালিদ, তারিক ও মূসার অপ্রতিরুদ্ধ বিজয়াভিযানে মানবতার দুশমন পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ ধ্বংস হবে। ফলে এ ধ্বংসস্তূপের উপর ইসলাম একটি একক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিশ্বকে আবার দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে শাসন করবে। ইসলামী আন্দোলনের এ ঢেউ আজ ইউরোপীয় দেশসমূহের ভিত্তিমূলেও নাড়া দিয়েছে। সেখানে অভিবাসনকৃত মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে মুসলমানরা তাদের ধর্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র সংরক্ষণের কাজেই তাদের আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতিকে ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতির আদলে গড়ে তোলার কাজও তারা অব্যাহত রেখেছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দের এ প্রচেষ্টা এবং পাশ্চাত্য সমাজে ইসলামের অব্যাহত প্রভাব বৃদ্ধি পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদেরকেও নাড়া দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী Mr. Samuel P. Huntington বলেন ঃ

www.pathagar.com

"Western culture is challenged by groups within western societies. One such challenge comes from immigrants from other civilizations who reject assimilation and continue to adhere to and propagate the values, customs, cultures of their home societies. This is most notable among Muslims in Europe, who are, however, a small minority."

অর্থ ঃ "পশ্চিমা সংস্কৃতি আজ পশ্চিমা সমাজের বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ আসে অভিবাসনকৃত গ্রুপের পক্ষ থেকে যারা পশ্চিমা সমাজের সাথে আত্তীকৃত না হয়ে নিজস্ব মূল্যবোধ, প্রথা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রচারে নিয়োজিত রয়েছে। এ গ্রুপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানরা যদিও তারা সংখ্যায় খুবই কম।

মুসলিম ও অমুসলিম দেশ নির্বিশেষে বিশ্বের যেখানেই মুসলমানরা বসবাস করুক না কেন তারা সর্বদাই তাদের ধর্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র সংরক্ষণের চেষ্টা করে আসছে। তবে যে সমস্ত মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে কঠোরভাবে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করে তারা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায়। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মুসলমানরা কিভাবে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র সংরক্ষণ করছে তা পর্যায়ক্রমে নিম্নে তুলে ধরা হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারত এক সময় মুসলিম শাসনাধীন ছিল। হাজার বছর ধরে মুসলমানরা দেশটি শাসন করেছে। ভারতের পথে প্রান্তরে মুসলিম নিদর্শনগুলো আজো মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাট শাহজাহান নির্মিত তাজমহল আজো পর্যটকদের আকর্ষণ করে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য ভারত সফর করে থাকে। অপরদিকে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ও মুসলমানদের একটি অমর নিদর্শন। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি মুসলিম ইতিহাস বুকে ধারণ করে আজো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমনি অসংখ্য মুসলিম নিদর্শন ভারতের সর্বত্রই বিরাজমান।

বর্তমান ভারতের মোট জনসংখ্যার ১২.১২% মুসলমান। মুসলমানরা ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘু জাতি। ভারত বহু জাতি ও ভাষার দেশ।

১৬—

www.pathagar.com

ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই মুসলমানদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অবস্থানগত কারণে তাদের ভাষা, বর্ণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য তালিকায়ও রয়েছে বৈচিত্র। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা এক ও অবিভাজ্য এবং একই চেতনায় উজ্জীবিত মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভের দ্বারপ্রান্তে উপনীত তখন ভারতীয় হিন্দু মৌলবাদীদের ধর্মান্ধতার কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম অবনতি ঘটে। এ প্রেক্ষাপটে ভারতীয় মুসলমানরা স্বাধীনতা উত্তর ভারতে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং তাদের ভবিষ্যত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ে। অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদেরও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কিছুসংখ্যক গোড়া ধর্মান্ধ হিন্দু নেতাদের অনুপ্রবেশের ফলে কংগ্রেসের ন্যায় একটি সেকুলার রাজনৈতিক দলও হিন্দু-মুসলিম সমঅধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা পূর্বকালেই কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে প্রখ্যাত মুসলিম নেতা এবং ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন ঃ

> "Islam is so exalted a religion that its followers are not constricted to ape the Hindus for the formation of their political policy. There cannot be a greater shame for the Muslims than to bow their heads before others for political education. Muslims need not join any (Hindu) political party. There are the leaders of the world. If they submit to God, the entere world would submit to them."

অর্থ ঃ "ইসলাম একটি উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ ধর্ম। সুতরাং এর অনুসারীরা হিন্দুদের সাথে রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষে তাদেরকে বোকার মতো অনুসরণ করে নিজেদেরকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করবে না। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে বড় কোনো লজ্জা নেই যে, তারা রাজনৈতিক শিক্ষার্জনের জন্য অন্যদের নিকট মাথানত করবে। হিন্দুদের কোনো রাজনৈতিক দলে মুসলমানদের অংশগ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ বিশ্বব্যাপী তাদের অনেক যোগ্য নেতা

www.pathagar.com

রয়েছে। যদি মুসলমানরা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, তবে সারা পৃথিবী তাদের পদানত হবে।"

১৮৫৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর উপরোক্ত মতের প্রতি অবিচল ছিলেন। কিন্তু ১৯২০ সালের পর থেকে তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে থাকে এবং তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। এ প্রেক্ষাপটে তাঁর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"Eleven hundred years of common history have enriched India with our common achievements. our languages, literature and culture, our art, the innumberable happenings of our daily life, every thing bears the stamp of our joint endeavour. There is indeed no aspect of our life which had escaped this stamp.... this joint wealth is the heritage of our comon nationality and we do not want to leave it and go back to the time when this joint life had not begun."

অর্থ ঃ "বিগত এগারশত বছরের ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস হিন্দু মুসলমানদের যৌথ অর্জনগুলোরই সমষ্টি। আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ও আমাদের শিল্পকলা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়েছে যা যৌথ উদ্যম ও প্রচেষ্টারই ফল। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের কোনো দিকই আমাদের যৌথ উত্তরাধিকার ও আমাদের সাধারণ জাতীয়তা থেকে সরে যেতে বা পৃথক হতে পারে না যা আমাদের সাধারণ সম্পদ। আমাদের এ যৌথ অর্জনগুলো ছেড়ে আমরা পেছনের দিকে ফিরে যেতে চাই না, যেখান থেকে আমাদের শুরু হয়েছে।"

এরপর থেকে মাওলানা আযাদ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য আমৃত্যু প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি মুসলমানদের বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, স্বাধীন ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমানদের জন্য ভয়ের কারণ হবে না। বরং উভয় সম্প্রদায়ই দেশ ও নিজেদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সমান সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর ভারতে মাওলানা অযাদের এ স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে Hindu Mahasabha Movement-এর অন্যতম নেতা Mr. Moonje বলেন ঃ

"....until the Hindu youths are again inspired with the same ambition of Hindu Raj in their land of Hindustan, the Hindus cannot put forth the best energy that they are capable of in the present struggle for swaraj. The fight for Swaraj was not against the British alone, but also against the 'rowdy' and aggressive Muslims."

অর্থ ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত হিন্দু যুবকরা পুনরায় তাদের এ ভূখণ্ডে হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত না হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান স্বরাজ আন্দোলন শক্তিশালী হবে না। স্বরাজ আন্দোলন শুধু বৃটিশদের বিরুদ্ধেই নয় বরং গুন্ডা ও কলহপ্রিয় মুসলমানদের বিরুদ্ধেও।"

Mr. Moonje-এর এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই হিন্দু ধর্মান্ধবাদীরা ভারতের মাটি থেকে মুসলমানদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত আছে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে সাংবিধানিকভাবে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল ভারতীয় নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকারী। এছাড়াও সংবিধানের ২৬, ২৭ ও ২৮নং অনুচ্ছেদেও সকল সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং ৩০নং অনুচ্ছেদ সংখ্যালঘুদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ও তা পরিচালনা করার অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের উপরোক্ত ধারাগুলোতে সংখ্যালঘুদের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা কি স্বাধীনতা উত্তর ভারতের সংখ্যালঘুরা ভোগ করতে পেরেছে ? এ প্রশ্ন আজ মুসলমানসহ সকল সংখ্যালঘুদের। স্বাধীনতা উত্তর ভারতের ইতিহাস হলো—হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ইতিহাস এবং ভারতের চলমান ইতিহাস হলো মুসলমানদের রক্তে লেখা ইতিহাস। ধর্মান্ধ হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের হানি হয়েছে বার বার। ইতিহাস গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রথম সূত্রপাত হয় মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব-এর শাসনাবসানে ১৭০৭ সালে। কিন্তু ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার অতীত ইতিহাসের প্রামাণ্যচিত্র থেকে

www.pathagar.com

জানা যায় যে, ১৭১৪ সালে আহমদাবাদে হিন্দুদের হোলী (Holi) উৎসব ও মুসলমানদের গরু জবাইকে কেন্দ্র করে প্রথম বড় ধরনের রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এ দাঙ্গা দ্রুত ব্যাপকতা লাভ করে এবং বহু লোক নিহত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন জনপদে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এ দাঙ্গার ধারাবাহিকতা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত মুসলমানরা মনে করেছিল যে, স্বাধীনতা উত্তর ভারতে তারা শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পাবে এবং তাদেরকে আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হিংস্রতার শিকার হতে হবে না। কিন্তু মুসলমানদের এ প্রত্যাশা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয় এবং প্রতিটি সূর্যোদয়েই তাদেরকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াল দুঃস্বপ্ন নিয়েই জেগে উঠতে হয়। তথাকথিত বিশাল গণতান্ত্রিক সেকুলার ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াল হিংস্রতা মোকাবিলা করে বেঁচে থাকাটাই যেন আজ তাদের রাজনৈতিক অধিকারে পরিণত হয়েছে। হায় গণতান্ত্রিক ভারত! হায় সেকুলার ভারত!! শত ধিক তোমায়!!!

ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের ছাদ্মাবরণে ভারতের উগ্র হিন্দুবাদীরা স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকেই মুসলিম নিধন শুরু করে। এ নিধনযজ্ঞ অব্যাহত রাখার লক্ষে তারা অসংখ্য হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ঘটায়। এ সমস্ত দাঙ্গায় পাইকারীভাবে মুসলিম নর-নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের সম্পদ লুটপাট করা হয়। শিকারী যেমন মনের সুখে পাখি শিকার করে ঠিক তেমনি হিন্দুবাদী সন্ত্রাসীরা মনের সুখে মুসলিম শিশু ও নারীদেরকে হত্যা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ হত্যাকাণ্ডগুলো পুলিশের উপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সময় হিংস্র হায়েনাদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্য পুলিশের কার্যকর কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায় না বরং তারা তখন নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করে থাকে।

মুসলমানদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করার পাশাপাশি মুসলিম স্থাপত্যসমূহও ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় হিন্দুবাদী সংগঠনগুলো। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবেই ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারা অযোদ্ধায় ৪৬৪ বছরের পুরনো বাবরী মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলে। ভারতীয় উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর এস এস)

২. বিশ্ব হিন্দুপরিষদ (ভি এইচ পি)

www.pathagar.com

৩. ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)

৪. বজরঙ দল (বিডি) ইত্যাদি।

"ভারত হিন্দুদের—অন্য কারো নয়"—এ নীতির ভিত্তিতে এ চরমপন্থী সংগঠনগুলো তাদের সহিংস কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে তারা ভারতকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষে "Hindutva" মতবাদ প্রচার শুরু করেছে। এ মতবাদকে তারা একটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ মতবাদের মূলকথা হলো—"ভারতীয় নাগরিকদের একটি একক ও অবিভাজ্য পরিচয় থাকবে আর তা হলো 'হিন্দু'। এ পরিচয়ের বাইরে ভারতীয় নাগরিকদের আর কোনো পরিচয় থাকবে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় মুসলমানদেরকে ভবিষ্যতে হিন্দু নাম ধারণ করতে হবে এবং তাদের পাসপোর্টও হিন্দু নামানুসারেই করতে হবে। এ থেকে বুঝা যায়, আগামী দিনে ভারতীয় মুসলমানদেরকে তাদের অস্তিত্ব ও সম্পদ রক্ষায় কঠিন অগ্নী পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ভারতের বর্তমান ক্ষমতাসীন বিজেপি "Hindutva" মতাদর্শে বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল। এ দলটি ক্ষমতাসীন হবার পর জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করে "বন্দে মাতরম"-কে জাতীয় সংগীত করার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যেই তারা দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোর বর্তমান নাম পরিবর্তন করে হিন্দু দেবদেবীর নামে নামকরণ শুরু করেছে। এ পরিবর্তনের অংশ হিসেবে 'বোম্বাই' শহরের নাম পরিবর্তন করে 'মুম্বাই' রাখা হয়েছে। 'মুম্বাই' একজন হিন্দু দেবীর নাম।

বর্তমান ভারতে মুসলিম পারিবারিক আইনকে বিভিন্নভাবে বিতর্কিত করে তোলা হচ্ছে এবং এ আইন সংশোধনের জন্য দাবী তোলা হচ্ছে। তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হলে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। শুধু বর্তমানকালেই নয় ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই হিন্দু ধর্মান্ধতাবাদী গোষ্ঠি মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনে আসছে। এ প্রসঙ্গে Mr. M.S. Golwalkar তার লিখিত "We as our Nationhood Defined (4th. ed. Nagpur, Bharat prakashan, 1947) গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ

"The non Hindu peoples in Hindustan must adopt Hidu culture and language, must either learn to respect and hold in reverence Hidu religion, must entertain no ideas but those of glorification of the

www.pathagar.com

Hidu race and culture. (i. e) they must not only give up their attitude of intolerance and ungratefulness towards this land and its age-long traditions but must also cultivate the positive attitude of love and devotion instead in a word, they must cease to be foreigners, or may stay in the country, wholly subordinated to the Hidu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment not even citizen's right."

অর্থ ঃ "হিন্দুস্থানে বসবাসকারী অ-হিন্দুদেরকে হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে, হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে, হিন্দু ধর্মের গৌরবোজ্জল ইতিহাস ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ অনুসরণ করা যাবে না, ভারতের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও অকৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করা যাবে না, তাদেরকে ভারতের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতে হবে এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, তাদেরকে বহিরাগতের পরিচয় ভুলে যেতে হবে, তাদেরকে এখানে বসবাস করতে হবে হিন্দুদের অনুগত হয়ে, তারা কিছু দাবী করতে পারবে না এমনকি কোনোরূপ সুবিধা ও প্রত্যাশা করবে না। তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না এমনকি নাগরিক অধিকারও।"

Mr. Golwalkar-এর এ জঘন্য উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, ভারতীয় মুসলমানরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারও বহুলাংশে খর্ব করা হয়েছে।

তবে হিন্দুদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত উদার মানসিকতা সম্পন্ন একটি গ্রুপ রয়েছে যারা ভারতকে সমৃদ্ধিশালী ভারতে উন্নীত করার লক্ষে হিন্দু মুসলমানের সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। এ লক্ষে তারা মুসলমানদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং তাদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দও তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। এভাবে দুটি জাতি পরস্পরকে জানার মাধ্যমে তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে পারলে আগামী দিনের ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার অবসান হবে

www.pathagar.com

এবং হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে আগামী দিনের ভারত উন্নত বিশ্বের কাতারে শামিল হতে পারবে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এ প্রসেঙ্গ Mr. Nehru এবং Moulana Azad-এর দুটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। Mr. Nehru বলেন ঃ

"The fate of India is largely tied up with the Hindu outlook. If the present Hindu outlook does not change radically, I am quite sure that India is doomed. The Muslim outlook may be and I think is often worse. But it does not make very much difference to the future of India."

অর্থ ঃ "ভারতের ভাগ্য ব্যাপকভাবে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পৃক্ত। যদি র্বর্তমানে ভারতীয় হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন না ঘটে তবে আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে ভারতকে অনেক কষ্টকর সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। আমার বিশ্বাস ভারতীয় মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভবিষ্যত ভারতের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না।"

একই সুরে Moulana Abul Kalam Azad বলেন ঃ

"Earlier they (the Hindu and Muslim Communities) slayed seperately as Ganges and Indus valleys. But later as the ultimate law of nature, both of them had to get united in the single plane. The integration of there two communities was the greatest historical event. The day on which this event took place, the nature on the very day started building a new Hindustan in place of the old Hindustan."

অর্থ ঃ "প্রথম দিকে তারা (হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়) গঙ্গা ও হিন্দুকুশ উপত্যকায় পরস্পরকে হত্যা করতো। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অবশেষে তারা একই সমতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। দু' সম্প্রদায়ের এ একত্রিত হওয়া বা সমন্বিত হওয়া একটি মহান ঐতিহাসিক ঘটনা। তাদের এ সমন্বিত যাত্রার দিন থেকে পুরাতন হিন্দুস্তানের পরিবর্তে এক নতুন হিন্দুস্তানের বিনির্মাণ শুরু হয়।"

www.pathagar.com

কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর ভারতে তাঁদের এ আশাবাদের প্রতিফলন ঘটেনি। বরং বিপরীত চিত্রই সেখানে বিরাজমান। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিমের মিলনের পরিবর্তে তাদের যোজন যোজন দূরত্বই বরং বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। তবুও ভারতের মুসলমানরা দুটি কৌশল অবলম্বন করে সেখানে তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে ঃ

১. তাদের অস্তিত্বকে সংরক্ষণ করা এবং

২. অন্যদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া।

মোঘল শাসনামল থেকেই ভারতীয় মুসলমানরা এ দুটি কৌশল অবলম্বন করেই আজো ভারতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মোঘল সম্রাট আকবর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ার জন্য দীন-ই-ইলাহী মতবাদ প্রচার করেন। এ ধর্মমতের মূলকথা হলো হিন্দু-মুসলমানদের সাংস্কৃতিক বিভাজন দূর করে উভয় ধর্মাবলম্বীদেরকে একটি মিশ্র সংস্কৃতির অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলা। এ লক্ষ অর্জনের জন্য তিনি রাজপুত কন্যাকে বিয়ে করে তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তার এ মতবাদ মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা তদানীন্তন ভারতের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ সেরহিন্দের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরোধিতা করেন। জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত শায়খ সেরহিন্দ দীন-ই-ইলাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রখ্যাত সংস্কারক ও আলেমে দীন শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র) এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য সন্তান শাহ আবদুল আযীয এবং শাহ আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ এ আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। শেষোক্ত দু'জনের শাহাদাতের পরও মুসলিম নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণের বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন এবং এর পাশাপাশি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের এ অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই শত বাধা ও চক্রান্তের মুকাবিলায় ইসলাম আজো ভারতের বুকে টিকে আছে এবং মুয়ায্যিনের কণ্ঠে আজো সেখানে আযানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে মুসলিম স্কলার্স এবং বুদ্ধিজীবীগণ ভারতে ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

www.pathagar.com

১. দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা
২. তাবলীগী জামায়াত
৩. জমীয়তে ওলামায়ে ইসলাম
৪. আহলে হাদীস
৫. মুসলিম লীগ
৬. জামায়াতে ইসলামী।

এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর তৎপরতার ফলেই ভারতের মুসলমানরা তাদের অস্তিত্ব ও ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণের পাশাপাশি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে শক্তি অর্জন করেছে এবং তা অব্যাহত রেখেছে। ভারতীয় মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুবই পিছিয়ে রয়েছে। মুসলমানদের এ পশ্চাৎপদতা দূর করার জন্য কয়েকটি মুসলিম সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এ সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. Muslim Majlis-e-Mashawarat
২. Muslim Personal Law Board
৩. Milli Council

এ সংগঠনগুলো ভারতের সকল মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে পরিচিত। এ সংগঠনগুলোর সম্মিলিত প্লাটফর্ম থেকে যে সমস্ত কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. সরকারী ও বেসরকারী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

২. মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।

৩. মুসলমানদেরকে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হতে না দেয়া।

৪. মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণে ভূমিকা পালনে ওয়াদাবদ্ধ ব্যক্তি এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সমর্থিত ব্যক্তিকে ভোট দেয়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতীয় মুসলমানরা মুসলিম উম্মাহরই অংশ। সুতরাং তাদের ভালো-মন্দ মুসলিম উম্মাহরই ভালো-মন্দ। কাজেই ভারতীয় মুসলমানদের উপর যখনই কোনো নির্যাতন-নিপীড়ন আসবে তখনই গোটা মুসলিম উম্মাহকেই তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন ঃ

www.pathagar.com

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط - ال عمران : ١١٠

"অর্থ ঃ এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর ; অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলো।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

কুরআনে মুসলমানদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তারাই উত্তম জাতি যারা আল্লাহর দেয়া শাশ্বত সত্য-সুন্দর পথে চলে এবং অন্যদেরকে সে পথে আহ্বান জানায়। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলমানদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো দায়ীর ভূমিকা পালন করা। ভারতীয় মুসলমানরা কুরআনের এ বিঘোষিত নীতিমালার আলোকে বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অমুসলমানদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○ -

"হে নবী! তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক করো এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার রবই বেশী ভালো জানেন, কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর কে সঠিক পথে আছে।"-সূরা আন নাহল ঃ ১২৫

দাওয়াতী কাজের কর্মকৌশল সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে,

وَلَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ط -

"এবং সেইসব লোকদেরকে কোনোরূপ কষ্ট দিও না, যারা নিজেদের পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তোষলাভের সন্ধানে পবিত্র সম্মানিত ঘরে যাচ্ছে।"-সূরা আল মায়েদা ঃ ২

www.pathagar.com

চিরায়ত দাওয়াতী কাজের নীতিমালার আলোকে যদি ভারতীয় মুসলমানরা দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখে এবং হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে বসবাস করে তাহলে দাওয়াতী কাজের পাশাপাশি মুসলমানদের সাহচর্য পেয়েও অনেক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করবে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় যে, আগামী দিনের ভারতে মুসলমানরা বিজয়ী শক্তি হিসেবে অবির্ভূত হবে—ইনশাআল্লাহ্।

আমরা ভারতের মুসলমানদের সেই শুভ দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, ফেব্রুয়ারী, ২০০১।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর অমর কীর্তি

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরই আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান। মুসলিম বিশ্বের প্রেস্টিজিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় যেমন মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত, ঠিক তেমনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ও সর্বোচ্চ আধুনিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।

মুসলিম বিশ্বের এ সুপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ। রাজ্যহারা ভারতীয় মুসলমানরা যখন মারাঠা, শিখ ও ইংরেজ রাজশক্তির অত্যাচারে ও অপঘাতের আতিশয্যে দিশা হারিয়ে জীবনবিমুখ হয়ে পড়ে ঠিক তখনই আত্মহারা মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেখাবার জন্য উপমহাদেশের যে ক'জন জাতীয় নায়ক এগিয়ে আসেন স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ঘনঘোর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া আত্মবিস্মৃত একটি জাতিকে আলোকিত রাজপথের সন্ধান দেয়া অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ কাজ। এ কঠিন ও দুরূহ কাজেরই দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের জীবনে যে ঝড় ঝাপটা বয়ে গিয়েছিল তার করুণ দৃশ্য দেখে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর হৃদয়ে যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই তা বুঝা যায়। তিনি বলেন, "জাতি হয়তো আবার জেগে উঠবে এবং কিছুটা সম্মানও পাবে—এ ভরসা আমার মোটেও ছিল না। আমার নিকট জাতির সেই দুরবস্থা ছিল অসহনীয়। বেশ কিছুদিন আমি সেই দুশ্চিন্তায় ম্রীয়মান ছিলাম। বিশ্বাস করুন, সেই দুশ্চিন্তাই আমাকে বৃদ্ধ এবং আমার চুলগুলোকে সাদা করে ফেলেছে। "(স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা-পৃঃ ২৫)। ইতিহাস সাক্ষী যুগে যুগে জাতির ভাগ্যাকাশে নেমে আসা কালো মেঘ সরাতে যাঁরাই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সবাইকেই স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ভাগ্যই বরণ করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

১৮৩৮ সালে পিতার মৃত্যুর পর স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে দিল্লীর সদর আমিন কোর্টে সেরেস্তাদার পদে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৮৩৯ সালে আগ্রার বিভাগীয় কমিশনার অফিসে নায়েব মুন্সী (ডেপুটি লীডার) পদে যোগদান করেন এবং মুনসেফী পরীক্ষা পাস করে ১৮৪১ সালে স্যার সৈয়দ জৈনপুরে মুন্সেফ পদে যোগদান করেন। ১৮৪৬ সালে তিনি নিজ জন্মস্থান দিল্লীতে বদলী হয়ে আসেন এবং ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত দিল্লীতে সরকারী দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৫৫ সালে বিজনৌরে আমিন পদে যোগদান করেন এবং ১৮৫৮ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ জেলা আদালত হাকিম হিসেবে মুরাদাবাদে বদলী হন। চাকরি জীবনের পাশাপাশি ভারতের অধঃপতিত মুসলিম সমাজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। মুরাদাবাদ থেকে ১৮৬২ সালে লক্ষ্মীপুরে বদলী হয়ে আসার পর তাঁর মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আধুনিক শিক্ষার প্রসার ছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর এ চিন্তার বাস্তবরূপ দানের জন্য তিনি কর্মপন্থাও নির্ধারণ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতীয় মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করে তোলার পাশাপাশি ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং এ লক্ষ অর্জনের জন্য তিনি সারাটা জীবন চেষ্টা করেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলেন। মুসলিম উম্মাহর এ দরদী মহান ব্যক্তিকে ১৮৬৪ সালে আলীগড়ে বদলী করা হয়। এ আলীগড়কেই তিনি বেছে নিলেন মুসলিম ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে। আলীগড়কে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে তাঁর সংস্কার আন্দোলন ও শিক্ষা আন্দোলন। তাঁর শিক্ষা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় আলীগড় কলেজ যা পরবর্তীতে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

১৮৬৪ সালের ৯ জানুয়ারী স্যার সৈয়দ আহমদ গাজীপুরে "সায়েন্টিফিক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলীগড়-এ বদলী হবার পর তা আলীগড়ে স্থানান্তর করেন। সায়েন্টিফিক সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম করার লক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর দীর্ঘদিনের। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ১৮৭০ সালে তিনি শিক্ষান্নোয়ন কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৮৭৩ সালের ১০ জানুয়ারী যুক্তরাজ্যের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

শিক্ষা পদ্ধতির আলোকে তাঁর ছেলে সৈয়দ মাহবুব প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্কীম তৈরি করে 'শিক্ষান্নোয়ন কমিটি'র নিকট উপস্থাপন করেন এবং কমিটি তা অনুমোদন করে। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করলে সরকার তা নামঞ্জুর করে। কারণ ইংরেজ সরকার আশংকা করেছিল যে, তাদের আর্থিক সহযোগিতায় যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে সেখান থেকে আগামী দিনে যারা বেরিয়ে আসবে তারা একদিন তাদের তখতে তাউস উল্টে দিতে পারে। ইংরেজ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ না করায় স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ একান্ত বাধ্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করেন এবং ১৮৭৫ সালে 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ কলেজই ভবিষ্যত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিউক্লিয়াস' হিসেবে কাজ করতে থাকে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও কর্মের মাধ্যমে মুসলিম যুবকদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, মূল্যবোধ, ইসলামী ললিতকলা এবং আচার আচরণের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য অব্যাহতভাবে চেষ্টা করেন। ইসলামী শিক্ষা ও ললিতকলার প্রতি আকৃষ্ট করার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী করে তোলার জন্য তিনি যুবকদেরকে আধুনিক ও সেক্যুলার মুল্যবোধের সাথেও পরিচিত করে তোলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ভবিষ্যতে পশ্চাৎপদ ভারতীয় মুসলমানদেরকে আবার স্বমহিমায় উজ্জীবিত করতে হলে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি সেক্যুলার শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। তাঁর এ স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্যই তিনি 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। যাদের মধ্যে ইসলামী ও সেক্যুলার শিক্ষার সমন্বয় ঘটবে তারাই ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির উন্নয়নে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে তিনি মনে করতেন।

১৮৭৭ সালের ৮ জানুয়ারী লর্ড রিপন আনুষ্ঠানিকভাবে 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮৭৮ সালের ১ জানুয়ারী থেকে কলেজে শ্রেণী কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৮২০ সালে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। পরবর্তীকালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য ও আযাদী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রেও পরিণত হয়।

www.pathagar.com

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ২০,০০০। তারা এখানে মেডিসিন, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজী, বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৭৪টি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। এ সমস্ত বিভাগের মাধ্যমে Modern and Traditional পদ্ধতির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনুপম, দুর্লভ ও অসামান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইমারী থেকে পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চ লেভেল পর্যন্ত পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাঁচটি স্কুল পরিচালনা করা হয়। পাঁচটি স্কুলের মধ্যে একটি স্কুলে শুধুমাত্র অন্ধ ছাত্ররা পড়াশুনা করে।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ৬৩টি ছাত্রাবাসে ১০,৫০০ জন ছাত্র আবাসিক সুবিধা ভোগ করে আসছে। আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে ১০০০ জন বিদেশী ছাত্র। এ সমস্ত বিদেশী ছাত্ররা মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার ৩০টি মুসলিম দেশ থেকে আগত।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বখ্যাত বহু মনীষীর জন্ম দিয়েছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—আমিন হিলমী দিদি (মালদ্বীপের প্রথম প্রেসিডেন্ট), ফিল্ড মার্শাল আইউব খান (পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট), ফযলে এলাহী চৌধুরী (পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট), নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান (পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী), মনসুর আলী (বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী), খাজা নাজিম উদ্দিন (পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী) ও জাকির হোসেন (ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট)। এছাড়াও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত ছাত্ররা পরবর্তী কালে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ডঃ এ. বি. সাইয়েদ মুহাম্মাদ (যুক্তরাজ্যে ভারতের সাবেক হাই কমিশনার), আবদুর রব নিশতার (পাঞ্জাবের সাবেক গভর্নর), আবদুর রহমান (আফগানিস্তানে তুরস্কের সাবেক রাষ্ট্রদূত), রফিউদ্দিন মাহমুদ (শ্রীলংকার সাবেক মন্ত্রী), অধ্যাপক এফ. এম. রহমান (ইউনাইটেড বেংগল এসেম্বলীর সাবেক স্পীকার), হামিদ আনসারী (জাতিসংঘে ভারতের সাবেক প্রতিনিধি), হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্পীকার), ইসরাত আজিজ (সউদী আরবে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত) প্রমুখ।

www.pathagar.com

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেশনাল কোর্সগুলো বিদেশী ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষে মুসলিম বিশ্বসহ সংখ্যালঘু মুসলিম দেশগুলো থেকে অব্যাহতভাবে আবেদন করা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সুযোগ সুবিধার প্রেক্ষাপটে এ আবেদনে সাড়া দেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিদেশী ছাত্রদের জন্য আলাদা ইউনিট খোলার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। ফলে এ সমস্ত প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তিচ্ছু বিদেশী ছাত্রদের কাছ থেকে বিশেষ কোর্স ফি আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল সংগ্রহের লক্ষে অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদেশী ছাত্রদের জন্য আলাদা প্রফেশনাল কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হয়। ফলে বিদেশী ছাত্ররা ৩০০০ মার্কিন ডলার বিশেষ ফি প্রদানের মাধ্যমে প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করার সযোগ লাভ করে। বিদেশী ছাত্রদের প্রদেয় এ অর্থ 'বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন তহবিলে বিদেশী ছাত্রদের দান' শীর্ষক তহবিলে জমা করা হয়। এ অর্থ স্বাভাবিক ভর্তি ফি ও মাসিক বেতনের অতিরিক্ত বিশেষ ফি হিসেবে ধার্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদেশী ছাত্রদের জন্য আলাদা আবাসিক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সময়ের চাহিদানুযায়ী ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন প্রফেশনাল কোর্স চালু করা সম্ভব হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন। এ সমস্ত নতুন কোর্সগুলোর মধ্যে রয়েছে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান, তথ্য ও টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার (স্নাতক), ইলেক্ট্রনিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাস্টার্স অব ফাইন্যান্স এন্ড কন্ট্রোল, ট্যুরিজম এডমিনিস্ট্রেশন, মাস্টার্স অব ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী, হর্টিকালচার, ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী ভাষায় দক্ষতা অর্জন প্রভৃতি।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ভারতীয় মুসলমানরা উদারহস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন তহবিলে অব্যাহতভাবে দান করে আসছে।

বর্তমানে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক সেন্টারগুলোতে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। এ সংকট উত্তরণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

শুভাকাঙ্ক্ষী ও প্রাক্তন ছাত্ররা এ আর্থিক সংকট নিরসনে সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এটাই সময়ের দাবী।

শুভাকাঙ্ক্ষী ও প্রাক্তন ছাত্রদের অব্যাহত সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে তদানিন্তন মুসলিম ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষানকীব স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রোজ্জ্বল দ্বীপ শিখা 'আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়'. জ্ঞানের আলো বিকিরণ করে করে মুসলিম উম্মাহর আগামী প্রজন্মকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে–এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র ঃ (দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, অক্টোবর '৯৪ সংখ্যা ও স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা বই অবলম্বনে)।

www.pathagar.com

কানাডায় ইসলাম ঃ সংক্ষিপ্ত চালচিত্র

কানাডায় ইসলামের আগমন অতি সাম্প্রতিক কালের। কানাডার চলমান ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, দুটি পর্যায়ে মুসলমানরা কানাডায় আগমন করে। প্রথম পর্যায়টি হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার এবং দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যারা কানাডায় আগমন করে তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলমানরা সচ্ছল জীবনের আশায় কানাডায় পাড়ি জমায়। ফলে কানাডায় মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এ শতাব্দীর শুরুতে যেসব মুসলমান কানাডায় আগমন করে তাদের অধিকাংশই ছিল যুবক। তারা ছিল কপদর্কহীন, এমনকি তাদের কোনো শিক্ষাদীক্ষাও ছিল না। ফলে শুরুতেই মুসলমানরা অদক্ষ দিনমজুর হিসেবে পেশা গ্রহণ করে। এ অদক্ষ দিনমজুর মুসলমানরা স্থায়ীভাবে কানাডায় বসবাস শুরু করে এবং স্থানীয় গরীব পরিবারগুলোর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। ফলে যে নতুন কানাডীয় মুসলমানদের জন্ম হয় তারাও শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগের অভাবে শ্রমিক হিসেবেই পেশা গ্রহণ করে। এভাবে কানাডীয় মুসলমানদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

কানাডায় অভিবাসনকারী মুসলমানরা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধানতঃ লেবানন, সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন, মিশর, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরান, পূর্ব-ইউরোপ ও পূর্ব আফ্রিকাসহ বিভন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে আগমন করে। এ সমস্ত মুসলমান মুহাজিরদের মধ্যে ভাষাগত ও গোত্রীয় ঐক্যের অভাব ছিল। ফলে কানাডায় আগমনকারী মুসলমানরা এ বিভিন্নতার কারণে একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেনি।

কানাডায় আগমনকারী মুসলিম মুহাজিররা সাধরণত অন্টারিড, টরেন্টো, কুইবেক ও মনট্রিলে বসবাস করে। তবে অধিকাংশ মুহাজিররা মনট্রিলেই তাদের ঠিকানা করে নিয়েছে। এছাড়াও কিছুসংখ্যক মুসলমান আলবার্টা এবং দেশের অন্যান্য স্থানেও বসবাস করছে। তবে কানাডার বড় বড় শহর ও উপশহরগুলোই মুসলমানদেরকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। কানাডায় মুসলমানদের আগমনের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

www.pathagar.com

প্রথমতঃ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির আশা,

দ্বিতীয়তঃ উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ,

তৃতীয়তঃ স্বদেশে রাজনৈতিক চাপ ও ঝুঁকি,

চতুর্থতঃ ভ্রমণ

পঞ্চমতঃ পারিবারিক কারণ (কানাডায় বসবাসকারী আত্মীয়-স্বজনদের টানে)।

Globe ও Mail নামক কানাডীয় দুটি জাতীয় পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, সে দেশে ইয়াহুদী ও মুসলমানদের সংখ্যায় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী কানাডায় ইহুদীর সংখ্যা ছিল ৩ লাখ এবং মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৯৮ হাজার। অপরদিকে ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী ইয়াহুদীদের সংখ্যা ৩ লাখ ১৮ হাজার এবং মুসলমানদের সংখ্যা ২ লাখ তিপ্পান্ন হাজার। মুসলমানদের এ বৈপ্লবিক সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে যে কারণগুলো কাজ করছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

এক ঃ সাম্প্রতিক সময়গুলোতে অধিকহারে মুসলমানদের কানাডায় আগমন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করা।

দুই ঃ স্থানীয় মুসলিম দম্পতিদের জন্মহার বৃদ্ধি পাওয়া।

১৯৯৬ সালে ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে অটোয়াস্থ পার্লামেন্ট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দানকালে কানাডার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও Encyclopaedia of Muslim Minorities, Canadian chapter এর লেখক জনাব দাউদ হাসান হামদানী বলেন ঃ

"Islam is the fasted growing religion in Canada."

অর্থ ঃ 'কানাডায় দ্রুত বিকাশমান ধর্ম হলো ইসলাম।'

তাঁর এ উক্তি থেকে জানা যায় যে, কানাডায় ইসলাম একটি বিকাশমান ধর্ম। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ২৫টি মেট্রোপলিটন সিটির Non-Christian Community গুলোর মধ্যে ১০টিতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এছাড়া Alberta প্রদেশেও মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী শতাব্দীর

www.pathagar.com

প্রথমার্ধেই মুসলমানরা কানাডার দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আশা করা যায়।

কানাডার ১০টি প্রদেশের যেখানেই সুবিধা পাচ্ছে সেখানেই মুসলমানরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করছে। কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলমানরা প্রায় প্রতিটি মহাদেশেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। কারণ প্রতিটি মহাদেশ থেকেই মুসলমানরা স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য কানাডায় হিজরত করছে। ফলে বিভিন্ন বর্ণ ও পেশার লোকদের সংমিশ্রণে গড়ে উঠছে এক নতুন সমাজ। এ নতুন কানাডীয় মুসলিম সমাজের ভিত্তি ও মূল চালিকা শক্তি হলো ইসলাম। ইসলামই বিভিন্ন বর্ণ ও পেশার লোকদেরকে এক সুদৃঢ় ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

কানাডার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রতিটি সেক্টরে মুসলমানরা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে মুসলমানরা আলবার্তো প্রদেশে প্রথম কৃষিকাজ শুরু করে। ফলে বর্তমানে আলবার্তো প্রদেশ কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শীর্ষস্থানে রয়েছে। তাই আলবার্তো প্রদেশের মুসলমানদেরকে কৃষিপণ্য উৎপাদনের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯৩৮ সালের ১২ ডিসেম্বর কানাডার Edmonton শহরে আল-রশীদ মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এটি উত্তর আমেরিকার সর্বপ্রথম মসজিদ। এ মসজিদ নির্মাণ এবং দীনী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কানাডায় মুসলমানদের প্রথম প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশ ঘটে। এভাবেই কানাডায় মুসলমানরা একটি বিকাশমান জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। এর ধারাবাহিকতায় কানাডার মুসলমানরা আজ সে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

আল-রশীদ মসজিদ নির্মাণের পূর্বে কানাডার মুসলমানরা খৃস্টানদের পুরনো চার্চ ও যাজকদের ব্যবহৃত ভবন ক্রয় করে সেগুলোকে সংস্কার করে ইবাদাতখানায় পরিণত করে। বর্তমানে এ সমস্ত ইবাদাতখানাগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। প্রতিটি মসজিদই নামাযীদের পদভারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এ সমস্ত মসজিদকে কেন্দ্র করে বর্তমানে ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কাজ শুরু হয়েছে। ফলে মসজিদগুলো ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। শুধুমাত্র ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্র হিসেবেই নয়

www.pathagar.com

বরং মসজিদগুলো মুসলিম সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমানে নির্মিত মসজিদ ও ইসলামী সেন্টারগুলো ইসলামী স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন বহন করছে। এ সমস্ত স্থাপত্যশৈলি অমুসলিমদেরকেও দারুণভাবে আকৃষ্ট করছে।

কানাডার মুসলমানদের প্রত্যাশা—তাদের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে একবিংশ শতাব্দীর কানাডায় ইসলাম একটি অপ্রতিরুদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং প্রবহমান স্রোতধারার এক পর্যায়ে আগামী দিনের কানাডা ইসলামী কানাডায় উন্নীত হবে।

কানাডীয় মুসলমানদের এ সোনালী প্রত্যাশা পূরণ হোক এটাই আমাদের কামনা।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), জুন-১৯৯৯।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (বাংলাদেশ), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

হল্যান্ডে ইসলাম ও মুসলমান

হল্যান্ডে কখন কিভাবে ইসলামের আগমন ঘটে তার সঠিক সময় নির্ধারণ করা সত্যিই কষ্টকর। তবে ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বিগত অর্ধশতাব্দী পূর্বেই হল্যান্ডে মুসলমানদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বর্তমানে হল্যান্ডের লোক সংখ্যা ১৫.৬ মিলিয়ন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা অর্ধমিলিয়ন।

বর্তমানে হল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে মসজিদ ও ইসলামী স্কুল চালু রয়েছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সরব উপস্থিতির কারণে ওলন্দাজ সমাজে ইসলামী সমাজের একটি স্বাভাবিক চিত্র বিরাজ করছে।

হল্যান্ডের অধিবাসীরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে। ওলন্দাজ সরকার নাগরিকদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তপেক্ষ করে না। ধর্মীয় স্বাধীনতার এ সুযোগে ইসলাম সেখানে একটি বিকশিত ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ষাটের দশকে দেশটিতে শ্রমশক্তির ঘাটতি দেখা দেয়। এ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার বিদেশী শ্রমিকদের হল্যান্ডে আসার সুযোগ করে দেয়। এ সুযোগে তুরস্ক ও মরক্কো থেকে বহু মুসলমান জীবিকার সন্ধানে হল্যান্ডে আগমন করে। কালক্রমে তারা সেখানে থেকে যায় এবং স্বদেশ থেকে পর্যায়ক্রমে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে হল্যান্ডে নিয়ে আসে। এভাবে হল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে হল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যার ৪% মুসলমান।

হল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সন	জনসংখ্যা
১৯৭১ ইং	৫৪,০০০জন
১৯৭৫ ইং	১,০৮,০০০ ,,
১৯৮০ ইং	২,২৫,০০০
১৯৯৭ ইং	৫,৭৩,০০০

জীবিকার সন্ধানের পাশাপাশি এ সময় বহু মুসলমান ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, বসনিয়া ও সোভিয়েত

www.pathagar.com

ইউনিয়ন থেকে শরণার্থী হিসেবে হল্যান্ডে আগমন করে। হল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে এ সমস্ত শরণার্থীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কারণ তারাও মুসলিম জনগোষ্ঠীরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

হল্যান্ডে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ওলন্দাজ সরকার কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। হল্যাণ্ডের সংবিধানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমানাধিকার দেয়া হয়েছে। সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য সাংবিধানিকভাবে সমানাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় দেশটিতে কোনো ধর্মীয় হিংসা বিদ্বেষ নেই। বরং সেখানে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিরাজ করছে।

সরকার দেশের সকল শিশুদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। ফলে ১৬ বছর বয়স্ক সকল শিশুকিশোরই শিক্ষার সুযোগ লাভ করছে। মুসলিম শিশু কিশোররাও এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত নয়।

হল্যান্ডের সকল নাগরিক সমানভাবে ভোটাধিকার ও নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার ভোগ করে থাকে। মুসলিম নাগরিকরাও এ অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়। তারা স্থানীয় ও জাতীয় সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সমান সুযোগ ভোগ করে থাকে।

হল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে বর্তমানে ২০০টি মসজিদ রয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলমান ও স্থানীয় মুসলমানরা এ সমস্ত মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলমানদের মৃতদেহ দাফন করার জন্য বিভিন্ন শহরে এক ডজনেরও অধিক কবরস্তান রয়েছে। মুসলমানরা নিজস্ব উদ্যোগে এবং নিজেদের অর্থ দ্বারাই এ সমস্ত কবরস্তানের জায়গা ক্রয় ও তা সংরক্ষণ করে থাকে।

হল্যান্ডের মুসলমানরা পুরোপুরি ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে। এ ধর্মীয় স্বাধীনতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত মুসলিম কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নামাযের জায়গার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং রমযান মাসে তাদের কাজকর্ম কিছুটা শিথিল করে দেয়া হয়।

হল্যান্ডের হাসপাতালগুলোতে মুসলিম শিশুদের জন্য খাতনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং সে দেশের মুসলিম মহিলারা হিজাব পরিধান করে চলাফেরা করে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রীরাও নিয়মিত হিজাব পরিধান করে থাকে। এ দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক এবং সর্বত্রই তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে বেসরকারী কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর ব্যতিক্রম

www.pathagar.com

রয়েছে। সেখানে মুসলিম ছাত্রী ও মুসলিম শিক্ষিকাদেরকে হিজাব পরিধানে নিরুৎসাহিত করা হয়। এক্ষেত্রে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করে না।

পশু জবাই করার জন্য সরকার সারাদেশে ৪ হাজার ৫ শতটি কসাইখানা নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে মুসলমানদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ৫ শতটি জবাইখানা। এ সমস্ত জবাইখানায় শরীআহ মোতাবেক পশু জবাই করা হয়। এছাড়াও হল্যান্ড সরকার আশ্রয়কেন্দ্র ও কারাগারগুলোতে বন্দী মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার জন্য ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করছেন। সরকার এ সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষকদের বেতন ভাতা বহন করে থাকে। তবে শর্ত থাকে যে, বন্দীদেরকে ওলন্দাজ ভাষায়ই ধর্মীয় শিক্ষা দান করতে হবে। এ সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষকদেরকে তত্ত্বাবধান করা এবং মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য সরকার মুসলিম স্কলারদের নিয়ে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন উপদেষ্টা কমিশন গঠন করেছে। মুসলমানদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও সমস্যা নিয়ে উপদেষ্টা কমিশন সরকারের সাথে আলোচনা করে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকার কল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সার্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার সবার জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছে। দেশে অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের অবাধ সুযোগ রয়েছে। ফলে খৃস্টান ও মুসলমানরা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নিজেদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের সুযোগ পাচ্ছে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আরবী অথবা তুর্কী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষার সুযোগ দেয়া হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিম শিক্ষার্থীদের চাহিদানুযায়ী ধর্মীয় বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে। মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে আম্‌সটারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামিক স্টাডিজ চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একটি বেসরকারী ইসলামী সংস্থা আমসটারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ চেয়ার প্রতিষ্ঠা করে। এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হল্যান্ডে ইসলাম দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এবং হল্যান্ডের মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেখানকার ইসলামী সংগঠনগুলোকে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ফোরামের আওতায় এনে সংগঠনগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনে সক্ষম হলে আশাকরা যায় যে, আগামী দিনের হল্যান্ডে ইসলাম একটি প্রধান

www.pathagar.com

ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং মুসলমানরা নিজেদেরকে একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। আমরা হল্যান্ডের মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড, ২৪ জানুয়ারী, ২০০০।

www.pathagar.com

ভিয়েনায় ইসলাম ঃ ইসলামিক সেন্টারের ভূমিকা

ভিয়েনার ধর্মীয় অংগনে ইসলাম ও মুসলমান অত্যন্ত পরিচিত নাম। ১৮৭৮ সালে অস্টো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের শাসনামলে ভিয়েনায় ইসলামের যাত্রা শুরু হয়। এসময় কিছু সংখ্যক তুর্কী মুসলিম সৈনিক কর্তৃক ভিয়েনার Alserstrasseতে একটি 'মিলিটারী মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একজন মুফতী এ নব প্রতিষ্ঠিত মসজিদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ মিলিটারী মসজিদকে কেন্দ্র করেই ভিয়েনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। অস্ট্রিয়ায় বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা ৩ লাখ ৬০ হাজার। অস্ট্রিয়া হলো প্রথম ইউরোপীয় দেশ যেখানে ইসলামকে সরকারীভাবে ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ স্বীকৃতির ফলে অস্ট্রিয়ায় বসবাসকারী মুসলমানরা সে দেশের অন্যান্য নাগরিকদের মতো ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের শাসনামলে সম্রাট Franz Joseph-1 এর পক্ষ থেকে Vienna Municipality-এর মেয়র Mr. Karl Lueger মসজিদ নির্মাণের জন্য একখণ্ড জমি ও ২৫ হাজার golden guilders দান করেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পতনের কারণে মসজিদ নির্মাণের কাজ স্থগিত হয়ে যায়। মসজিদের অভাবে এ সময় নামায আদায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে ভিয়েনার মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল ভিয়েনাস্থ তুর্কী দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করলে রাষ্ট্রদূত জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের সুবিধার্থে দূতাবাসের একটি কক্ষকে Prayer Room হিসেবে ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রদূতের এ সাহসী উদ্যোগ ভিয়েনায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও অস্ট্রিয়ায় বসবাসকারী মুসলমানরা জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের জন্য বেশ কয়েকটি বাড়ীতে ইবাদাতখানা প্রতিষ্ঠা করেছে। এভাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগের ফলে ইসলাম ভিয়েনার সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়।

পরিকল্পিতভাবে ভিয়েনায় ইসলামী দাওয়াহ্ কাজ সম্প্রসারণ করার লক্ষে ভিয়েনাস্থ মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতগণ একটি ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯৬৮ সালে Vienna Islamic centre Trust গঠন করা হয়। ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য ভিয়েনাস্থ মিশরীয় রাষ্ট্রদূত Mr. Hassan Muhammad al-Tohamy-কে

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ হচ্ছেন ঃ

১. Mr. Fakhri Shaikh al-Ard (Ambassador, k.S.A)
২. Mr. Hassan Istinyeli (Ambassador, Turkey)
৩. Mr. Anwar Murad (Ambassador, Pakistan)
৪. Mrs Liala Roesad, (Ambassador, Indonesia)
৫. Mr. Abdur Rahman al-Solh (Ambassador, Lebanon)
৬. Mr. Khalid al-Hashimi (Ambassador, Iraq)
৭. Mr. Amir Aslam Afshar (Ambassador, Iran)

প্রস্তাবিত ইসলামিক সেন্টার নির্মাণের জন্য ট্রাস্টিবোর্ড ১৯৬৮ সালের শুরুতেই Vienna city Authority -এর কাছ থেকে ৮,৩০০ বর্গ মিটার জমি ক্রয় করেন। ক্রয়কৃত জমিতে ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ ইং তারিখে ভিয়েনা ইসলামিক সেন্টার-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে ভিয়েনায় এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রিয়ার তদানিন্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী Mr. Kurt Waldheim ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিয়েনার প্রধান আর্চবিশপ Dr. Franz Konig। এছাড়াও ভিয়েনাস্থ মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। খুব ঘটা করে ইসলামিক সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও আর্থিক সংকটের কারণে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কার্যত নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। এ সময়ে ইসলামী বিশ্বের অন্যতম প্রধান নেতা ও সউদী আরবের বাদশাহ কিং ফয়সাল বিন আবদুল আযীয সেন্টার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন এবং ভিয়েনাস্থ সউদী রাষ্ট্রদূত Mr. Shaikh Farid Basrawi-কে সেন্টার নির্মাণের কাজ সরাসরি তদারক করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি ট্রাস্টিবোর্ডের সাথে পরামর্শ করে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য দরপত্র আহ্বান করেন। দরপত্র বাছাই করে Vienna Firm Baumeister Ing-কে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয় এবং জুলাই ০১, ১৯৭৭ ইং সালে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়।

১৯৭৭ সালের ১১ নভেম্বর নব নির্মিত ইসলামিক সেন্টার মসজিদের মিনার থেকে সর্বপ্রথম মুয়ায্যিনের কণ্ঠে আযানের সুমধুর আওয়াজ ভেসে আসে। ১৯৭৯ সালের ২৬ এপ্রিল মসজিদের মিনারের সর্বোচ্চ চূড়ায় স্বর্ণ

www.pathagar.com

নির্মিত একটি ক্রিসেন্ট লাগানো হয়। এ ক্রিসেন্ট ইসলামিক সেন্টারের সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। ভিয়েনা ইসলামিক সেন্টার অস্ট্রিয়ার মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি বিজয় মিনার। এখানে নিয়মিত মিলিত হচ্ছেন মুসলিম দেশের কূটনীতিকবৃন্দ, ছাত্র, ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবি মানুষ। তারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখছেন। ফলে 'ভিয়েনা ইসলামিক সেন্টার' অস্ট্রিয়ার মুসলমানদের জন্য একটি মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে।

অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী সেখানে বসবাসকারী সকল ধর্মাবলম্বী লোকেরা সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে। এমনকি সরকারী ও বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রেও কোনোরূপ বৈষম্য করা হয়না। অর্থাৎ ধর্ম সেখানে মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, অস্ট্রীয় সরকারের উচ্চপদে অনেক মুসলমান কর্মরত রয়েছে।

মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভিয়েনার প্রধান আর্চবিশপ Dr. Franz Konig অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেন এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্য সর্বমহলে সমাদৃত হয়। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মুসলিম দেশ তিনি সফর করেন এবং সরকারী ও বেসরকারী নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন।

ভিয়েনা ইসলামিক সেন্টারকে কেন্দ্র করে সেখানকার মুসলমানরা বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফলে ইসলামিক সেন্টার একটি ইসলামিক কমপ্লেক্স-এ রূপান্তরিত হয়েছে। ইসলামিক সেন্টারে নিম্নোক্ত বিভাগসমূহ চালু রয়েছে।

বিভাগসমূহ ঃ

১. বিশাল মসজিদ (দৈনিক নামায ও ঈদের জামায়াত)
২. লাইব্রেরী (ইসলামিক জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র)
৩. বিশাল হল রুম (বহুবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়)
৪. শ্রেণী কক্ষ (আরবী ও কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি)
৫. অফিস কক্ষ (সেন্টারের কর্মকর্তাদের জন্য)
৬. ২টি আবাসিক কক্ষ (ইমাম ও খাদেমদের জন্য)।

www.pathagar.com

১ মহররম ১৪০০ হিজরী মোতাবেক ২০ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে ভিয়েনা ইসলামিক সেন্টার আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Austrian Federal Chancellor Dr. Bruno Kriesky। এছাড়া অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন, ভিয়েনার মেয়র, অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সউদী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল আযীয আল-খোয়াইটার (সউদী বাদশাহর প্রতিনিধি), অস্ট্রিয়ায় নিযুক্ত মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ স্থানীয় মুসলমানগণ। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন Federal President of Austria Dr. Nudolf Kirchschlager। তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ভিয়েনায় ইসলামিক সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ইউরোপে ইসলামের নবযুগের সূচনা হয়।

প্রতিটি মহৎকাজের পেছনেই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য থাকে। ভিয়েনা ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কাজ করেছে। এ সমস্ত উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

১. To assist the Austrian Muslims to preserve their religion, Culture and moral principles

২. To project the true image of Islam before the European people at large and before every man and woman who wants to know about Islam and its subline message of tolerance from the original source.

৩. To build a bridge of civilization and culture and to explain the teachings and principles of Islam to them.

অর্থ ঃ ১. অস্ট্রীয় মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও নৈতিক মূলনীতিসমূহ সংরক্ষণে সহযোগিতা করা।

২. ইসলামের সত্যিকার ইমেজ ইউরোপীয়দের সামনে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা (প্রদর্শন করা) এবং সাধারণভাবে সকল নারী-পুরুষের নিকট ইসলামের বাণী তুলে ধরা, যারা মূল উৎস থেকে ইসলাম ও পরধর্মের ব্যাপারে ইসলামী সহিষ্ণুতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

www.pathagar.com

৩. সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেতু নির্মাণ করে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে তাদেরকে (পশ্চিমাদের) শিক্ষা দেয়া।

বিগত দু'দশক ধরে ইসলামিক সেন্টার যে সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

ক. শিশু-কিশোরদের ইসলামী শিক্ষা দান।

খ. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আয়োজন করা।

গ. ইসলামী দিবস উদযাপন করা।

ঘ. ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা।

ঙ. একটি ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা (স্কুলটিতে সউদী সরকারের সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়াও জার্মানী ও ইংরেজী ভাষাও সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।

চ. সেন্টারে একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মুসলিম চিকিৎসকগণ এখানে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। প্রতি শুক্রবার সেন্টারটি খোলা থাকে।

ছ. বসনীয় মুসলিম শরণার্থীদের সেন্টার নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে সেন্টার নির্মাণে তা ব্যয় করা হয়।

জ. যাকাত সংগ্রহ ও বিলি করা হয়।

ঝ. সোস্যাল ইন্স্যুরেন্স ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। এককালিন সাহায্য ও বিভিন্ন প্রকার দান এ ফান্ডে গ্রহণ করা হয়। মুসলমানদের বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানে এ ফান্ড থেকে অর্থ ব্যয় করা হয়।

ঞ. ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হয়। মুসলিম পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ এ সমস্ত সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে আলোচনা করে থাকেন।

সেমিনারে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় ঃ

ক. Giving the west a clear picture of Islam through Islamic syllabi and practice of its principles.

খ. Highlighting the impact of the Islamic civilization on the European eivilization.

www.pathagar.com

গ. Discussing the role of Islam and nationalism.

অস্ট্রিয়ার আইন অনুযায়ী সেখানে সকল ধর্মের লোকেরা সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছে। এ সমস্ত সুযোগ সুবিধার অংশ হিসেবে অস্ট্রীয় মুসলিম নাগরিকরা বর্তমানে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সরকারী উচ্চপদে কর্মরত রয়েছে।

ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে অস্ট্রিয়াই প্রথম দেশ যে দেশে ইসলামকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা ও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ১৯১২ সালের ১৫ জুলাই এক সরকারী গেজেটে (আর্টিকেল নং-১৫৯) ইসলামকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৮২ সালে অস্ট্রীয় সরকার সেদেশের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে।

অস্ট্রীয়ায় মুসলমানদের এ সম্মানজনক পর্যায়ে আসতে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আসতে হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। অস্ট্রিয়ায় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ইসলামী সংগঠনগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. Islamic Institution in Austria, 1910 ঃ ভিয়েনায় অধ্যয়নরত মুসলিম ছাত্ররা এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে। এটি অস্ট্রিয়ার প্রথম ইসলামী সংগঠন।

২. Islamic Cultural Organization ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন Omar Ehrenfels. তিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা ইসলামী পণ্ডিত।

৩. Austrian Muslim Organization ঃ একদল ছাত্র ও শিক্ষাবিদ এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. Islamic Service Organization ঃ অস্ট্রীয়ায় অভিবাসনকৃত মুসলিম পণ্ডিত ড. ইসমাঈল বালী এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন।

অস্ট্রীয়ার সংবিধান অনুযায়ী সেখানকার ইসলামী সংগঠনগুলো দাওয়াহ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত অধিকার ভোগ করে আসছে।

www.pathagar.com

অস্ট্রীয়ায় বর্তমানে ৬০টিও অধিক ইসলামী সংগঠন ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইসলামী সংগঠনগুলোর নিরলস প্রচেষ্টা এবং সরকারী আনুকূল্য থাকায় অস্ট্রিয়ায় ইসলাম একটি বিকশিত ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র ভিয়েনায় ৮০টিরও অধিক মসজিদ রয়েছে। সংবিধান স্বীকৃত মুসলমানদের এ অধিকার এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারের অনুকূল পরিবেশ অব্যাহত থাকলে আগামী দিনের অস্ট্রিয়ায় ইসলাম একটি অপ্রতিরুদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে অস্ট্রীয় মুসলমানদের প্রত্যাশা। মুসলমানদের এ প্রত্যাশা ফুলেফলে সুশোভিত হয়ে উঠুক এটাই আমাদের কামনা।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা) জানুয়ারী, ২০০০।

www.pathagar.com

নিউজিল্যান্ডে ইসলাম ও মুসলমান ঃ উৎসের সন্ধানে

নিউজিল্যান্ডে ইসলামের আগমন বেশি দিনের নয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৯১০ সালে সর্বপ্রথম ভারতের গুজরাট থেকে Esup Musa নামক একজন মুসলমান জীবিকার সন্ধানে নিউজিল্যান্ডে আগমন করেন। নিউজিল্যান্ডে আগমন করার পর তার নাম ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে তিনি Joseph Moses নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন ১৯১৭ সালে তার ছেলে ইবরাহীম মুহাম্মাদ মূসা সস্ত্রীক নিউজিল্যান্ডে আগমন করেন। এর তিন বছর পর তাদের এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ মূসা। ইউসুফ মূসা ও তার সন্তানদের সমন্বয়েই নিউজিল্যান্ডে প্রথম মুসলিম পরিবার গড়ে ওঠে। তারা ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে কঠোরভাবে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে। ফলে পরিবারটি একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার হিসেবে বেড়ে উঠতে থাকে। ১৯১১ সালে গুজরাট থেকে Ismail Ahmad Bhikhoo নামে অপর একজন মুসলমান নিউজিল্যাণ্ডে আগমন করেন। পরবর্তীকালে তিনি তার পাঁচ ছেলে যথাক্রমে ইউসুফ, ইসমাইল, সোলেমান ইসমাইল, আবদুস সামাদ, ইবরাহীম ও হাসানকে তার কাছে নিয়ে আসেন। এরা নিউজিল্যান্ডে Five Bhikhoo brothers নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

এছাড়াও ভারতের মানেকপুর থেকে আমরুল্লা মিয়া, কেদার মিয়া, খালেদ, এস. খান, করীম, এম. রসূ এবং সেকু মিয়া ও তোসা মিয়ার পরিবার নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে এসে বসবাস শুরু করে। ভারত থেকে আগত এ মুসলিম পরিবারগুলোর মধ্যে Bhikhoo পরিবারই প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয়। তাদের আগমনের মধ্যদিয়েই নিউজিল্যান্ডে মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়। Five Bhikhoo Brothers-এর উদ্যোগেই ১৯৫০ সালে নিউজিল্যান্ডে "New Zealand Muslim Association (NZMA)" নামে প্রথম ইসলামী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এটি একটি রেজিস্টার্ড সংগঠন। দীর্ঘ ৩০ বছর কঠোর পরিশ্রম করে ১৯৭৯ সালে নিউজিল্যান্ডে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এ মসজিদটি নিউজিল্যান্ডের মুসলিম সমাজের মাইলফলক উন্মোচন করে। মসজিদ নির্মাণের পর থেকে এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলমানদের সকল ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

১৯৪৫ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী নিউজিল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৭জন। এর মধ্যে পুরুষ ৫৯জন এবং মহিলা ৮জন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর নিউজিল্যান্ডে বসবাসকারী মুসলমানরা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তাদের পরিবার-পরিজনকে ভারত থেকে নিউজিল্যান্ডে নিয়ে আসে। এর ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

Five Bhikhoo Brithers-দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোলেমান ভিক্ষুর উদ্যোগে ১৯৫০ সালের ১৮ জুলাই নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে প্রথম ঈদ-উল-ফিতর আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন করা হয়। এ দিন সোলেমান ভিক্ষু ৩০ জন মুসলমানকে ঈদ উদযাপনের জন্য তার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। এ সময় নিউজিল্যান্ড সফররত বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব এইচ. ইউসুফ প্যাটেলকে ঈদের জামায়াতে খুতবা দান ও ইমামতি করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঈদ-উল-ফিতর উদযাপনের মধ্য দিয়ে অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন করার ব্যাপারে মুসলমানরা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এরই ধারাবাহিকতায় একই বছর মুসলমানরা ঈদ-উল-আযহাও আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন করে। এ দুটি ঈদ আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপনের মধ্যে দিয়ে মুসলমানরা উপলব্ধি করে যে, তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে "New Zealand Muslim Association" প্রতিষ্ঠিত হয়। এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। যথাক্রমে সোলেমান ভিক্ষু ও ইসমাঈল আলী মূসা।

১৯৫১ সালের মে মাসে বসনিয়া ও কসোভো থেকে ৫০ জন মুসলিম শরণার্থী নিউজিল্যাণ্ডে আগমন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Petrik Ali., Omar Ferhatbegovich, Fadil Karseli, Selahattin Kefali, Mazhar Kransniqu, Omar Alim Pepich, Ibrahim Seidamet, Shaqur Seferi এবং Samso yosovich অন্যতম। নিউজিল্যাণ্ডের আইন ও প্রথা অনুযায়ী সরকার তাদেরকে তিন মাসের জন্য একটি সাবেক ছোট যুদ্ধবন্দী শিবিরে আটক রাখে। এ সময় তাদেরকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তারা অকল্যাণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় জীবিকার জন্য ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য মুসলিম সমাজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা বজায় রাখার লক্ষ্যে তারা নিয়মিত New Zealand Muslim Association-এর সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। পরবর্তীকালে যুগোশ্লাভিয়া থেকে নির্বাসিত এবং নিউজিল্যান্ডে আগত Avdo Musovich (1953) ও Ramzi Kosavich (1965)-এর সাথে তারা মিলিত হয়। এভাবে বলকান অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানদের সমন্বয়ে Auckland Muslim Community নামে অপর একটি মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়। নিউজিল্যান্ডে বসবাসরত বসনীয়, আলবেনীয় ও ভারতীয় (গুজরাটী) মুসলমানরা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে একত্রে নামায আদায় করতো ও ঈদ উদ্‌যাপন করতো। এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো এ সময় NZMA-এর সদস্যদের বাসায় বাসায় আয়োজন করা হতো। এ সময় কমিউনিস্ট শাসিত আলবেনিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া থেকে কমিউনিস্টদের নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক মুসলমান নিউজিল্যান্ডে আগমন করে। তারা ও NZMA-এর সদস্য কর্তৃক আয়োজিত ধর্মীয় প্রোগ্রামসমূহে অংশগ্রহণ করতো। এমন কি মধ্য ইউরোপ থেকে আগত অন্যান্য মুসলমানরাও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে NZMA-এর প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতো। এভাবেই বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলমানরা তাদের বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য ভুলে গিয়ে একই কালেমার পতাকাতলে সমবেত হয়ে একটি শক্তিশালী মুসলিম জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়। ফলে নিউজিল্যান্ডবাসী মুসলমানদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকে এবং মুসলমানদের চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেক স্থানীয় লোক মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। এভাবেই স্থানীয় লোকদের সাথে মুসলমানদের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারী অকল্যান্ডের কেন্দ্রস্থল Pitt Street-এ অবস্থিত Garibaldi Hall-এ New Zealand Muslim Association-এ 'প্রথম মুসলিম কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে NZMA-এর একটি শক্তিশালী নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ঃ

Esup Bhikhoo –	President
Abdul Samad Bhikhoo -	Secretcry
Ramzi Kosovich –	Member
Avdo Musovich –	"

www.pathagar.com

Shagir Seferi – "

C. Shekumia – "

Fadil Katseli – "

সম্মেলনে অকল্যান্ডের কেন্দ্রস্থলে একটি ইসলামিক সেন্টার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেন্টার নির্মাণের লক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার জন্য নির্বাহী কমিটির সদস্য Mr. Avdo Musovich-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কয়েকটি মুসলিম দেশ সফর করেন। প্রতিনিধি দলের সফরের ফলে ১৪০০ NZ ডলার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এ অর্থ দ্বারা অকল্যান্ডের কেন্দ্রস্থল Hargreave street-এ ইসলামিক সেন্টার নির্মাণের জন্য একটি ছোট বাড়ী ক্রয় করা হয়। এটিই হলো নিউজিল্যান্ডে প্রথম ইসলামিক সেন্টার। এ সেন্টারের (অস্থায়ী) মাধ্যমে নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

কর্মসূচি ঃ

ক. সভা-সম্মেলন, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা।

খ. নামায আদায় ও কায়েম করা।

গ. শিশু-কিশোরদের জন্য কুরআন শিক্ষা ক্লাস চালু করা।

ঘ. ফ্রি আউট ডোর ক্লিনিক চালু করা।

ঙ. দরিদ্র ও অসহায় মুসলমানদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষে আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করা।

ক্রয়কৃত ছোট বাড়ীটিতে ইসলামী সেন্টারের কার্যক্রম শুরু করা হলে ছোট ছেলেমেয়েদের কুরআন শিক্ষা দানের জন্য একজন ধর্মীয় শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে ভারতের গুজরাট থেকে ১৯৬০ সালে আহমদ সাঈদ মূসা প্যাটেল নামক একজন ইমাম সেন্টারে যোগদান করেন। ইংরেজী ভাষায় তার দক্ষতা না থাকার কারণে ইংরেজী ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের কুরআন শিক্ষা দানে জটিলতা দেখা দেয়। তবুও তিনি তার সীমিত যোগ্যতা নিয়েই কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এ সময় তিনি একটি Rope factory তে চাকরি গ্রহণ করেন। মৃতদের দাফন করার জন্য একটি কররস্থানের অভাব দীর্ঘদিনের। এ অভাব পূরণের লক্ষে ১৯৬৩ সালের ২৯ এপ্রিল New Zealand Muslim Association-এর

একটি প্রতিনিধিদল সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। দীর্ঘ আলোচনার পর সরকার মুসলমানদের কবরস্থানের জন্য পশ্চিম অকল্যান্ডে একটি জায়গা বরাদ্দ করে।

নিউজিল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় Hargreave Street-এর ছোট বাড়ীটিতে ইসলামিক সেন্টারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ায় ১৯৬৭ সালে বাড়ীটি বিক্রী করে Pompalier Terrace-এ ৪০০০ নিউজিল্যান্ড ডলারে তুলনামূলকভাবে মাঝারী সাইজের একটি বাড়ী ক্রয় করা হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালে এ বাড়ীটিও বিক্রী করে দেয়া হয় এবং ২২,০০০ নিউজিল্যান্ড ডলার ব্যয়ে 17, vermont street -এ একটি বড় ফ্লাটবাড়ী ক্রয় করা হয়।

১৯৭৬ সালে সরকারী আদম শুমারী অনুযায়ী শুধুমাত্র অকল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা ৬৪৪ বলে উল্লেখ করা হয়। অকল্যান্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি পর্যায়ক্রমে আরো সুসংহত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে ১৯৭৬ সালের ২৫ জুলাই NZMA-এর বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় Auckland Muslim Communtiy-এর সাথে NZMA-এর সহযোগিতা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার লক্ষে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির সদস্যবৃন্দ

আবদুস সামাদ ভিক্ষু–	সভাপতি
আবদু মুসোভিচ–	সহ-সভাপতি
ইমাম আহমদ সাঈদ মূসা প্যাটেল–	প্রেট্রন
ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ ইসমাইল সিদাত–	ধর্মীয় উপদেষ্টা
আবদুর রহীম রশীদ–	আইন উপদেষ্টা
মাযহার ক্রাসনিকি–	অডিটর
মুহাম্মাদ ইবরাহীম মূসা–	ট্রেজারার
ডঃ আনিসুর রহমান–	সহকারী সেক্রেটারী
মুহাম্মাদ সোলেমান ভিক্ষু–	সদস্য
আবদুল হক ভিক্ষু–	সদস্য
সাঈদ আলভী–	সদস্য
আব্বাস আলী–	সদস্য
মুহাম্মাদ ইয়াকুব খান–	সদস্য

www.pathagar.com

New Zealand Muslim Association (NZMA)-এর কার্যক্রমকে সময়ের চাহিদানুযায়ী আরো গতিশীল করার লক্ষে NZMA-এর নির্বাহী কমিটিকে গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯৭৭ সালের ১ জানুয়ারী NZMA-এর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ

আবদুল রহীম রশীদ-	সভাপতি ও আইন উপদেষ্টা
আবদু মূসোভিচ-	সহ-সভাপতি
মুহাম্মাদ ইয়াকুব খান-	সহকারী সেক্রেটারী
ইমাম আহমদ সাঈদ মূসা প্যাটেল-	ধর্মীয় উপদেষ্টা
ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ ইসমাঈল সিদাত-	ধর্মীয় উপদেষ্টা
বি. এফ. ডিবলী-	সদস্য
মুহাম্মদ মূসা-	সদস্য
মাযহার ক্রাসনিকী -	সদস্য
আবদুস সলীম ড্রেক-	সদস্য
ভি. এম. বিলিনকো-	সদস্য

নবগঠিত নির্বাহী কমিটি গঠন করার পর প্রথম সভায়ই অকল্যান্ডের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় আকারের মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অবশ্য আর্থিক সংকটের কারণে কিছুসংখ্যক সদস্য এর বিরোধিতা করেন এবং একটি ভাড়া বাড়ীতে আপাততঃ নামায আদায়ের ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু নির্বাহী কমিটির সভাপতি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্তের প্রতি অটল থাকেন। ফলে মসজিদ নির্মাণের পক্ষেই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে মক্কাভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা রাবেতা আলমে ইসলামীর নিকট একটি আবেদন করা হয়। এ আবেদন পত্রের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য Australian Federation of Islamic Councils (AFIC)-এর তদানিন্তন সেক্রেটারী জনাব কাযীম হুসাইনকে নিউজিল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়। জনাব কাযীম হুসাইন মসজিদ নির্মাণের স্বপক্ষেই তাঁর প্রতিবেদন রাবেতা মক্কা অফিসে পেশ করেন। দেশের আইন অনুযায়ী মসজিদ নির্মাণের জন্য সরকারের অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন। সরকারী অনুমোদন নেয়ার জন্য স্থানীয় নও-মুসলিম ও

www.pathagar.com

NZMA-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য Abdul Salim Drake-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৭৭ সালের শেষের দিকে তিনি প্রস্তাবিত মসজিদের একটি প্লান অকল্যান্ড সিটি কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন। বিভিন্ন অজুহাতে সিটি কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ অনুমোদন বিলম্বিত করেন। এদিকে ১৯৭৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর নিউজিল্যান্ডসহ মিশরীয় রাষ্ট্রদূত Dr. Sourer দু'জন সউদী প্রতিনিধিসহ NZMA-এর কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং প্রস্তাবিত মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। রাষ্ট্রদূতের এ সফরের একমাস পর রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ওমর আল-খাতীবের নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি সউদী প্রতিনিধি দল NZMA-এর কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং প্রস্তাবিত মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে আলোচনা করেন।

একাধিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে মসজিদ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করার পর রাবেতা আলমে ইসলামী NZMA-এর আবেদন মঞ্জুর করে এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস দেয়। রাবেতা মক্কা কর্তৃক অর্থ বরাদ্দের পর ১৯৭৯ সালের ৩০ মার্চ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন New Zealand Muslim Association-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং নিউজিল্যান্ড মুসলিম কমিউনিটির অবিসংবাদিত নেতা Suleiman Bhikhoo. এটিই হলো নিউজিল্যান্ডের প্রথম মসজিদ। মসজিদ নির্মাণের জন্য Fijian-Indian builder developer Mr. Feroz khan-কে কন্ট্রাক্ট দেয়া হয়। অর্থ যোগানের ব্যাপারে Developer সংস্থাকে আশ্বস্ত করার লক্ষে মসজিদ কমিটির সকল সদস্য তাদের বাসগৃহ Mortgage রাখেন। আল্লাহর দীনের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও আস্থাই তাঁদেরকে এ মহতী সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। দীনের প্রতি অগ্রসরমান মসজিদ কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন–

১. মাযহার ক্রাসনিকী
২. আবদুল রহীম রশীদ
৩. সাঈদ আলভী
৪. মুহাম্মাদ ইয়াকুব প্যাটেল
৫. মুহাম্মাদ হোসাইন

মসজিদ নির্মাণের কাজ অব্যাহত রাখার প্রেক্ষাপটে ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে ৩০ ফুট উঁচু একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয় এবং একই বছরের আগস্ট মাসে এ মসজিদে প্রথম ঈদ-উল-ফিতরের নামায অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৮২ সালে নামাযের হল রুমের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে আর্থিক সংকটের কারণে নির্মাণ কাজ ধীরগতিতে অব্যাহত থাকে। অবশ্য ৩০ বছরের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আজ এ মসজিদটি নিউজিল্যান্ডের মুসলমানদের গর্ব ও অহংকারের মিনারে পরিণত হয়েছে।

মসজিদ নির্মাণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। এর সিংহভাগই বিদেশী ইসলামী সংস্থাগুলো বহন করে এবং স্থানীয় মুসলমানরাও তাদের সামর্থ অনুযায়ী নির্মাণ তহবিলে অর্থ দান করেন। ব্যয়িত অর্থের মধ্যে–

১. রাবেতা আলমে ইসলামী (মক্কা) = ৭০,০০০ NZ ডলার

২. অস্ট্রেলিয়া ও ফিজির সংস্থাসমূহ = ৫০,০০০ " "

৩. সউদী ও কুয়েতী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান = ২০,০০০ " "

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমানে অকল্যান্ডে ৮০০ মুসলমান বসবাস করছে।

১৯৮৪ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। এ সময় 'Islamic Activities Building' নামে অপর একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। মুসলিম আর্কিটেক্ট আবদুল আযীয এ ভবনের ডিজাইন তৈরি করেন। J. M. Stifee Hooker & Associatcs-কে এ ভবন নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯০ সালে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়।

মসজিদের প্রথম ইমাম বার্ধক্যজনিত কারণে খতীবের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করায় বর্তমানে উগান্ডার Shaikh Khaukha Haroon খতীবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে মসজিদে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সিরীয় আলেম Shaikh Muhammad Airut.

এ মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে নিউজিল্যান্ডের মুসলমানদের দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন হলো। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই আগামী দিনে নিউজিল্যান্ডের মুসলমানরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি আদর্শিক প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা নিউজিল্যান্ডের মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), ফেব্রুয়ারী, ২০০১।

www.pathagar.com

আর্জেন্টিনায় ইসলাম : শত বছরের চালচিত্র

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষতার ধারাবাহিকতায় ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ের পাতাগুলো এক এক করে উল্টালে আমরা দেখতে পাবো সুশৃঙ্খল, শক্তিশালী ও সুশীল সমাজ গঠনে ধর্ম সর্বদাই সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। এক্ষেত্রে মুসলিম জাতিসত্ত্বা ও সমাজ গঠনে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা অনন্য সাধারণ।

সপ্তম শতাব্দীতে আরবের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে ইসলামের আগমনের মাত্র এক শতাব্দীকালের মধ্যেই পৃথিবীর একটি বিরাট জনপদে বসবাসকারী মানুষের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ পরিবর্তনের ধারায় জীবনবাদী ও পারলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বার্থক সমন্বয় সাধিত হয়। ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবের বুকে সূচিত হয় ইতিহাসের এক প্রোজ্জ্বল অধ্যায়।

ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, যখনই মুসলমানরা কোনো জনপদে হিজরত করেছে তখনই সেখানে কল্যাণধর্মী ও সুশীল সমাজের যাত্রা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের ছোয়ায় প্রতিটি জনপদ সুশীল ও কল্যাণধর্মী সমাজে রূপান্তরিত হয়। এটা ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তিরই বহির্প্রকাশ। ইসলামের এ অন্তর্নিহীত শক্তির ফলেই মাত্র এক হাজার বছরের মধ্যে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়, যার ফলে অর্ধপৃথিবী মুসলিম শাসনাধীনে আসে। ইতিহাসের এই অনিবার্য ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে আর্জেন্টিনায় ইসলামের আগমন ঘটে। তবে আর্জেন্টিনায় ইসলাম আগমনের সঠিক কাল নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, আজ থেকে ১২০ বছর পূর্বে আর্জেন্টিনায় ইসলামের আমন ঘটে।

১২০ বছর পূর্বে লেবাননের একদল তরুণ ও উদ্যমী ব্যবসায়ী বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আর্জেন্টিনায় আগমন করে। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আশা এ তরুণ ব্যবসায়ী দলটি আর্জেন্টিনায় স্থায়ীভাবে থেকে যায় এবং স্থানীয় মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আর্জেন্টিনার মাটিতে ইসলামের শিকড় প্রোথিত হয়।

www.pathagar.com

কালক্রমে ইসলাম সেখানে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমানরা এসে এখানে বসবাস করতে থাকে। এভাবেই আর্জেন্টিনায় মুসলিম সমাজের যাত্রা শুরু হয়।

বর্তমানে আর্জেন্টিনায় একটি মিশ্র মুসলিম জাতিসত্ত্বা গড়ে উঠেছে। ১২০ বছর পর বর্তমানে তৃতীয় প্রজন্মের মুসলমানদের পদচারণা আর্জেন্টিনায় লক্ষ করা যাচ্ছে। আর্জেন্টিনার মুসলমানরা পারিবারিক পরিবেশে ইসলাম চর্চা করে এবং ইসলামী অনুশাসন মানার চেষ্টা করছে। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য সেখানে কোনো দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। তাই আর্জেন্টিনার বর্তমান মুসলিম প্রজন্ম ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য মুসলিম শিক্ষক, দায়ী এবং পণ্ডিতদের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছে। তারা তাদের নতুন প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শের আলোকে গড়ে তোলার লক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই আর্জেন্টিনার মুসলমানরা বুয়েনাস আয়ার্সে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। এ স্কুলে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী ও আরবী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আজ থেকে পনের বছর পূর্বেও আর্জেন্টিনার মুসলমানরা ইসলামী নাম রাখার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আশির দশকের গোড়ার দিকে আর্জেন্টিনার বিভিন্ন শহরে বসবাসকারী মুসলমানরা এক গোপন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনাস আয়ার্স-এ এসে জড়ো হয় এবং এক সভায় মিলিত হয়ে তাদের অধিকার আদায় ও দাওয়াহ কাজ সম্প্রসারণের লক্ষে Centre for Da'wah and Culture in Buenos Aires নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনের ব্যানারে তারা রাজধানীতে একটি মিছিল বের করে এবং নিম্নোক্ত দাবীতে সরকারের নিকট মেমোরেন্ডাম পেশ করে। দাবীসমূহ ঃ

১. মুসলমানদেরকে ইসলামী নাম রাখার অধিকার দেয়া।

২. নিজস্ব উদ্যোগে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া।

৩. দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়া।

৪. মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করার লক্ষে সংগঠন প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া।

৫. মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দেয়া।

www.pathagar.com

সরকার তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদেরকে মুসলিম নাম রাখার অনুমতি দান করে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দাবীগুলোও মানার আশ্বাস প্রদান করে।

আর্জেন্টিনার বর্তমান লোক সংখ্যা ৩৩ মিলিয়ন। আর্জেন্টিনার অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও সরকারের সাথে মুসলমানদের কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। বর্তমান প্রেসিডেন্ট Carlos Menem (কার্লোস মেনেম) মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ফলে আর্জেন্টিনার মুসলমানদেরকে কোনো সমস্যা মুকাবিলা করতে হচ্ছে না। এতে তারা নিজস্ব পরিবেশে নির্বিঘ্নে ইসলাম চর্চা ও দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি Centre for Dawah and Culture in Buenos Aires -এর পরিচালক মুহাম্মাদ ইউসুফ হাজার Muslim world league Journal-এর সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেন ঃ

"It is not very easy to practise a true Muslim life in a non Muslim Society. Howver, I am sure that what we have learnt at home is very important and that covers many Islamic information."

অর্থ ঃ "অমুসলিম সমাজে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করা খুব সহজ নয়। তবুও বাড়ীতে আমরা ইসলামের যে শিক্ষা পাই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ শিক্ষা ইসলাম সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি জানতে সহায়তা করে।"

মুহাম্মাদ ইউসুফ হাজার-এর উপরোক্ত উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, অনৈসলামিক পরিবেশে মুসলমানরা প্রচণ্ড বৈরী পরিবেশে বেড়ে ওঠে এবং পারিবারিক পরিবেশে ইসলাম চর্চার ফলশ্রুতিতেই নিজেদের আদর্শিক পরিচয়কে বজায় রাখতে তারা সক্ষম হচ্ছে। আর্জেন্টিনার মুসলমানদের প্রধান সমস্যা হলো ঃ

ইসলামের ব্যাপক চর্চার অভাবে মুসলিম পরিবারগুলো পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারছে না। এতে পরিবারগুলোতে ইসলামী আদর্শের সত্যিকার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। ফলে পরিবারে ইসলামী আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং এ প্রেক্ষিতে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম ইসলামের সত্যিকার পরিচয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মুসলিম সমাজের এ কঠিন অবস্থার মুকাবিলা করার জন্য আর্জেন্টিনার মুসলিম নেতৃবৃন্দ World Assembly of Muslim youth এবং

www.pathagar.com

Rabitat Al-Alam Al-Islami-র সাথে যোগাযোগ করে পারিবারিক পরিমন্ডলে ইসলামী শিক্ষা কর্মসূচি চালু করতে সক্ষম হয়েছে। অতি সম্প্রতি রাবেতা আলমে ইসলামীর আর্থিক সহযোগিতায় ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ূথ (ওয়ামী)-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং Centre for Da'wah and Culture in Buenos Aires-এর তত্ত্বাবধানে মুসলিম এলাকাগুলোতে পারিবারিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ফলে পরিবারের সদস্যরা ইসলাম চর্চার সুযোগ পাচ্ছে এবং স্ব স্ব পরিবারগুলোকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এক একটি মডেল পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হচ্ছে। পরিবারে ইসলাম চর্চার ফলে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম ইসলামী আদর্শের সাথে পরিপূর্ণভাবে পরিচিত হবার এবং আগামী দিনের চাহিদানুযায়ী নিজেদেরকে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে।

আর্জেন্টিনায় চলমান এ শিক্ষা কর্মসূচি অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে আগামী ৪র্থ অথবা ৫ম প্রজন্ম পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আদর্শে গড়ে উঠবে বলে মুহাম্মাদ ইউসুফ হাজার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আত্মগঠনমূলক এ কর্মসূচির পাশাপাশি আর্জেন্টিনার মুসলমানরা দাওয়া কার্যক্রমও চালু করেছে। এর ফলে স্থানীয় লোকেরাও ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। এভাবেই আগামী দিনের আর্জেন্টিনায় ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

১৯৯২ সালে সউদী সরকার ও আর্জেন্টিনীয় সরকারের মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে রাজধানী Buenos Aires-এ King Fahad Project নামে একটি বৃহদাকার ইসলামিক সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। আর্জেন্টিনায় নিযুক্ত সউদী রাষ্ট্রদূতের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সেন্টারের নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সেন্টারের জন্য আর্জেন্টিনীয় সরকার প্রয়োজনীয় জমি দান করেছে। সেন্টারটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে এখানে নার্সারী থেকে মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সারা দেশ থেকে মুসলিম শিশু কিশোররা এখানে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। এ সেন্টারটি আগামী দিনে ল্যাটিন আমেরিকার প্রধান দাওয়াহ কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে আর্জেন্টিনার মুসলিম নেতৃবৃন্দ মনে করেন।

বর্তমানে দাওয়াহ কাজ সম্প্রসারণের ফলে গড়ে প্রতিদিন ৪/৫ জন আর্জেন্টিনীয় নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করছে। নওমুসলিমদেরকে ইসলামের

www.pathagar.com

মৌলিক শিক্ষা দানের জন্য Centre for Da'wah and Culture in Buenos Aires ব্যাপকভিত্তিক Orientation course চালু করেছে। রাবেতা আলমে ইসলামী ও কুয়েত মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আর্জেন্টিনীয় নওমুসলমান পবিত্র হজ্জব্রত পালনের সুযোগ পাচ্ছে।

অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদের ন্যায় আর্জেন্টিনার মুসলমানরাও বর্তমানে ইসলাম বিরোধী প্রচার প্রোপাগান্ডার শিকার হচ্ছে। এ Anti Islamic Media-র অপতৎপরতার মুকাবিলায় ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরার লক্ষে ইসলামী সংগঠনগুলো তাদের কর্মীদের জন্য Refresher Course চালু করেছে। এ Refresher course-এর মাধ্যমে দাওয়াহ কর্মীরা তথ্য সন্ত্রাসের মুকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করার সুযোগ পাচ্ছে।

আর্জেন্টিনায় ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামী সংগঠনগুলো নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

কর্মসূচি

১. স্প্যানিস ভাষায় ইসলামী পুস্তক অনুবাদ ও বিলি করা।

২. ইসলামী সংগঠনগুলোর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সমন্বিত দাওয়াহ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৩. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৪. শিক্ষাবৃত্তির আওতায় মুসলিম যুবকদেরকে উচ্চশিক্ষার জন্য মুসলিম দেশসমূহে প্রেরণ করা।

৫. হজ্জ প্রকল্পের আওতায় নওমুসলিমদের জন্য হজ্জের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬. পরিবার কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা।

৭. সকল ইসলামী সংগঠনের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।

এ সমস্ত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে আজকের আর্জেন্টিনা আগামী দিনে ইসলামী আর্জেন্টিনায় উন্নীত হতে পারবে বলে আর্জেন্টিনার মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা। আর্জেন্টিনার মুসলিম নেতৃবৃন্দের এ প্রত্যাশা পূরণ হোক এটা আমাদের কামনা। আমরা আর্জেন্টিনার মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), জুন, ১৯৯৮।

www.pathagar.com

আইভরি কোস্টে ইসলাম ঃ কিছু কথা

আইভরি কোস্ট আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ। অন্ধকার মহাদেশ বলে খ্যাত আফ্রিকায় ইসলামের আগমন ঘটে রাসূলে করীম (স)-এর মক্কী জীবনেই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের উপর কাফির ও মুশরিকদের যুলুম ও অত্যাচার সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। কাফির ও মুশরিকদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশে হযরত উসমান (রা)-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ১৫জন মুসলমান আজকের ইথিওপিয়া তদানিন্তন হাবশায় হিজরত করেন। এ হিজরতের মধ্য দিয়েই আফ্রিকায় ইসলামের আগমন ঘটে এবং কালক্রমে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে ইসলামের বিকাশ ঘটে। আফ্রিকা মহাদেশের দেশে দেশে ইসলামের এ অব্যাহত অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে আইভরি কোস্টে ইসলামের আগমন ঘটে বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

আইভরি কোস্টে ইসলামের আগমন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, সপ্তম শতাব্দীতেই আইভরি কোস্টে ইসলামের আগমন ঘটে। Gregorian Calendar অনুযায়ী অপর একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, চৌদ্দশত শতাব্দীতে আইভরি কোস্টে ইসলামের আগমন ঘটে। তারা মনে করেন যে, আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম আইভরি কোস্টে ইসলামের আগমন ঘটে এবং আঠার শতকের গোড়ার দিকে আরব ব্যবসায়ীরা যখন আইভরি কোস্টের উত্তরাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই সেদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ ব্যাপকতা লাভ করে।

বর্তমানে আইভরি কোস্টে মুসলমানরা একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তারা দেশের অর্থনৈতিক সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুসলমানরা দেশের বাণিজ্য, পরিবহন ও নির্মাণ সেক্টর নিয়ন্ত্রণ করছে। এ তিনটি সেক্টরে মুসলমানদের অপ্রতিরুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও মুসলমানদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুসলমানদের এ অপ্রতিরুদ্ধ অগ্রযাত্রার পেছনে সেদেশের ইসলামী সংগঠনগুলোর মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত প্রধান প্রধান ইসলামী সংগঠনগুলো হলো ঃ

www.pathagar.com

১. Islamic National Council (1993)

২. The Supreme Council for Imams (1987)

৩. The League of Muslim preachers is Ivory Coast (1987)

এছাড়াও আরো অনেকগুলো আঞ্চলিক সংগঠন ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে কাজ করছে। ইসলামিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করার লক্ষে সকল ইসলামী সংগঠন নিয়ে একটি ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এ ফোরামের আওতায় ইসলামী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন ও পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশের ১০টি প্রদেশ ও ৭৮টি জেলায় ফোরামের শাখা রয়েছে। ফোরাম আইভরি কোস্টের মুসলমানদের একটি প্রিয় নাম। National Islamic Council নামে ফোরামটি কর্মরত রয়েছে।

Council বর্তমানে যে সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. শিক্ষা কার্যক্রম
২. আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প
৩. দাওয়াহ কার্যক্রম

এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করছে। প্রতি শুক্রবার কমপক্ষে ৫০ জন লোক জুমা মসজিদে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে। আইভরি কোস্টে ইসলাম বর্তমানে একটি বিকাশমান ধর্ম।

ইসলামী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ সমস্ত অর্থ নিম্নোক্ত উৎস থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

অর্থের উৎসসমূহ

ক. যাকাত
খ. ব্যক্তিগত দান
গ. প্রাতিষ্ঠানিক দান

দেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে শিক্ষা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদানে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আরবী ও ফার্সী ভাষায় পাঠদান করা হয়।

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সমন্বিত সিলেবাস প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষে সম্প্রতি Muslim Teachers Association নামে শিক্ষকদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। Association ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সমন্বিত সিলেবাস প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। আশা করা যায় স্বল্প সময়ের মধ্যে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদান করা সম্ভব হবে। সমন্বিত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান কার্যক্রম শুরু হলে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একমুখী শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে। ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। অপর দিকে যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে Modern curriculum এবং Modern Teaching Methodology প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে আশা করা যায় যে, আগামী দিনের আইভরি কোস্টের মুসলমানরা যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। আইভরি কোস্টে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষে সেখানকার মুসলমানরা সংবাদ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। এ লক্ষকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই তারা L Appeal (The call) নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রীয় বেতার এবং টেলিভিশনে ইসলামী প্রোগ্রাম চালু করার জন্য ইসলামী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন থেকে সরকারের নিকট দাবী করে আসছে। ইসলামী সংগঠনগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার রাষ্ট্রীয় বেতারে প্রতি শুক্রবার মধ্যরাতে এক ঘন্টা এবং টেলিভিশনে ৪৫ মিঃ-এর প্রোগ্রাম চালু করেছে। সপ্তাহে একদিনের মধ্যরাতের প্রোগ্রাম যথেষ্ট না হওয়ায় ইসলামী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে এবং তাদের অর্থায়নে একটি ইসলামী বেতার স্টেশন চালুর প্রচেষ্টা চলছে।

বেতার স্টেশন চালুর লক্ষে ইসলামী সংগঠনগুলো সরকারের নিকট রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছে। সরকারী অনুমোদন পেলে আইভরি কোস্টে বেসরকারী পর্যায়ে প্রথম ইসলামিক রেডিও স্টেশন চালু হবে। এ ধরনের একটি রেডিও স্টেশন চালু করা সম্ভব হলে সেদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ব্যাপকতর হবে বলে আশা করা যায়। ইসলামী সংগঠনগুলোর গৃহীত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে এক বিংশ শতাব্দীর আইভরি কোস্ট একটি ইসলামী আইভরি কোস্টে পরিণত

www.pathagar.com

হবে বলে আইভরি কোস্টের মুসলমানদের প্রত্যাশা। আইভরি কোস্টের মুসলমানদের এ প্রত্যাশা পূরণ হোক এটাই আমাদের কামনা।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), এপ্রিল-মে, ১৯৯৯।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

গায়েনায় ইসলাম ঃ একটি সমীক্ষা

গায়েনা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। দীর্ঘদিন দেশটি বৃটেনের ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিলো। অনেক সংগ্রাম আর ত্যাগ তিতিক্ষার পর ১৯৭০ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটির আয়তন ২,১৪,৯৬৯ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৮০ লাখ। মুসলমানদের সংখ্যা ১ লাখ।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রায় দুশ বছর পূর্বে মুসলমানরা সর্বপ্রথম গায়েনায় আগমন করে। মুসলমানরা প্রধানত ভারত ও আফ্রিকা থেকে এখানে আসে। সে সময় ভারত ও আফ্রিকা বৃটেনের উপনিবেশ ছিল। গায়েনার কলকারখানা ও কৃষিজমিতে শ্রমিক হিসেবে খাটানোর জন্য বৃটিশ সরকার মুসলমানদেরকে তখন জোরপূর্বক গায়েনায় নিয়ে আসে। গায়েনায় আগত মুসলমানরা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজেদের জাতিগত পরিচয়কে ভুলে যায়নি বরং গায়েনায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অব্যাহত ভূমিকা পালন করে আসছে। তাদের এ অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের সংখ্যা বর্তমানে ১ লাখে উন্নীত হয়েছে।

সে সময় সরকার গায়েনায় আগত মুসলমানদেরকে দেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করার সুযোগ দেয়। ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানরা কয়েকটি Community গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এ সমস্ত Community-র উদ্যোগে মুসলমানরা স্থানীয়ভাবে মসজিদ ও ইসলামী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। বৃটিশ সরকার তার ঔপনিবেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃতি দেয়ার পর ১৮৬০ সালে গায়েনায় মুসলমানরা প্রথম মসজিদ নির্মাণ করে। এ অধিকার লাভের পরই গায়েনার মুসলমানরা ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী বিবাহ প্রথা চালু করে, প্রকাশ্যে জুমার নামায পড়ার অধিকার লাভ করে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মানার সুযোগ লাভ করে।

মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ১৯৩৬ সালে Anjuman Sadr Islam Organization নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এটিই সেদেশে মুসলমানদের প্রধান ও প্রথম স্বীকৃত সংগঠন। এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সারাদেশে এর শাখা সংগঠন কায়েম করা হয়। শাখা সংগঠনগুলোর তত্ত্বাবধানে একই সময় সারা দেশে স্থানীয়

www.pathagar.com

উদ্যোগে বহুসংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে রাজধানী শহরে বড় বড় পাঁচটি মসজিদ রয়েছে এবং প্রতিটি মসজিদই নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে।

গায়েনায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে বর্তমানে অনেকগুলো ইসলামী সংগঠন কর্মরত রয়েছে। এ সমস্ত সংগঠনের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করার জন্য The Islamic Centre Organization নামে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনাব ফযল মুহাম্মাদ ফিরোজ সংগঠনটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এক সাক্ষাৎকারে জনাব ফিরোজ বলেন, "নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতার আলোকে দাওয়াহ কাজে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।" তিনি আরো বলেন, "দাওয়াহ কাজের মাধ্যমেই একজন মুসলমান আল্লাহ্‌র পথ ও রাসূল (স)-এর সুন্নাহ্‌র উপর অবিচলভাবে টিকে থাকতে পারে।" জনাব ফিরোজ বলেন, গায়েনার ইসলামী সংগঠনগুলোর দাওয়াহ কর্মসূচি বাস্তবায়নে মক্কাভিত্তিক রাবেতা আলমে ইসলামী, জেদ্দাভিত্তিক ওয়ামী এবং মুসলিম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অব আমেরিকা নিয়মিত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে আসছে।

জনাব ফিরোজের মতে, গায়েনার মুসলিম যুবকরা গত দু'দশক যাবত পশ্চিমা অপপ্রচার মুকাবিলা করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কঠিন সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। মুসলমানদের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও সাফল্যকে থামিয়ে দেয়ার জন্য গায়েনা সরকার বর্তমানে বেশ কয়েকটি কাদিয়ানী সংগঠনকে ইসলামী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ সমস্ত কাদিয়ানী সংগঠন যুবকদেরকে বিপথগামী করার লক্ষে আর্থিক সহযোগিতাসহ বিভিন্নমুখী সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ফলে অনেক মুসলিম যুবক কাদিয়ানীদের ফাঁদে আটকে যাচ্ছে এবং ইসলামী আকীদা থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। মুসলিম যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য কাদিয়ানী সংগঠনগুলো ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় রচিত বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করছে। তাদের এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে। ফলে গায়েনার মুসলমানরা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েছে। গায়েনার মুসলমান যুবকরা সচ্ছল জীবনের আশায় প্রতিবেশী দেশ ও আমেরিকায় পাড়ি জমাচ্ছে। অবশ্য এটা দেশের সামগ্রিক চিত্র। বর্তমানে দেশের ৩৫% যুবক দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়। এর মধ্যে মুসলিম যুবকরাও রয়েছে।

www.pathagar.com

গায়েনার ইসলামী সংগঠনগুলো তাদের গৃহীত দাওয়াহ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার সুযোগ পেলে আগামী দিনের গায়েনায় ইসলাম একটি অপ্রতিরুদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে গায়েনার মুসলমানরা বিশ্বাস করে। ইসলামিক সেন্টারের সভাপতির মতে গায়েনায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। তিনি বলেন ঃ

"Muslims of Guyana enjoy a large measure of freedom including freedom to propagate the message of Islam."

অর্থ ঃ "আল্লাহর বাণী প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে গায়েনার মুসলমানরা বর্তমানে বেশ স্বাধীনতা ভোগ করছে।"

গায়েনায় ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষে সউদী সরকার রাবেতা আলমে ইসলামী ও ওয়ামীসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা দান ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখার জন্য গায়েনা ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ আহ্বানে সাড়া দেয়া সকল আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনগুলোর এখন সময়ের দাবী বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাস ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), জুন, ১৯৯৯।

www.pathagar.com

লাইবেরিয়ায় ইসলাম ঃ মুসলমানদের চালচিত্র

লাইবেরিয়া আফ্রিকা মহাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্ত প্রথম প্রজাতন্ত্র। ১৯৪৭ সালে লাইবেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। অন্ধকার মহাদেশ বলে খ্যাত আফ্রিকা মহাদেশ। এর আয়তন ১,১৬,৯৯,০০০ বর্গমাইল। আফ্রিকা স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি মহাবীর তারেকের স্মৃতি বিজড়িত 'জাবালুত্তারিক' বা সংকীর্ণ জিব্রাল্টার প্রণালী দ্বারা ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন।

পঞ্চান্নটি দেশ নিয়ে আফ্রিকা মহাদেশ গঠিত। এ মহাদেশের মোট জনসংখ্যা ছাব্বিশ কোটি। এর মধ্যে ষোল কোটি মুসলমান, আড়াই কোটি খৃস্টান, ষাট লাখ হিন্দু এবং ইহুদী। অবশিষ্ট ছয় কোটি নব্বই লাখ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী।

পঞ্চান্নটি দেশের মধ্যে একুশটি মুসলিম শাসিত এবং অবশিষ্ট পঁয়ত্রিশটি খৃস্টান ও অন্যান্য জাতি কর্তৃক শাসিত। আফ্রিকার দেশসমূহে মুসলিম জনসংখ্যা ও কর্তৃত্বের দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. যেসব দেশে পূর্ণ মুসলিম কর্তৃত্ব রয়েছে এবং মুসলমানদের সংখ্যা ৯০% ভাগ।

খ. যেসব দেশে মুসলিম জনসংখ্যা ৬০% ভাগের বেশি। অথচ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব রয়েছে খৃস্টানদের হাতে।

গ. যেসব দেশে মুসলমানদের সংখ্যা ৬৫% ভাগেরও বেশি। অথচ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব খৃস্টানদের হাতে অথবা তাদের প্রভাবিত জনগোষ্ঠির হাতে রয়েছে।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আফ্রিকার যেসব দেশ খৃস্টান বা তাদের প্রভাবিত জনগোষ্ঠি দ্বারা শাসিত হচ্ছে তার প্রধান কারণ হলো যোগ্য ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মুসলিম নেতৃত্বের অভাব। নেতৃত্বের অভাবের কারণেই আফ্রিকার দেশে দেশে আজো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ খৃস্টানদের শাসন শোষণের শিকার হচ্ছে। লাইবেরিয়া এমনি একটি মুসলিম দেশ যেখানে ৫০% ভাগ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ৩৫% ভাগ খৃস্টানের শাসন ও শোষণের যাতাকলে আটকে পড়ে আছে।

www.pathagar.com

লাইবেরিয়া আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এর দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে ঘায়েনা, পূর্বে আইভরী কোস্ট এবং পশ্চিমে সিয়েরা লিওন অবস্থিত। লাইবেরিয়ার আয়তন ৪৩,০০০ বর্গমাইল এবং এর লোক সংখ্যা ২.৫ মিলিয়ন। মোট জনসখ্যার ৫০% মুসলমান ৩৫% খৃস্টান এবং ১৫% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

লাইবেরিয়া এমন একটি স্বাধীন দেশ যেখানে সকল ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মকর্ম করতে পারে এবং ধর্ম প্রচারেও সেখানে কোনোরূপ বাধা দেয়া হয় না। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই এখানে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে। ফলে সব ধর্মাবলম্বীদের মাঝেই একটি সম্প্রীতির ভাব গড়ে উঠেছে। এই সম্প্রতি সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে প্রচণ্ডভাবে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ নিশ্ছিদ্র জাতীয় ঐক্যের ফলে দেশের উন্নয়ন কাজ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

লাইবেরিয়া আমেরিকার অনুকরণে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক এবং বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার কাজ অব্যাহত রেখেছে। লাইবেরিয়া ধর্মীয় সম্প্রীতির এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাই লাইবেরিয়াকে বলা হয় ঃ

> "It is a Country, where in every citizen regardless of religion and belief has the right to practice and preach his own religion and ideology without any interference."

> অর্থ ঃ "লাইবেরিয়া এমন একটি দেশ যেখানে ধর্মীয় হস্তক্ষেপমুক্ত পরিবেশে সকল ধর্মের লোকেরা স্ব স্ব ধর্মকর্ম করতে পারে এবং ধর্মীয় প্রচারকার্য চালাতে পারে।"

লাইবেরিয়ায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোনো দন্দ্ব-সংঘাত নেই। এর প্রধান কারণ হলো লাইবেরিয়ায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি Strong Social Co-operation বিরাজমান। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিরাজমান এ Strong Social Co-operation দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। লাইবেরিয়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট হলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ লাইবেরিয়া সংখ্যালঘু খৃস্টানদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও লাইবেরিয়ার মুসলমানরা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্নমুখী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের অবদান রেখে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

লাইবেরিয়ার পার্লামেন্টে ১০% জন মুসলিম সদস্য রয়েছে এবং মন্ত্রী সভায়ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। তবে তা সংখ্যানুপাতে নয়। লাইবেরিয়ার মুসলমানরা নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে যা তাদের জীবনে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারের ক্যাডারসার্ভিস এবং সেনাবাহিনীতেও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

লাইবেরিয়ার মুসলমানরা ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে এবং নিজেদের মধ্যে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষে বহু ইসলামী সংগঠন, সমিতি, ক্লাব, মসজিদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছে। লাইবেরিয়ায় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষে তারা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। লাইবেরিয়ার কয়েকটি প্রধান প্রধান ইসলামী সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. ন্যাশনাল মুসলিম কাউন্সিল অব লাইবেরিয়া

লাইবেরিয়াকে পর্যায়ক্রমে ইসলামী অনুশাসনের অধীনে আনার লক্ষে এ সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এটি একটি বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন। শহর এবং গ্রামে বসবাসকারী সকল মুসলমানদের মধ্যে এ সংগঠনের কাজ আছে। এ সংগঠনের প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো নিম্নরূপ ঃ

ক. ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে লাইবেরিয়ার সকল মুসলমানদেরকে একই প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করা।

খ. মুসলমানদের মধ্যে আদর্শিক চেতনা সৃষ্টি ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠা করা।

গ. দুস্থ ও দরিদ্র জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

ঘ. মসজিদ, মাদরাসা ও দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা।

ঙ. গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি প্রকল্প পরিচালনা করা।

চ. ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

জনাব Kafubme Konneh এ সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমরা তার সফলতা কামনা করি।

www.pathagar.com

২. অর্গানাইজেশন অব লাইবেরিয়ান মুসলিম ইয়ুথ

এটি লাইবেরিয়ার মুসলিম যুবকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন। জনাব Boakai M. Dukuly এ সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ সংগঠনের প্রধান প্রধান কর্মসূচিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক. ইসলামের মৌলিক নীতিমালাগুলো যুবকদের সামনে তুলে ধরা এবং এর আলোকে তাদের জীবন গঠন করা।

খ. ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য মসজিদ, মাদরাসা ও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।

গ. গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প চালু করা।

ঘ. বিভিন্ন ইসলামী দিবস পালন করা।

ঙ. অন্যান্য মুসলিম দেশের চলমান ইসলামী সংগঠনগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

৩. জমিয়ত আত তাওবা ফাউন্ডেশন

মুসলমানদের জীবনে সামগ্রিকভাবে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য এ সংগঠনের জন্ম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটি একই লক্ষ অর্জনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যারা এ সংগঠনের সদস্য পদ লাভে ইচ্ছুক তাদের প্রত্যেককেই সংগঠনে যোগদানের পূর্বে অতীত ভুলত্রুটির জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট তওবা করতে হয়। এ সংগঠনের প্রধান কাজ হলো সদস্যদের জীবনে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। একজন প্রখাত Shaikh এ সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও আরো অনেক ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ নিরবচ্ছিন্ন কাজের ফলে যদি লাইবেরিয়ায় একটি একক ইসলামী শক্তির অভ্যুদয় ঘটে তাহলে আগামী দিনে লাইবেরিয়া ইসলামী শাসনের অধীনে আসবে এটা আগামী দিনের সূর্যোদয়ের মতোই সত্য।

আমরা লাইবেরিয়ার মুসলমানদের সে সুসংবাদ শোনার প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, নভেম্বর, ১৯৯৪।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

কেনিয়ায় ইসলাম ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভূমিকা

কেনিয়া আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ। মুসলমানরা কবে, কখন কেনিয়ায় এসেছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যে, রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ই হযরত ওসমান (রা)-এর নেতৃত্বে ১৫ জন মুসলমান সর্বপ্রথম ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। কালের ব্যবধানে হয়তো এক পর্যায়ে তাদের উত্তরসূরীদের মাধ্যমেই ইসলামের দাওয়াত আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) থেকে কেনিয়ায় পৌঁছে যায়। আফ্রিকা মহাদেশের পঞ্চান্নটি দেশের মধ্যে কেনিয়া অন্যতম। আফিকা মহাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় সাতাশ কোটি। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ষোল কোটি, খৃস্টান পৌনে তিন কোটি, হিন্দু ও ইয়াহুদী প্রায় এক কোটি এবং বাকীরা অন্যান্য জাতি।

আফ্রিকার দেশসমূহকে মুসলিম জনসংখ্যা এবং কর্তৃত্বের দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১. যেসব দেশে মুসলমানদের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে এবং মুসলমানদের সংখ্যা ৯০%।

২. যেসব দেশে মুসলমানদের সংখ্যা ৬০% -এর উপরে হওয়া সত্ত্বেও শাসনক্ষমতা খৃস্টানদের হাতে।

৩. যেসব দেশে মুসলমানদের সংখ্যা ৬৫% এর বেশি হওয়া সত্ত্বেও শাসনক্ষমতা খৃস্টান অথবা তাদের প্রভাবিত অমুসলিমদের হাতে।

কেনিয়া তৃতীয় পর্যায়ের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ। শাসন ক্ষমতা অমুসলিমদেরর হাতে থাকলেও মুসলমানরা নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিভিত্তিক জীবন ব্যবস্থার উপর অটল থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আফ্রিকা মহাদেশে দিনদিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেনিয়ার মুসলমানরা নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে ভবিষ্যত প্রজন্মকে কাবাকেন্দ্রিক কাফেলার মিছিলে শরীক করানোর জন্য ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কেনিয়ার মুসলমানরা 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব কেনিয়া' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও দাওয়াহ

www.pathagar.com

সংস্থা। কেনিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মসজিদ, মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।

২. স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্যে হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা।

৩. ইয়াতিম শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা।

৪. ইসলামী শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা।

৫. যুবকদের চরিত্র গঠনের জন্য ইসলামী পাঠাগার ও যুবক্লাব প্রতিষ্ঠা করা।

৬. অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও পারস্পরিক সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করা।

এছাড়াও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কেনিয়ার শহরগুলোতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তার একটি চালচিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

আইসিওলো

এ শহরে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

ক. আল ফালাহ চিলড্রেন হোম

এটি একটি ইয়াতিমখানা। বর্তমানে ১৬০ জন ইয়াতিম শিশু এ হোমে লালিত পালিত হচ্ছে। বর্তমানে এ ইয়াতিম খানার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আরো ১৫০ জন ইয়াতিমকে ইতোমধ্যেই এ ইয়াতিমখানায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাদের আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যেই একটি নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

খ. আল ফালাহ ক্লিনিক

এ ক্লিনিকের মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ক্লিনিকের মাধ্যমে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। প্রতি মাসে এ ক্লিনিক থেকে ১০০০ রোগী বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকে। ক্লিনিকের কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করার জন্যে নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলে আরো অধিকসংখ্যক লোক এ চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।

গ. আইসিওলো কেন্দ্রীয় মসজিদ

এটি শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদ। এ মসজিদ নির্মাণে ২ মিলিয়ন কেনীয় সিলিং ব্যয় হয়।

ঘ. আল ফালাহ্ মাদরাসা

আল ফালাহ মাদরাসাটি একটি ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা ৮০০। এ ছাড়াও আইসিওলো অঞ্চলে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তিনটি মসজিদ, ইমামদের বাসভবন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এখানে একটি 'মহিলা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলারা শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছে। এটা একটি মানবিক কর্মসূচি। এ কর্মসূচি আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভব হলে অধিকহারে মহিলারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

ম্যাকামস

ম্যাকামস এলাকায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যে সমস্ত প্রকল্প পরিচালনা করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

ক. টাউনশীপ মুসলিম প্রাইমারী স্কুল

এটি এ অঞ্চলের একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং শিক্ষার মান খুব সন্তোষজনক। বর্তমানে ৬০০ ছাত্র এখানে লেখাপড়া করছে।

www.pathagar.com

খ. ম্যাকাক্স মুসলিম ইন্সটিটিউট

এটি একটি আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এতে ৬৬ জন আবাসিক এবং ২০০ জন অনাবাসিক ছাত্র অধ্যয়ন করছে।

গ. নার্সারী স্কুল

ফাউন্ডেশন ম্যাকাক্স জেলা শহরে একটি নার্সারী স্কুলও পরিচালনা করছে। এ স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১০০ জন। স্কুল ছুটির পর এখানে মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে স্কুলটি শিশু ও মেয়েদের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এ শহরে দুটি মসজিদ আছে। মসজিদে নামায ছাড়াও দীনী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা আছে। মসজিদকে কেন্দ্র করে এ শহরের দাওয়াহ কাজ পরিচালনা করা হয়।

মোমবাসা

মোমবাসা জেলা শহরেও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম চলছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে—

ক. কিসউনী ইসলামিক ইন্সটিটিউট

এটি কেনিয়ান সর্বপ্রথম মাধ্যমিক মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র। একটি মসজিদ এবং ছাত্র শিক্ষকের আবাসিক ভবনসহ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্স। এ কমপ্লেক্স নির্মাণে ২.৫ মিলিয়ন কেনীয় সিলিং ব্যয় হয়।

খ. মুসলিম ইয়ুথ ট্রেনিং প্রোগ্রাম

কুয়েতস্থ আফ্রিকা মুসলিম কমিটির অর্থানুকূল্যে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব কেনিয়ার সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে এখানে ৪৪ জন যুবক ইসলামী শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যয়ভার ইসলামিক ফাউন্ডেশন বহন করছে।

গ. নেয়ারী

২ মিলিয়ন কেনীয় সিলিং ব্যয়ে ইতোমধ্যেই এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই একটি নার্সারী স্কুল, কনফারেন্স সেন্টার ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে জানা গেছে।

www.pathagar.com

নাফুরু

এ শহরে ১.৬ মিলিয়ন অর্থ ব্যয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে স্কুল, মাদরাসা এবং ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে ফাউন্ডেশনের পরিকল্পনা থেকে জানা গেছে।

মেরু

এ শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ২ মিলিয়ন কেনীয় সিলিং। অন্যান্য মানবিক প্রকল্পও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

চৌকা

এ শহরে মসজিদ, মাদরাসা, ক্লিনিক ও স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হবে ৫ লাখ কেনীয় সিলিং। মসজিদ নির্মাণের পর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।

মোগোসিও

ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যান্য এলাকার ন্যায় এখানেও মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল ও ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মসজিদ নির্মাণের জন্য ২ লাখ ৯০ হাজার কেনীয় সিলিং বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে মসজিদ নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

গারবাতুল্লা

অন্যান্য শহর এলাকার ন্যায় এখানেও মসজিদ, মাদরাসা ও স্কুল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই আল ফালাহ মাদরাসা অব গারবাতুল্লা নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে এক তথ্যে জানা গেছে।

মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, ইয়াতিমখানা, কনফারেন্স হল, ডরমিটরী নির্মাণের পাশাপাশি ইসলামিক ফাউন্ডেশন সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করছে। এ সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে—

১. দরিদ্র ও অসহায় পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দেয়া।

www.pathagar.com

২. মুসলিম উদ্বাস্তুদের আর্থিক সহায়তা দেয়া।

৩. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বল্প পরিমাণ পুঁজি যোগান দেয়া।

৪. গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি দেয়া।

৫. বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য মেধাবী ছাত্রদের ওভারসীজ স্কলারশীপ দেয়া।

৬. কেনীয় রেডিও মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ইসলামী পুস্তক বিলি করা।

৮. মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহায়তা দেয়া।

৯. রমযান মাসে মসজিদে অবস্থানকারী মুসল্লীদের সাহরী ও ইফতার সরবরাহ করা ইত্যাদি।

প্রকাশনা

প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন সহিলি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যেই ৮২,৫০০ কপি কুরআন সহিলি ভাষায় অনুবাদ করে বিলি করা হয়েছে। এ ছাড়া ৪৫টি ইসলামী পুস্তক সহিলি ভাষায় প্রকাশ করে বিলি করা হয়। আল-ইসলাম নামে ইংরেজী ভাষায় একটি পাক্ষিক পত্রিকাও প্রকাশনা বিভাগ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। স্কুল ও মাদরাসার পাঠ্য তালিকানুযায়ী ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করাও ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্মসূচি। এ সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন কেনীয় মুসলমানদের স্বকীয় আদর্শের সন্ধানে উজ্জীবিত হতে প্রচণ্ডভাবে সহায়তা করছে।

ফাউন্ডেশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো স্কুল ও মাদরাসার জন্য শিক্ষক রিক্রুট করে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া। ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী পরিচালিত ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে থাকে।

বারাকা ফার্ম

কেনিয়ার আইসিওলো এলাকায় ৮০০ একর জমির উপর বারাকা ফার্মটি প্রতিষ্ঠিত। এটি একটি মডেল ফার্ম। কেনীয় সরকার এ ফার্মটির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করছে। এটি একটি বহুমুখী ফার্ম।

www.pathagar.com

মৎস, কৃষি, পোলট্রি ও ডেয়ারী প্রকল্পের সমন্বয়ে এ ফার্মটি গড়ে উঠেছে। এটি একটি চমৎকার ফার্ম হিসেবে গোটা আইসিওলোবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ ফার্মে কেনীয় সরকারী ও বিদেশী বিশেজ্ঞরা কাজ করছে।

কৃষিপণ্য উৎপন্নের জন্য সেচ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া। সেচ প্রকল্পকে সুষ্ঠু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গোটা প্রকল্প এলাকায় পাইপ লাইন সংযোগ দেয়া হয়েছে। ৬ ইঞ্চি সাইজের পাইপ ২৫০ ফুট গভীরে প্রোথিত করে পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেচ কাজে ব্যবহারের পর অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণের জন্য ১৯৮৫ সালে একটি রিজার্ভার তৈরি করা হয়েছে। এর ধারণক্ষমতা ৩০০০ সিএম। অপরদিকে শুষ্ক মওসুমে কৃষি প্রকল্পের সেচ কাজে ব্যবহার করার জন্য বৃষ্টির পানি ধরে রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই 'Rain water Catchment dam' নামে একটি বাঁধ নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ বাঁধ নির্মাণ শেষ হলে এটি হবে কেনীয়ার জন্য একটি ইউনিক প্রজেক্ট। কেনীয়ার মুসলমানদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বারাকা কৃষি ফার্মটি একটি সফল ফার্ম। ইতোমধ্যেই এ ফার্মটি কেনীয়বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বারাকা ফার্ম তার সফল কৃষি প্রকল্পের জন্য এ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে ৪০টির অধিক জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। ইতোমধ্যেই এ ফার্মটি বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং FAO-এর প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এ প্রকল্পের সফলতার পেছনে রয়েছে কেনীয়ান মুসলমানদের নিষ্ঠা, শ্রম, কর্মস্পৃহা, আন্তরিকতা ও সততা। কেনীয়ার বারাকা ফার্ম এ কথারই স্বাক্ষ দিচ্ছে যে, সৎ, নিষ্ঠাবান ও কর্মঠ লোকদের যে কোনো মহৎ উদ্যোগ সফল হতে বাধ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কেনীয়ার মুসলমানরা একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা কেনীয়ার মুসলমানদের এ ধরনের যে কোনো মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং অন্যান্য দেশের পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠিকে আহ্বান জানাই তারাও যেন কেনীয়ার মুসলমানদের অনুসরণে নিজ নিজ দেশে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষে এ ধরনের ফার্ম প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। কেনিয়ার কৃষি বিপ্লবের ইতিহাসে 'বারাকা ফার্ম' আগামী দিনের প্রজন্মের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে—ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব কেনীয়া চলমান প্রকল্পসমূহের পাশাপাশি ভবিষ্যত পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. নাইরোবীতে এডুকেশনাল কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা।

২. ম্যাকাকোস এ এডুকেশনাল কমপ্লেক্স এবং দুটি পলিটেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

৩. আইসিওলোর "বারাকা ফার্ম"—এ একটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি পলিটেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

৪। মোমবাসায় একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

একটি মানবিক আবেদন

"Save a life Save Faith" এটি একটি মানবিক আবেদন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব কেনিয়া সকল সম্পদশালী ও দানশীল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এ মানবিক আবেদন করেছে। ইয়াতিমদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ দানশীল ব্যক্তিদেরকে ফাউন্ডেশনের ইয়াতিম প্রকল্পে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য আহ্বান জানায়। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে দানের ফযিলত সম্পর্কে ঘোষণা করেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَـهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰـهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰـهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط ـ

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এই ঃ যেমন একটি বীজ বপন করা হলো এবং তা থেকে সাতটি ছড়া বের হলো আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশটি দানা হয়েছে। আল্লাহ যাকে চান তার কাজে এভাবে প্রাচুর্য দান করেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১

কেনীয়ার পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ মানবিক আবেদনে কেনীয়া এবং কেনীয়ার বাইরের সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তিরা সাড়া দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া ফাউন্ডেশনের চলমান অন্যান্য সামাজিক প্রকল্প এবং

www.pathagar.com

ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহায্য সংস্থাগুলোও বৈষয়িক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসবে বলে কেনীয়ার মুসলিম জনগণের ন্যায় আমরাও আশাবাদী। ফাউন্ডেশনের সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের কেনিয়া ইসলামী কেনিয়ায় রূপান্তরিত হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, মে-জুন, ১৯৮৯।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

মংগোলিয়ায় ইসলাম ঃ শত বছরের চালচিত্র

মংগোলিয়ায় ইসলাম আগমনের সঠিককাল নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে ইতিহাস বলে ইসলামের আলো একদা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রতিটি জনপদের মানুষ। প্রতিটি জাতিরই রয়েছে গৌরবোজ্জল সোনালী অতীত। ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠক যে কোনো জাতির সোনালী অতীত থেকে তুলে আনতে পারে সে জাতির গৌরবোজ্জল অনেক ঘটনা প্রবাহকে। আর এভাবেই আজকের ও আগামী দিনের প্রজন্ম জানতে পারবে তার কাঙ্ক্ষিত জাতির সঠিক ইতিহাস। তাই বলা হয় ইতিহাস কখনো পুরনো হয় না বরং কালের ব্যবধানে তা হয়ে ওঠে আরো জীবন্ত।

আজকে যে সমস্ত ভূখণ্ডকে আমরা অমুসলিম অধ্যুষিত বলে জানি তা হয়তো এক সময় মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল বলে পরিচিত ছিল। তাইতো আজকের অনেক অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী সভ্যতা ও স্থাপত্য শিল্পের বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত নিদর্শনাদি বলে দেয় যে, এ জনপদগুলো এক সময় মুসলমানদের পদভারে মুখরিত ছিল। মংগোলিয়ার অতীত ইতিহাস উদঘাটন করতে গিয়ে দেখা যায় যে, শত বছর পূর্বে ইসলাম মংগোলিয়ায় আগমন করে।

রুশ ফেডারেশন এবং চীনের মধ্যবর্তী স্থানে মংগোলিয়া অবস্থিত। এর আয়তন ১.৫ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২.১ মিলিয়ন। রাজধানী উলান বাটর। দেশের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলমানদের অবস্থান দ্বিতীয়।

মংগোলিয়ার মুসলমানরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে বেশ ক'টি ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। এ সমস্ত সংগঠনের মধ্যে 'Mongolian Islamic Society' অন্যতম। সোসাইটির চেয়ারম্যান জনাব সাইরান কাদের ১৯৯৪ সালে হজ্ব মওসুমে সউদী আরবের মিনাস্থ রাবেতা রেস্ট হাউজে 'দ্যা মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল'-এর সাথে এক সাক্ষাতকার দেন। এ সাক্ষাতকারের মধ্য দিয়ে মংগোলিয়ায় ইসলামের আগমন এবং ইসলামের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সাইরান কাদের মংগোলিয়ায় অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় তিনি অত্যন্ত সোচ্চারকণ্ঠ। মংগোলিয়ান মুসলমানরা সাধারণত তারবিক উপজাতির লোক। তারবিক উপজাতি তাতার মুসলমানদেরই একটি অংশ। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, আজকের তাতাররা দুর্ধর্ষ সেনাপতি ও দ্বিগ্বিজয়ী চেংগিস খাঁর উত্তরসূরি। তের শতকের শুরুতে চেংগিস খাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে ঝড়ের বেগে আক্রমণ করে এবং এ সমস্ত দেশগুলো দখল করে নেয়। তাতার সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র বাগদাদ এবং সিরিয়া ছিল তখন ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। তাতাররা অব্যাহতভাবে যুদ্ধজয়ের ফলে মধ্য এশিয়ার মুসলিম সংস্কৃতির সাথেও পরিচিত হয়ে ওঠে এবং এভাবে তাতাররা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

মংগোলিয়ার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রায় একশত বছর পূর্বে মংগোলিয়ান মুসলমানরা পূর্ব তুর্কীস্তান থেকে মংগোলিয়ায় হিজরত করে এবং মংগোলিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। সাইরান কাদের বলেন, "আমাদের সংস্কৃতি তুর্কী সংস্কৃতি। হিজরতের সময় তুর্কী সংস্কৃতিকে আমরা সাথে করে নিয়ে আসি।" মংগোলিয় মুসলমানরা কাজাক এবং মংগোলীয় ভাষায় কথা বলে। সাইরান কাদের বলেন ঃ

"We speak both Kazakh as well as Mongolian language."

অর্থ ঃ "আমরা কাজাক এবং মঙ্গোলীয় উভয় ভাষায়ই কথা বলি।"

মংগোলিয়ার ২.১ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার। জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলমানদের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। মুসলমানরা প্রধানত কৃষি কাজ এবং পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক হিসেবেও তারা কর্মরত। কমিউনিস্ট শাসনামলে আইন করে মুসলমানদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বাধা দেয়া হয়। ফলে একান্ত বাধ্য হয়েই মংগোলীয় মুসলমানরা জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজ ও পশু পালনকে বেছে নেয়। ১৯৯০ সালে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে মংগোলীয় মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করে যা আজ মুসলমানদেরকে একটি সম্মানজনক অবস্থায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্যোগী মুসলমানদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোট ছোট শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার বর্তমানে ঋণ দান করছে। সাইরান কাদেরের মতে, সৌদী আরবসহ মধ্য প্রাচ্যের

www.pathagar.com

মুসলিম দেশগুলো মংগোলিয়ায় অর্থ বিনিয়োগ করলে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। মংগোলিয়া বর্তমানে আমেরিকা ও রাশিয়ার বাজারে পরিণত হয়েছে। তাদের উৎপন্ন সামগ্রী একচেটিয়াভাবে তারা মংগোলিয়ায় রফতানী করে থাকে।

মংগোলিয়ান ইসলামিক সোসাইটির কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব সাইরান কাদের বলেন, আমরা সোসাইটির মাধ্যমে প্রধানতঃ চারটি কাজ করে থাকি। যথা–

১. ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে দাওয়াহ্ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
২. শিক্ষা বিস্তারের জন্য মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা।
৩. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
৪. ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ও বিলি করা।

দাওয়াহ্ কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনাব সাইরান কাদের বলেন ঃ

"Our focus at present is on the Muslim Community itself. At this stage we do not want to enter into any controversy with our non-Muslim countrymen. We stress on Muslim brother to hold fast to the teaching of prophet Mohammad (Peace be on him) which would automatically attract non-Muslims to Islam."

অর্থ ঃ "বর্তমানে আমাদের সকল কার্যক্রম মুসলিম সমাজ কেন্দ্রিক। কারণ এখন আমরা দেশের অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীদের সাথে বিতর্কে জড়াতে চাই না। মুসলমানদেরকেই রাসূলে করীম (স)-এর শিক্ষা দৃঢ় ভাবে অনুসরণের জন্য আমরা দাওয়াত দিচ্ছি যা স্বাভাবিকভাবেই অমুসলিমদেরকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করবে।"

মংগোলিয়ায় বর্তমানে বড় বড় পাঁচটি মসজিদ এবং ১৯টি নামায ঘর রয়েছে যা বিগত তিন বছরে নির্মাণ করা হয়। ইসলামিক সোসাইটির উদ্যোগে খুব শীঘ্রই একটি তুর্কী মংগোলিয়ান কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। যেখানে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পাশাপাশি মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। কলেজে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আরবী ও তুর্কী ভাষা ব্যবহার করা হবে।

www.pathagar.com

মংগোলিয়ার মুসলমানরা সরকার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান পার্লামেন্টের ৭৬ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা ৩ জন। মন্ত্রীসভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। পরিবহন এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন মুসলমান। জনাব সাইরান কাদের মংগোলিয়া পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টে দায়িত্ব পালনের চেয়ে ইসলাম প্রচার এবং প্রসারে ভূমিকা পালনকেই তিনি তাঁর জীবনের প্রধান মিশন হিসেবে মনে করেন। তাই মংগোলিয়ান ইসলামিক সোসাইটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর তিনি পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে এ মর্দে মুজাহিদ দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেন যে ঃ

"Parliamentary affairs consume lot of time and as I have been elected as Chairman of the Mongolian Islamic Society, I deem it my wish to devote myself fully to community welfare and religious work."

অর্থ ঃ "সংসদ বিষয়ক কার্যক্রমে প্রচুর সময় ব্যয় হয় এবং যেহেতু আমি মঙ্গোলিয়ান ইসলামিক সোসাইটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি সেহেতু আমি এ সংগঠনের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ ও ধর্মীয় কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে চাই।"

বর্তমান সরকারের শাসনামলে মুসলমানরা বিশেষ কোনো নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে না। বিগত কমিউনিস্ট শাসনামলে মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হতো। বর্তমানে মংগোলিয়ান মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছে।

মংগোলিয়ান ইসলামিক সোসাইটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য জনাব সাইরান কাদের মক্কা ভিত্তিক রাবেতা আলমে ইসলামী, আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

জনাব সাইরান কাদের মংগোলিয়ার মুসলমানদের খেদমতের জন্য ইসলামিক সোসাইটির মাধ্যমে যে কার্যক্রম শুরু করেছেন তাতে সহযোগিতা করা সকল মুসলমানদেরই ঈমানী দায়িত্ব। যে মানুষটি নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ত্যাগ করে দীনের প্রচার ও প্রসারে

www.pathagar.com

আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁকে আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তাঁর এ তৎপরতার ফলে আগামী দিনের মংগোলিয়া ইসলামী মংগোলিয়ায় পরিণত হবে মংগোলিয়াবাসীদের সাথে আমাদেরও একই প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, জুন, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

মেসিডোনিয়ায় ইসলাম ঃ
মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেখানেও ষড়যন্ত্রের জাল

মার্শাল টিটোর কমিউনিস্ট শাসিত সাবেক যুগোস্লাভিয়ার ছ'টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে মেসিডোনিয়া অন্যতম। এর আয়তন ২৫ হাজার ৭১৩ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৪.৫ মিলিয়ন। রাজধানী স্কোপিয়া। জনসংখ্যার শতকরা ৬৪.৪% মেসিডোনীয়, ২১% আলবেনীয়, ৪.৮% তুর্কী এবং ৯.৮% অন্যান্য। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ৬০% মুসলমান এবং ৪০% খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। মেসিডোনিয়া বর্তমানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। অবস্থানগত দিক থেকে এর পূর্ব দিকে বুলগেরিয়া, দক্ষিণ দিকে গ্রীস, পশ্চিম দিকে আলবেনিয়া এবং উত্তর দিকে সার্বিয়া ও কসোভো রাষ্ট্র অবস্থিত।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্লোভেনীয় সম্প্রদায় সর্বপ্রথম এখানে এসে বসবাস শুরু করে এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে মেসিডোনিয়া তুরস্কের ওসমানীয় খেলাফতের অধীনে আসে। তুর্কী শাসনামলে এলাকাটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, আলবেনীয়রা সর্বপ্রথম মেসিডোনিয়ায় আগমন করে এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীকালে কারাভ্যাট পর্বতমালা থেকে গ্রীক, রোমান ও সার্বরা এসে বসবাস শুরু করে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকেরা একই অঞ্চলে বসবাস করার কারণে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধ শেষ পর্যন্ত রক্তপাত ও জঘন্য নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হয়। এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণে বিভিন্ন প্রকার ছল ছুতায় একে অপরের উৎপাদিত কৃষিপণ্য লুট করে নিয়ে যায়। ফলে এ জাতিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। তাদের অধিকাংশই ছিল মন্দির উপাসক এবং কিছুসংখ্যক বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করতো। পরবর্তীকালে এ মন্দির উপাসক ও পৌত্তলিকরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু নতুন ধর্মমত গ্রহণ করলেও তাদের পূর্বেকার দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান হয়নি।

এমনি একটি প্রেক্ষাপটে ইসলাম আসে শান্তির বাণী নিয়ে। মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদেরকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়নি। বরং দীর্ঘদিনের নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া এবং ইসলামের শাশ্বত সাম্যের বাণী শুনে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে মুসলিম উম্মার অংশ হিসেবে ঘোষণা করে। এভাবেই মেসিডোনিয়ার আকাশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। ফলে মেসিডোনিয়া দ্রুত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কী সেনাবাহিনী মেসিডোনিয়ায় আগমন করলে আলবেনীয় বংশদ্ভূত মেসিডোনিয়ানরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে তুর্কী আর্মী ও মেসিডোনিয়ার জনগণের মুখোমুখি সংঘর্ষের অবসান ঘটে এবং একটি প্রচণ্ড যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে উভয়েই রক্ষা পায়।

১৩৮১ সালে মুরিতাজ যুদ্ধে বুলগেরীয় সেনাবাহিনী তুর্কী সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত হয়। তুর্কী সেনাবাহিনীর এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে ইসলাম একটি অপ্রতিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে দ্রুত আত্মপ্রকাশ করে এবং এর ফলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। অবশ্য কিছু কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন, তুর্কী সেনাবাহিনী কর্তৃক এ অঞ্চল বিজয়ের পূর্বেই আরবীয় বণিক এবং পর্যটকদের মাধ্যমে এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম ইসলাম আগমন করে। তবে এ কথা সত্য যে, তুর্কী সেনাবাহিনীর সফল অভিযানের মধ্য দিয়েই এ অঞ্চলে ইসলামের আগমনের সংবাদ সর্বপ্রথম বিশ্ববাসী জানতে পারে। তাই বলা যায় মেসিডোনিয়ায় ইসলাম আগমনের ব্যাপারে তুর্কী সেনাবাহিনীর অবদানই বেশি। অপরদিকে ঐতিহাসিকদের অন্য একটি দল মনে করে তুর্কী আর্মীর আগমনের প্রায় দু'শত বছর পূর্বে আরবীয় গবেষকদের একটি দল ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে সর্বপ্রথম মেসিডোনিয়ায় আগমন করে। ইসলাম আগমন সংক্রান্ত ঐতিহাসিকদের এ ভিন্ন ভিন্ন মতামত একথা নিসন্দেহে প্রমাণ করে যে, মেসিডোনিয়ায় ইসলাম আগমন এবং তার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে আরবীয় বণিক, গবেষক এবং তুর্কী সেনাবাহিনীর অবদান রয়েছে। কারো অবদানকেই এ ক্ষেত্রে ছোট করে দেখার কোনো উপায় নেই।

মেসিডোনীয় মুসলমানদের মধ্যে আলবেনীয় মুসলমানদের সংখ্যা ৮৫%। মুসলমানদের অধিকাংশই মেসিডোনিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করে। তবে দেশের পূর্বাঞ্চলেও কিছু সংখ্যক মুসলমান বসবাস করে। সামগ্রিকভাবে মেসিডোনিয়া একটি মুসলিম প্রজাতন্ত্র। পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ মুসলমানই তাদের ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে খুব কম জ্ঞানই রাখে। তারা শুধু নামেই মুসলমান তাই নয় ব্যক্তিগত জীবনেও

www.pathagar.com

তারা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা থেকে অনেক দূরেই অবস্থান করছে। এর প্রধান কারণ হল সাবেক কমিনিউস্ট শাসনামলে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয় যাতে তারা তুরস্কে বা অন্য কোথাও হিজরত করতে বাধ্য হয়। এ নির্যাতনের সময় খৃস্টীয় চার্চগুলোও কমিউনিস্ট সরকারকে সহায়তা করে। ফলে মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ধর্মকর্ম পালন করা থেকে বিরত থাকে। কালক্রমে তারা তাদের ধর্মীয় অনুশাসন বা শরয়ী শিক্ষা থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়ে। তবে একথা সত্য যে, শত নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও মেসিডোনিয়ার মুসলমানরা অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের ইসলামী নাম ধরে রেখে নিজেদের জাতিগত পরিচিতিকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

১৯১২-১৩ সালে বলকান যুদ্ধে তুর্কী সেনাবাহিনীর পরাজয়ের মধ্যদিয়ে মেসিডোনিয়ায় তুর্কী শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু আজো মেসিডোনিয়ায় তুর্কী শাসনামলের বহু নিদর্শন কালের সাক্ষী হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হলো মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, লাইব্রেরী, গণশৌচাগার ইত্যাদি। ধর্মীয় সভা করার জন্য মুসলমানরা মেসিডোনিয়ায় বিরাট বিরাট মাঠ তৈরি করেছিল যা এখনো বর্তমান রয়েছে।

কমিউনিস্ট শাসনাবসানের পর মেসিডোনিয়ার মুসলমানরা পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল ও লাইব্রেরীগুলো সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সংস্কার কাজে তারা নিজেদের সম্পদ ও মাসিক আয়ের একটি বিরাট অংশ স্বেচ্ছায় ব্যয় করছে। আল্লাহ্ তাদের এ মহতী উদ্যোগ কবুল করুন এবং এ কাজকে তাদের পরকালীন নাজাতের উছিলা করুন এটাই আমাদের প্রার্থনা। ইতোমধ্যেই মেসিডোনিয়ার মুসলমানরা স্কাভিয়ার শরীয়াহ্ বিদ্যালয়টি পুনঃনির্মাণ করে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য ইসলামী শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেছে। দীনী প্রতিষ্ঠান সংস্কারের এ উদ্যোগ এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা ও দানশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে যাওয়া সময়ের দাবীতে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মেসিডোনিয়ার মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যদের নিকট আকুল আবেদন জানিয়েছেন। তাদের এ মহতী আবেদনে সাড়া দেয়া প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমানেরই নৈতিক দায়িত্ব।

www.pathagar.com

মেসিডোনিয়ার বর্তমান সরকার মুসলমানদেরকে তিনের অধিক সন্তান ধারণে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিচ্ছে। যদি কোনো দম্পতি তিনের অধিক সন্তান জন্ম দেয় তবে অতিরিক্ত সন্তানের নাম সরকারী রেজিস্ট্রারে তালিকাভুক্ত করার ব্যাপারে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। এতে বহু মুসলিম শিশু আগামীতে মেসিডোনিয়ার নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হতে পারে বলে মেসিডোনিয়ার মুসলমানরা আশংকা করছে। তাই তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

কমিউনিস্ট শাসনামলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করার জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছে। সরকার শরীআহ বিদ্যালয়গুলোর সংস্কার কাজে প্রয়োজনীয় সযোগিতা না করলে মুসলমানরাই এগুলোর সংস্কার কাজ করবে বলে জানা গেছে। মহিলাদেরকে শরীআতসম্মতভাবে চিকিৎসাসেবা দেয়ার জন্য মেসিডোনিয়ার মুসলমানরা একটি মহিলা হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ হাসপাতালে চিকিৎসকসহ অন্যান্য সকল পদে মহিলা স্টাফ নিয়োগ করা হবে বলে জানা গেছে। এ ধরনের একটি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে তাদের দীর্ঘদিনের একটি মহতী স্বপ্ন বাস্তবতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা মেসিডোনিয়ার মুসলমানদের জাতিগত স্বাতন্ত্রবোধকে স্বাগত জানাই এবং তাদের সকল মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে আল্লাহর সাহায্য কামনা করি।

যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের পর ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেসিডোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইতোমধ্যে রাশিয়াসহ কয়েকটি দেশ মেসিডোনিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো মেসিডোনিয়াকে স্বীকৃতি দেয়নি। মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে একমাত্র তুরস্কই মেসিডোনিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অপরদিকে ইউরোপীয় কমিউনিটিও দেশটিকে স্বীকৃতি দেয়নি। দেশটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যাপারে গ্রীস প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে। গ্রীসের বাধার পেছনে চারটি মৌলিক কারণ বিদ্যমান বলে জানা গেছে। সেগুলো হলো ঃ

১. মেসিডোনিয়া এক সময় গ্রীসের অংশ ছিল। সুতরাং এ নামে কোনো দেশকে তারা স্বীকার করতে পারে না।

২. মেসিডোনিয়ার সীমানা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

৩. মেসিডোনিয়ার বাইরে বসবাসকারী মেসিডোনিয়ানদের সাংবিধানিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ঘোষণা প্রত্যাহার করতে হবে।

www.pathagar.com

৪. মেসিডোনিয়ার জাতীয় পতাকা পরিবর্তন করতে হবে।

মেসিডোনিয়ার বর্তমান সরকার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য গ্রীসের এ অযৌক্তির দাবীর ব্যাপারে কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে। ইতোমধ্যেই সরকার দেশটির নাম পরিবর্তন করেছে। দেশটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'স্কোপিয়া মেসিডোনিয়া' মেসিডোনিয়া তার বর্তমান সীমানাকেই চূড়ান্ত সীমানা হিসেবে ঘোষণা করেছে। অপর দুটি দাবী মানতে হলে সংবিধানের দু তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে। কিন্তু বর্তমান সরকার পার্লামেন্টে শেষ দুটি দাবী পাশ করাতে পারবে না বলে আশংকা করছে। তাই এ দুটি দাবী বর্তমান সরকার কর্তৃক মানা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে গ্রীস তার দাবীর ব্যাপারে অনড়।

মেসিডোনিয়া একটি ছোট দুর্বল রাষ্ট্র। তার সামরিক শক্তি বলতে ছয় হাজার সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী। আধুনিক কোনো অস্ত্রশস্ত্রও দেশটিতে নেই। তাই গ্রীসের সেনাবাহিনীর ভয়ে দেশের সরকার ও জনগণ সবসময় আতংকগ্রস্ত থাকে, কখন গ্রীস দেশটিকে আক্রমণ করে বসে। গ্রীস দেশটিকে আক্রমণ করলে এক ঘণ্টার মধ্যেই পুরো দেশটিকে দখল করে নিতে পারবে। তবে মেসিডোনিয়ার একমাত্র ভরসা আন্তর্জাতিক আইন ও বাধ্যবাধকতা যা গ্রীসকে আগ্রাসী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশে বাধা দিচ্ছে। গ্রীসের আক্রমণ থেকে মেসিডোনিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জাতিসংঘ দেশটিতে ১০১৫ জন শান্তিরক্ষী মোতায়েন করেছে। কিন্তু দেশটির স্বাধীন অস্তিত্ব এখনো হুমকীর সম্মুখীন।

দেশটির স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ইউরোপীয় কমিউনিটি, ও. আই. সি ও আমেরিকার করণীয় রয়েছে বলে শান্তিকামী মানুষ মনে করছে। জাতিসংঘকে এ ব্যাপারে আরো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমরা স্বাধীন মেসিডোনিয়ার অস্বিত্বকে স্বাগত জানাই এবং দেশটি আগামী দিনে ইসলামী মেসিডোনিয়ায় রূপান্তরিত হোক এ প্রত্যাশাই করছি।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২।

২. দৈনিক আল মুজাদ্দেদ, ১১ আশ্বিন ১৪০২ বাংলা।

www.pathagar.com

তানজানিয়ায় ইসলাম : অতীত ও বর্তমান

তানজানিয়া আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ। এর সরকারী নাম সংযুক্ত তানজানিয়া প্রজাতন্ত্র। রাজধানী দার-আস-সালাম। দেশটির আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট। আইন সভার সদস্য সংখ্যা ২৫৫। ১৯৯৩ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশের লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬৫ লাখ ৪২ হাজার। জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান ৩৩%, খৃস্টান ৩৪% ও অন্যান্য ৩৩%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩০ জন। দেশটির সরকারী ভাষা সোয়াহিলী ও ইংরেজী। দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ১১০ মার্কিন ডলার এবং শিক্ষার হার ৪৬.৩%।

১৯৬১ সালের ৯ ডিসেম্বর দেশটি বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তখন দেশটির নাম ছিল Tanganyika। দু'বছর পর Zanzibarও স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর দেশটিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাগ্রহণের এক মাসের মধ্যে ১২ জানুয়ারী ১৯৬৪ সালে সুলতান ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৬৪ সালে ২৬ এপ্রিল United Republic of Tanganyika and Zanzibar একত্রিত হয়ে একক রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং এ বছরের ২৯ অক্টোবর দেশটির নাম পুনঃ নামকরণ করে United Republic of Tanzania রাখা হয়। তানজানিয়ার আয়তন ৯,৪৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। অবস্থানগত দিক থেকে তানজানিয়ার পূর্বে ভারত মহাসাগর, উত্তরে কেনিয়া ও উগান্ডা, পশ্চিমে রুয়ান্ডা, বুরুন্ডী, জায়ারে এবং দক্ষিণে মালয়, মোজাম্বিক ও জাম্বিয়া অবস্থিত।

তানজানিয়ায় কখন ইসলামের আগমন ঘটে তার সঠিক কোনো সন তারিখ জানা যায়নি। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায়, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর বিধৌত আরব দেশগুলোর ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ৮ম শতাব্দীতে ইসলাম সর্বপ্রথম তানজানিয়ায় আগমন করে। আরব বণিকদের মধ্যে যারা তানজানিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তাদের আদি নিবাস ছিল ওমান, মাসকট, সিরাজ, ম্যানগা (Manga) প্রভৃতি অঞ্চলে। তানজানিয়ায় আগমনের পর তারা প্রথমতঃ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল জানজিবার, পামবা উপদ্বীপ, ভাম্বা, সনগোলারাসহ অন্যান্য এলাকায় বসবাস শুরু করে এবং স্থানীয় লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানায়। এ অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী আফ্রিকান জাতিসমূহের

www.pathagar.com

মধ্যে ব্যানটু জাতির লোকেরা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করে। ব্যানটু জাতীয় আফ্রিকান লোক ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের স্থানীয় ভাষা ও আরবী ভাষার সমন্বয়ে এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়। এ নতুন ভাষা সোয়াহিলী (Swahili) ভাষা নামে বর্তমানে ব্যাপকভাবে পরিচিত। এ ভাষাটি বর্তমানে তানজানিয়ার জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। ইসলাম গ্রহণের ফলে ব্যানটুদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। তারা আরবীয় লোকদের অনুকরণে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করে তা পরিধান করা শুরু করে। এ সমস্ত পোশাকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কানজু (Kanzu), কিলেম্বা (Kilemba), টারবান (Turban), কোফিয়া (Kofia) এবং এমব্রয়ডারী করা টুপি। আরবীয় ইমিগ্রান্ট বা অভিবাসীরা তানজানিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেও তারা তাদের আদি দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। তানজানিয়ার কোস্টাল এরিয়ায় বসবাসকারী নওমুসলিমরা প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য 'Islamic African Community' নামে একটি সংস্থা গঠন করেছে।

তানজানিয়ার কোস্টাল এরিয়ার স্থানীয় লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করায় এখানে মুসলমানরা একটি নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা মাটি আর খুঁটি দ্বারা বাসগৃহ নির্মাণ করে এক জায়গায় বসবাস শুরু করে এবং ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে নবনির্মিত এ আবাসিক এলাকাগুলোকে কেন্দ্র করে বণিক ও পর্যটকদের যাতায়াতের একাধিক রাস্তা গড়ে ওঠে। এ নতুন উপনিবেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো Tabora Settlement। এটি অন্যান্য ঔপনিবেশগুলোর চেয়ে অবস্থানগত দিক থেকে তুলনামূলকভাবে ভালো জায়গায় গড়ে ওঠেছে এবং বণিক ও পর্যটকদের যাতায়াতের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে Tabora Settlement-কে কেন্দ্র করে আরো তিনটি Route গড়ে ওঠে। এগুলো হলো ঃ

ক. The route to Mwanza

খ. The route to Karagwe

গ. The route to Ujiji and zaire

মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে এ সমস্ত এলাকায় ব্যাপকভাবে বৈদেশিক দ্রব্যসামগ্রী আমদানী করা হয়, যা স্থানীয় পণ্যের সাথে বিনিময় করা হয়। আরব বণিক ও স্থানীয় মুসলিম বণিকদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির সাথে

www.pathagar.com

সাথে তারা দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত শুরু করে এবং সুবিধাজনক জায়গায় বসতিস্থাপন করে। কালক্রমে তারা স্থানীয় লোকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এভাবে স্থানীয় লোকেরা মুসলমানদের সাহচর্যে আসার সুযোগ পায়। তারা মুসলমানদের আচার-আচরণ, ব্যবহার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন দেখে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় এবং একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইসলামে দীক্ষিত এ নওমুসলিমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত মার্জিত, রুচিশীল ও শালীন ব্যক্তিত্ব ভাবতে শুরু করে। এ সমস্ত ব্যক্তিদের দেখে দেখে তানজানিয়ার বিধর্মীরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই বলা হয়, ইসলামের নিজস্ব সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে যত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তার চেয়ে বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে মুসলমানদের চারিত্রিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে। কারণ ইসলামের নিজস্ব কোনো অবয়ব বা আকার নেই। মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্টের মধ্য দিয়েই বিধর্মীরা ইসলামের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে। তাই প্রতিটি মুসলমানকেই একজন স্থায়ী দায়ীর ভূমিকা পালন করার জন্য নিজের চরিত্র মাধুর্যকে ইসলামের মহান শিক্ষার আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। সরকারের সতর্ক নিয়ন্ত্রণের কারণে আরব বণিকরা অবাধে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত করতে পারত না। তাই তারা নওমুসলিমদেরকে দাওয়াতে দীনের কাজে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করতো। এ সমস্ত দাওয়াহ কাজের ফলে তারা স্থানীয় লোকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। দাওয়াহ কাজের দ্বিতীয় মাধ্যমটি ছিল স্থানীয় প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। এ পরিকল্পিত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রভাবশালী ও নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আজো ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে সমানভাবে প্রযোজ্য। তানজানিয়ায় ইসলাম প্রসারের তৃতীয় মাধ্যমটি ছিল সোয়াহিলী ভাষা। এ ভাষাটি মুসলিম ভাষা হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। সোয়াহিলী ভাষা আরবী ও ব্যানটু ভাষার একটি সংমিশ্রণ। এটি একটি সমৃদ্ধ ভাষা। সোয়াহিলী ভাষার পাশাপাশি আরব বণিকদের পোশাক পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রার মান ও ধরন, তাদের ধর্ম ও সভ্যতা স্থানীয় লোকদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। ইসলামের স্বকীয় সৌন্দর্য এবং মুসলমানদের আচার আচরণ

www.pathagar.com

স্থানীয় লোকদের অন্তর্দৃষ্টিকে খুলে দেয় এবং তারা অন্ধকার গলিপথ থেকে অলোকিত রাজপথে আসার সুযোগ পায়।

১৮৮৪ সাল থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত দেশটি জার্মান শাসনের অধীনে ছিল। তারা স্থানীয় হেডম্যান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতো। জার্মানদের শাসনামলে সোয়াহিলী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এ সময় প্রকাশনার কাজে সোয়াহিলী ভাষার পাশাপাশি আরবী ভাষাও ব্যবহার করা হতো। সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো সোয়াহিলী ভাষার মুসলমান। গোষ্ঠী প্রধান বা দলপতিরা ইসলাম গ্রহণ করাকে বর্বর বা সংস্কৃতিহীন (Uncivilized) বলে মনে করতো। কারণ তারা সনাতন ধারায়ই অভ্যস্থ ছিল। গোষ্ঠী প্রধানরা আরো মনে করতো যে, জার্মান সরকার তানজানিয়ায় ইসলামীকরণে সহানুভূতিশীল। কারণ জার্মান সরকার প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে আরবী ভাষার ব্যবহারকে অনুমোদন করে। আরবী ভাষার ব্যাপক চর্চার ফলে তানজানিয়ায় ইসলামীকরণের কাজ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ঔপনিবেশবাদীরা তানজানিয়ায় ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার চেষ্টা করে। অপরদিকে মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার কারণে সরকার তাঁদের প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল। কারণ সরকারী কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষিত লোকের কোনো বিকল্প নেই। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি জার্মানদের এ সহানুভূতিশীল মানসিকতার কারণেই তানজানিয়ায় ইসলামীকরণের কাজ সহজ হয়। জার্মান শাসনের অবসানে দেশটি বৃটেনের ঔপনিবেশে পরিণত হয় এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। তানজানিয়ায় ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষে All Muslim National Union of Tanganyika (AMNUT) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে পাকিস্তান ভিত্তিক মোতামার আল আলম আল ইসলামী বৈষয়িক সহায়তা দান করার পাশাপাশি মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করারও উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা লগ্নে (১৯৩৯–১৯৪৫) মুসলমানরা সুন্নী-সুফী-ইসনা আশারিয়া, ইসমাইলিয়া, মোস্তালী প্রভৃতি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা এ সময় একক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার পটভূমিতে ইসমাইলিয়া গ্রুপ East African Welfare Society নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে এবং মুসলমানদেরকে একক রাজনৈতিক প্লাটফর্মে সমবেত হবার

www.pathagar.com

আহ্বান জানায়। তারা মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণেরও আশ্বাস দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তানজানিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। মুসলমানরা এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদী গ্রুপগুলো প্রাধান্য বিস্তার করে। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য এ সময় দুটি সংগঠন গড়ে ওঠে। সংগঠন দুটি হলো—

১. Tanganyika Civil Servants Association (TCSA)
২. Tanganyika African Union (TANU)

এ সংগঠন দুটি ধর্মীয় বিভেদ ভুলে গিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ঐক্যের ডাক দেয়। তানজানিয়ার ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি নিয়ে ১৯৮৪ সালে Tanzanian Muslim Youth League প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনটি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলে সউদী আরব, মিসর, লিবিয়া, আরব আমিরাতসহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলো আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সংস্থাটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষে বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্যও সীমিত পরিসরে ঋণদান প্রকল্প চালু করে। এটি একটি কার্যকর উদ্যোগ বলে ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। Muslim Youth League কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষকই সউদী আরব, মিসর, লিবিয়া, আরব আমীরাত প্রভৃতি দেশ থেকে আগত। তারা অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সমস্ত শিক্ষা কার্যক্রমের ফলে আগামী দিনের তানজানিয়াকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য এ যুগের খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারিক আর মূসার জন্ম হবে বলে তানজানিয়ার মুসলমানদের বিশ্বাস।

আমরা আগামী দিনের ইসলামী তানজানিয়ার সে সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), সেপ্টেম্বর, ১৯৯২
২. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), অক্টোবর, ১৯৯২
৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা), অক্টোবর- ডিসেম্বর, ১৯৯৩।
৪. মাসিক পৃথিবী (ঢাকা), মার্চ, ১৯৯৬।

www.pathagar.com

বেলিজে ইসলাম ঃ উৎসের সন্ধানে

বেলিজ মধ্য আমেরিকার একটি ছোট দেশ। অবস্থানগত দিক থেকে এর উত্তরে মেক্সিকো, পূর্বে ক্যারিবিয়ান সাগর এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমান্ত গুয়েতেমালা দ্বারা বেষ্টিত। বেলিজের আয়তন ২২,৯৬৫ বর্গ কিলোমিটার। বেলিজ (Belize) এর লোক সংখ্যা ২ লাখ ৩০ হাজার। বেলিজ শহরটি দেশের সবচেয়ে জনবহুল শহর। এর লোক সংখ্যা ৬৫ হাজার। বেলিজের লোক সংখ্যার মধ্যে নিগ্রো (আফ্রিকান বংশদ্ভূত) ৪৫%, মেস্টিজু (Mestizo) ৪০%, মায়া ইন্ডিয়ান, পূর্ব ইন্ডিয়ান, ইউরোপীয় ও আরবীয় ১৫%। বেলিজের রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজী। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। তবে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্প্যানিশ ভাষাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা দেয়া হয়। বেলিজের মুদ্রার নাম বেলিজ ডলার।

দেশে শিক্ষার হার ৯৩%। ৬-১৪ বছরের সকল শিশু কিশোরের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক। সরকার দেশের সকল নাগরিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। সকল জেলা শহরগুলোতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেলিজ ইয়েলো ফিভার ও ম্যালেরিয়া রোগ মুক্ত একটি দেশ।

মায়া ইন্ডিয়ানরা বেলিজের আদি অধিবাসী। খৃস্টপূর্ব ১০০০ সালে তারা বেলিজে মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে যা কালের স্বাক্ষী হিসেবে আজো দাঁড়িয়ে আছে। পরবর্তীকালে বৃটিশ নাবিকরা এসে বেলিজে বসবাস শুরু কর। তারা কাঠের ব্যবসা করতো। তারা মেহগনী কাঠ কেটে স্পেনে বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতো। বেলিজকে কেন্দ্র করে বৃটেন ও স্পেনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ বিরোধের ফলে বেলিজ বৃটিশ ঔপনিবেশে পরিণত হয়। বেলিজ বৃটেনের ঔপনিবেশে পরিণত হবার পর এর নামকরণ করা হয় বৃটিশ হন্ডুরাস (British Honduras)। ১৯৬৪ সালে বৃটিশ সরকার বৃটিশ হন্ডুরাসকে স্ব শাসিত দেশের মর্যাদা দান করে। ১৯৭২ সালে হন্ডুরাসের নাম পরিবর্তন করে (Belize) বেলিজ রাখা হয়।

১৯৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বেলিজ মধ্য আমেরিকার একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বেলিজ বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত একটি

www.pathagar.com

দেশ। ফলে বৃটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বেলিজের নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁর নামেই দেশের শাসন কার্য পরিচালিত হয়। বেলিজে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা রয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৮ জন এবং সিনেটের সদস্য সংখ্যা ৮ জন। প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু সিনেটের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা দেশ শাসন করে। বেলিজে পশ্চিমা ধরনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত।

বেলিজে মুসলমানদের আগমন সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য জানা যায়নি। ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছ থেকে জানা যায় যে, বৃটিশ স্যাটেলার্সরা আফ্রিকা থেকে যে সমস্ত কৃতদাস নিয়ে আসে তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিল। এ সমস্ত মুসলমানরা কখনও মদ স্পর্শ করেনি এবং শূকরের মাংসও খায়নি। তারা ইসলামী পোশাক পরিধান করতো। ফলে তাদেরকে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

অপর এক তথ্যে জানা যায় যে, Christopher Columbus বেলিজে আগমনের পূর্বেই মুসলমানরা বেলিজে আগমন করে। Garifuna মহিলারা ইসলামী পোশাক পরিধান করতো। তারা ঘর থেকে বের হলে মাথা ঢেকে বের হতো এবং লম্বা পোশাক পড়তো যা ইসলামী শিক্ষার অনিবার্য দাবী। তারা আজো ইসলামী শিক্ষার আলোকে নিজেদের আচার আচরণকে সংরক্ষণ করছে এবং আরবী ভাষা চর্চা করছে।

আলহাজ্ব কলীম আল-আমীন নামে বেলিজের একজন স্থায়ী নাগরিক Arabic Garifuna Dictionery রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি সউদী আরবের "ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়" থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি বেলিজের অধিবাসী এবং তিনি Garifuna ভাষার একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। Garifuna ভাষার অধিকাংশ লোকই ইসলামী ধর্মাবলম্বী। Garifuna ভাষীরা কখনও মদ এবং শূকরের মাংস স্পর্শ করেনি।

১৯২০-৩০ সালে কিছু আরবীয় বণিক বৃটিশ হন্ডুরাস (বেলিজ)-এ এসে বসবাস শুরু করে। তারা স্থানীয় মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের সন্তানরা খৃস্টান মিশনারী কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে। ফলে মুসলিম শিশুরা পরবর্তী জীবনে খৃস্টান ধর্মাবলম্বী হিসেবে বেড়ে উঠতে থাকে। তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়

www.pathagar.com

এবং নিজেদের মুসলিম পরিচয়ের পরিবর্তে খৃস্টান ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। শুধুমাত্র খৃস্টানদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের কারণে একটি জাতির ভবিষ্যত প্রজন্ম স্বধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে বেলিজে আগামী দিনে বড় ধরনের জেনারেশন গ্যাপ সৃষ্টি হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। ভারত থেকে যে সকল মুসলিম শ্রমিক বেলিজে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিল তাদের অধিকাংশই স্বধর্মের কথা ভুলে যায়। অথচ ভারত থেকে আগত মুহাম্মাদ আলী ও তার পরিবারবর্গ আমৃত্যু ইসলামের উপর টিকে থাকে। ইসলাম ধর্মের প্রতি মুহাম্মাদ আলী পরিবারের অবিচল মনোভাব ও দৃঢ় আস্থা তাদেরকে মুসলিম সমাজে অত্যন্ত সম্মানজনক স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের প্রতি অবিচল আস্থা পোষণকারী মুহাম্মাদ আলীর নামে বেলিজ শহরের একটি প্রধান সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৬০ সালে আমেরিকা থেকে ইবরাহীম আবদুল্লাহ নামে একজন আমেরিকান মুসলমান বেলিজের কালো মুসলমানদের উপর একটি জরীপকার্য পরিচালনা করেন। তিনি বেলিজে ইসলামের উপর গবেষণা শুরু করেন এবং গবেষণালব্ধ শিক্ষাকে ব্যক্তি জীবনে আমল করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে আরো দু'জন মার্কিন ইসলামী ব্যক্তিত্ব তার সাথে যোগদান করেন। এরা হলেন ওমর শাহবাজ ও রুডল্প কারা খান। তারা ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ইবরাহীম আবদুল্লাহর সাথে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭২ সালে বেলজীয় মুসলমান নূরী মুহাম্মাদ বেলিজে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি বেলিজে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানোর লক্ষে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমেরিকার মুসলিম নেতা এলিজা মুহাম্মাদের Nation of Islam (নেশন অব ইসলাম)-এর কর্মসূচি প্রচার শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সফলতা অর্জন করেন। বেলিজ সরকার ও পুলিশ ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের বিভিন্নমুখী কর্ম-তৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংরক্ষণ করে। ১৯৭৮ সালের কোনো একদিন হঠাৎ করে বেলিজ পুলিশ ইবরাহীম আবদুল্লাহকে গ্রেপ্তার করে। সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী মুসলমানদের সকল অবস্থানসমূহে অবাধে যাতায়াত শুরু করে এবং মুসলমানদের প্রতিটি সভার তথ্য সংরক্ষণ শুরু করে। তারা মুসলমানদের ইবাদাতখানাগুলোতেও ব্যাপকভাবে যাতায়াত শুরু করে। যে সকল পুলিশদেরকে মুসলমানদের তৎপরতা লক্ষ করার জন্য মুসলমানদের ইবাদাতখানায় পাঠানো হতো তারা মুসলমানদের আচার-আচরণ ও ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। যাদেরকে

www.pathagar.com

মুসলমানদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রেরণ করা হলো তারাই আবার ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কা'বাকেন্দ্রিক কাফেলার মিছিলকে আরো দীর্ঘায়িত করে তুললো। যেখানে স্রোতস্বীনি নদীর গতিপথ পাল্টে দেয়ার জন্য বাঁধ দেয়ার চেষ্টা করা হয় সেখানে নদী ফুঁসে উঠবেই এবং বাঁধভাঙা স্রোত বাধাহীনভাবে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে—এটাই স্বাভাবিক। বেলিজের পুলিশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। পুলিশের যে সকল সদস্য ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে সরকার তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বদলীর ব্যবস্থা করে।

১৯৭৮ সালের দিকে আমেরিকার মুসলিম নেতা এলিজা মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মুসলিম সমাজ হঠাৎ অবসন্নতার শিকার হয় এবং আন্দোলন হঠাৎ মুখ থুবরে পড়ে। কিন্তু এদিকে বেলিজে মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদেরকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের পাশাপাশি তারা ক্যারিবীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশের মুসলিম সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে। এ উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে বেলিজের মুসলমানরা Islamic Mission of Belize-এর পতাকাতলে এসে সমবেত হয়। এর ফলে মুসলমানরা বেলিজের একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে বেলিজের সরকার আইনসভায় একটি বিল পাশ করার মাধ্যমে মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সংগঠন Islamic Mission of Belize-কে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং এ সংগঠনটিকে বেলিজে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুমতি প্রদান করে। এ স্বীকৃতি বেলিজের মুসলমানদের একটি নৈতিক বিজয়। শুধুমাত্র একটি সংগঠনকে স্বীকৃতি দিয়েই বেলিজের সরকার ক্ষান্ত হয়নি বরং বেলিজে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদরাসা-মসজিদ নির্মাণ, পত্র-পত্রিকা প্রকাশসহ বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অনুমতি প্রদান করে।

Islamic Mission of Belize বর্তমানে যে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

ক. একটি জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা ঃ বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৩০৫ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ১২ জন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আরবী, কুরআন-হাদীস, ফিকাহ,

www.pathagar.com

ইসলামিয়াত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। বিদ্যালয়টির শিক্ষার মান সন্তোষজনক। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকার নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ সমস্ত পরীক্ষায় স্কুলের পাশের হার ৯০%। ১৯৯১ সাথে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বেলিজ শহর ও দেশভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। শহরভিত্তিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করে এবং দেশভিত্তিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এ ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যালয়টি বেলিজ শহরের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় এবং এর সার্বিক শিক্ষার মান অত্যন্ত সন্তোষজনক।

বেলিজ শহরের মুসলমানরা তাদের সন্তান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী পরিবেশে শিক্ষাদানের জন্য মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করেছে এবং বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

খ. ম্যারেজ সেল গঠন ঃ ইসলামিক মিশনের দ্বিতীয় কাজ হলো মুসলিম যুবক যুবতীদের বিয়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করা। এ লক্ষে তারা মিশনের চারজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি ম্যারেজ সেল গঠন করেছে।

গ. দাওয়াহ্ কার্যক্রম ঃ প্রকল্পের আওতায় ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সপ্তাহের শেষ দিন বেলিজ রেডিওতে ইসলামী প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হতো। কিন্তু অর্থের অভাবে এ প্রোগ্রামটি বর্তমানে অনিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ ফান্ড সংগৃহীত হলে প্রোগ্রাম চলে এবং ফান্ড না থাকলে তা বন্ধ হয়ে যায়।

ঘ. জেলবন্দীদের সাথে সাপ্তাহিক সাক্ষাতকার ঃ জেলবন্দীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার লক্ষে সপ্তাহে একবার জেলখানাগুলো পরিদর্শন করা হয় এবং জেলবন্দীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হয়। এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জেলবন্দীদেরকে ইসলামের সুমহান শিক্ষার আলোকে গঠন করার চেষ্টা করা হয়। এটি একটি উত্তম ও সময়োপযোগী প্রকল্প।

ঙ. সেমিনার ঃ সর্বশ্রেণীর লোকদের জন্য বছরে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারের মাধ্যমে তাদের নিকট ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

www.pathagar.com

চ. যুব সম্মেলন ঃ বছরে দুটি যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে এ ধরনের সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে যুবকরা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ছ. ইসলামী শিক্ষা প্রকল্প ঃ ইসলামী শিক্ষা প্রকল্পের অন্যতম কর্মসূচি হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন বন্ধ থাকে তখন ছাত্রদেরকে স্থানীয় ইসলামিক সেন্টারে আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম স্বকীয় আদর্শের আলোকে গড়ে উঠতে পারে।

জ. কৃষি প্রকল্প ঃ ইসলামিক মিশন অব বেলিজ ৮০০ একর জমির উপর একটি বৃহৎ কৃষি প্রকল্প গড়ে তুলেছে। এ প্রকল্পটি বেলিজ শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রকল্পটি মিশনের সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক একটি প্রকল্প।

মিশনের চেয়ারম্যান প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব আলহাজ কলীম আল আমীন বেলিজ অত্যন্ত পরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে মিশন ইসলাম প্রচার প্রসার এবং মুসলমানদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইসলামিক মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইউনির্ভাসিটি কলেজ অব বেলিজকে আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করার জন্য মিশনের চেয়ারম্যান সউদী আরবের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। সউদী আরবের যে কোনো বিশ্বদ্যিালয়ের সহযোগিতায় ইউনির্ভাসিটি কলেজ অব বেলিজ-এ একটি ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য মিশনের চেয়ারম্যান নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর এ মহতী উদ্যোগ সফল হোক এটাই আমাদের কামনা। ইতোমধ্যেই কলীম আল আমীন রাবেতা, ওয়ামী, ও. আই. সি, চেম্বার অব কমার্স (রিয়াদ)সহ বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। কলীম আল আমীনের এ যোগাযোগ ও তৎপরতার ফলে আজকের মুসলিম সংখ্যালঘু বেলিজ আগামী দিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ বেলিজে রূপান্তরিত হোক—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ঃ অতীত ও বর্তমান

ইন্দোনেশিয়া হাজার দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত একটি দেশ। ছোট-বড় হাজার হাজার দ্বীপের দেশ ইন্দোনেশিয়া। এ দ্বীপ দেশে ইসলামের আগমন কিভাবে ঘটেছিল তার সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সুদৃঢ় অতীতকাল থেকেই আরব দেশগুলোর সাথে ইন্দোনেশিয়ার নৌ-বাণিজ্য বিদ্যমান ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত আরব বণিকদের সাথে কয়েকজন মুসলিম দরবেশ ইন্দোনেশিয়ায় আগমন করেন বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়। মুসলিম দরবেশরা ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার শুরু করলে দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসলাম ধর্মের আগমনের পূর্বে ইন্দোনেশিয়ায় বৌদ্ধ ও হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। তারাই দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করতো। কিন্তু মুসলিম দরবেশদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম গ্রহণ করে। কালক্রমে ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। অবস্থানগত দিক থেকে ইন্দোনেশিয়ার উত্তরে মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন, পূর্বে পাপুয়া নিউগিনি, পূর্ব দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। দেশটির আয়তন ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৬৫ বর্গমাইল। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১৯ কোটি ৬৫ লাখ। এর রাজধানী জাকার্তা। সরকারী ভাষা বাহাসা ইন্দোনেশিয়া। মুসলমানদের সংখ্যা ৯০%। ১৯৪৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর দেশটি ওলন্দাজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। অবশ্য ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দেশটি জাপানের অধিকারে ছিল।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়নের গতি অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় বেশ সন্তোষজনক। তবে এ কথা সত্য যে, প্রতিটি উন্নয়নের পেছনেই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। যেমন প্রতিটি কাজের পেছনে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অংগনে ইন্দোনেশিয়া বেশকিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১৯৯৩ সালে লটারী নিষিদ্ধ করা হয়।

www.pathagar.com

লটারী একটি জাতীয় জুয়া। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে লটারীর নামে এ জুয়া খেলা রাষ্ট্রীয় অনুমোদন সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে লটারী আর জুয়া খেলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইন্দোনেশিয়ার আলেম সমাজের জোরালো দাবীর মুখে সমাজকল্যাণমন্ত্রীর নির্দেশে ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে লটারী খেলাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এটা আলেম সমাজের সাহসী উচ্চারণেরই বিজয়। লটারীকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীতে Indonesian Council of Ulema এবং Association of Indonesian Muslim Intellectuals নামক দুটি সংগঠন দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এ সংগঠন দুটির বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকার কারণেই সরকার বাধ্য হয়ে লটারীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্যটকদের চাহিদা ও রুচির আলোকে এ শিল্পকে গড়ে তোলা হয়। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য নৈশ ক্লাব, বার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সমস্ত বার ও ক্লাবে মদ ও নাচগানের ব্যবস্থা করা হয়। এ সমস্ত বার ও ক্লাবগুলো পর্যটকদের পাশাপাশি দেশের যুব শক্তিকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করছে। ফলে দেশের ভবিষ্যত কর্ণধাররা নেশাগ্রস্ত ও নৈতিকতা বিরোধী মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠছে। যে জাতির ভবিষ্যত কর্ণধাররা নেশাগ্রস্ত ও নৈতিকতা বিরোধী মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে সে জাতি চিরদিন মাথা উচু করে দাড়াতে পারে না—এটা ইতিহাসের শিক্ষা। জাকার্তাসহ দেশের প্রতিটি বড় বড় শহরের উন্নয়নের নামে অসংখ্য নৈশ ক্লাব ও বার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা টিন এজারদের অবাধ যাতায়াতের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এ সমস্ত কেন্দ্রগুলোতে মদ ও নাচগানের পাশাপাশি অবাধ যৌন সম্ভোগেরও ব্যবস্থা আছে। ইসলামী বিশ্বে এ সমস্ত উপকরণ নৈতিকতা বিরোধী হলেও পশ্চিমা পর্যটকদের জন্য এগুলো বিনোদনের স্বাভাবিক উপকরণ হিসেবে স্বীকৃত। অবসর সময় এ সমস্ত উপকরণের অভাব ঘটলে তাদের বিনোদনের সময়টুকু অর্থহীন হয়ে পড়ে বলে পশ্চিমা পর্যটকদের বিশ্বাস। তাই মদ আর নারী পশ্চিমা পর্যটকদের বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে। অথচ বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ পশ্চিমা পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য এ অবৈধ উপকরণের যোগান দিয়ে যাচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ায় যে সমস্ত পর্যটকরা আগমন করে তাদের মধ্যে অবিবাহিত দম্পতিও রয়েছে, যারা স্বামী স্ত্রীর ন্যায় একত্রে হোটেল ও পর্যটন ভিলায় বসবাস করে। তারা এ ধরনের জীবন যাপনকে Living

www.pathagar.com

together বলে থাকে। Living togehter এর তথাকথিত আধুনিক (Modern) ধারণা পর্যটকদের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ায় আগমন করে। Living together এর ধারণা ইন্দোনেশিয়ায় যুবক যুবতীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে পর্যটন এরিয়ায় গড়ে ওঠা Homestays (Small House) গুলোতে অবিবাহিত পর্যটক দম্পতিদের ন্যায় ইন্দোনেশীয় অবিবাহিত যুবক-যুবতীরাও রাত্রিযাপনে অভ্যস্থ হয়ে উঠছে। নববই দশকের গোড়ার দিকেই ইন্দোনেশীয় যুবক যুবতীদেরকে জীবন যাত্রায় এ New Life Style আকৃষ্ট করতে শুরু করে যা আজ এক বিরাট বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। ফলে আশংকা করা হচ্ছে যে, অচিরেই ইন্দোনেশিয়ায় মরণব্যাধি এইসড (AIDS) ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে এবং ইন্দোনেশীয় সমাজ জাহেলী সমাজে রূপান্তরিত হবে।

ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যত প্রজন্মকে নব্য জাহেলিয়াতের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে নতুন প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একটি সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা যা Douch Colonial Period এ শুরু হয়। এ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা ইসলাম সম্পর্কে খুব কম ধারণাই লাভ করে থাকে। সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই নব্য প্রজন্ম ধীরে ধীরে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো সঠিক দিক নির্দেশনা নেই বরং এ শিক্ষাব্যবস্থায় অস্পষ্টতাই বিদ্যমান। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার উপর বেশি জোর দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী মানুষকে শুধুমাত্র একজন Technologist-ই ভেবেছেন। তাই Technological জ্ঞানের উপর তিনি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র Technologist -ই নয় বরং মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি বা Khalifa। তাই মানুষকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান দানের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষা মানুষের নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা ও দায়িত্বানুভূতি শিক্ষা দেয়। যে সমাজে এ সমস্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের উপস্থিতি বেশি হবে সে সমাজ একটি শান্তির সমাজে পরিণত হবে। অপরদিকে Science and Technology-এর নামে যে Advance শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে তা মানুষকে Robot এ পরিণত করতে বাধ্য। কারণ মানুষকে শুধুমাত্র একজন Technician মনে করা হলে Advance শিক্ষা মানুষকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে তৈরি না করে একটি Robot হিসেবে তৈরি হবার

www.pathagar.com

পথকেই প্রশস্ত করে থাকে। ইন্দোনেশিয়ার বড় বড় শহরগুলোর অধিবাসীরা বস্তুগত দিক থেকে খুবই উন্নত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ সমস্ত ভোগবাদী সমাজে বেড়ে ওঠা শিশু কিশোররা ইসলাম সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞই থেকে যাচ্ছে। তারা পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে থাকে। ফলে আগামী দিনের কর্ণধাররা Negative মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে যা কোনো জাতির জন্য কল্যাণকর নয়। অবশ্যই এর বিপরীতে আশার আলোও প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছে। ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী যুবকরা সারা দেশ থেকে রাজধানী শহর জাকার্তায় সমবেত হয়ে সম্প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের এ বিক্ষোভ ইন্দোনেশীয়া ইসলাম প্রিয় জনগণের মনে আশার আলো জ্বেলে দিয়েছে। কুরআনী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের লক্ষে তারা ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ও বিতরণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ সমস্ত মসজিদে নামাযীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পঞ্চাশ দশকে বিপ্লবের সময় লাভজনক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অজুহাতে অনেক মসজিদ ধ্বংস করা হয়। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, একমাত্র জাকার্তায় শহরেই ১৫০-৩৫০টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়। বর্তমানে Halaqah Movement নামে একটি ইসলামী সংগঠন যুবকদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এটি একটি জনপ্রিয় সংগঠন।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ঘোষণা দিয়েছে তা এখনও অব্যাহত রয়েছে। সমবায় সমিতিগুলো এখনও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমবায় সমিতিগুলো খুবই দুর্বল। ছোট ছোট এন্টারপ্রাইজগুলো অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে না। শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ জমির প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বল্প জমির মালিক বিধায় তাদেরকে জমি থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে সচ্ছল ব্যক্তিরা শিল্প কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করছে। এতে গরীব ও স্বল্প জমির মালিকরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে গ্রামীণ এলাকায় ধানের জমিতে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষে বড় বড় দালান তৈরি করা হচ্ছে। ফলে গ্রামীণ পরিবেশ শিল্প কলকারখানার বর্জ ও ধোয়ায় দূষিত হয়ে পড়ছে। গ্রামে ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠার ফলে বহিরাগত লোকদের অবস্থান গ্রামে বৃদ্ধি পায়। এতে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এ ধরনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সুন্দর

www.pathagar.com

সামাজিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। গ্রামে শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠার কারণে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। এতে কৃষকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় জমি সমস্যা সমাধানের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ইন্দোনেশিয়ার কিশোর ও মহিলারা অর্থ উপার্জনের জন্য কৃষি জমি ও শিল্প কলকাখানায় কাজ করছে। শিল্প কলকারখানায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে বর্তমানে অনেক মহিলা শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে। ইন্দোনেশিয়ায় শ্রমিকদেরকে স্বল্প মজুরী দেয়া হয়। তাছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যে সকল দেশে ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকরা কর্মরত সে সব দেশেও ইন্দোনেশীয় শ্রমিকদেরকে স্বল্প মজুরী দেয়া হয়। ফলে ইন্দোনেশীয় শ্রমিক শ্রেণী দরিদ্রতামুক্ত জীবনযাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। দরিদ্রতা মানুষের নৈতিক মনোবলকে দুর্বল করে এবং স্বাধীন চেতনাকে খর্ব করে দেয়। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে দরিদ্রতা মানুষকে কুফরীর কাছাকাছি নিয়ে যায়। মুসলমানদের এ দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে খৃস্টান মিশনারীরা মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার কাজে অগ্রসর হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা সফলতাও অর্জন করে।

জাকার্তার একটি অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ বলেন,

"Our economic condition although superficially improvings is not real"

অর্থ ঃ "আমাদের অর্থনীতির অবস্থা ও উন্নয়নের ব্যাপারে যা বলা হচ্ছে তা বাস্তব নয়। বরং উন্নয়ন খুব সামান্যই হচ্ছে।"

তার এ উক্তি থেকেই বুঝা যায় যে, ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র শ্লোগান সর্বস্ব। বাস্তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়নি।

১৯৯৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক অংগনে হঠাৎ করে বেশ পরিবর্তন আসে। সরকার ইন্দোনেশিয়ান মুসলিম ইনটেলেকচুয়াল এ্যাসোসিয়েশন (Indonesian Muslim Intellectual Association) এর কয়েকজন সদস্যকে মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত করেন। সরকারের এ সিদ্ধান্ত ইন্দোনেশীয় জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। Association এর সদস্যরা মন্ত্রীসভায় নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করার চেষ্টা করছে। ১৯৮৪ সালে Tanjung Priok affair এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিপূর্বে যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল, তাদের

www.pathagar.com

অধিকাংশকেই '৯৩ সালে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু এতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। কারণ যেসব পরিবারের সদস্যদেরকে এ আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাদের উত্তরসূরিরা সরকারকে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবে না।

ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যত প্রজন্মকে স্বকীয় আদর্শের আলোকে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ করতে হবে এবং দেশের আলেম সমাজ, বুদ্ধিজীবী, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সর্বস্তরের জনতাকে ইসলাম বিরাধী কার্যক্রম প্রতিরোধে এবং ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার লক্ষে দুর্জয় শপথে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

"Amar bil ma'ruf, nahi anil munkar."

অর্থ ঃ "সৎকাজের আদেশ করো, অসৎকাজ থেকে বিরত থাক।"

ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে কুরআনে বর্ণিত দায়িত্ব পালনে মুসলমানদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। আর এ দায়িত্বগুলো হলো ঃ

ক. আল্লাহর ইবাদাত করা।
খ. আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।
গ. মানবতার সেবা করা।

কুরআনে বর্ণিত এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আজকের সেকুলার ইন্দোনেশিয়া আগামী দিনের ইসলামী ইন্দোনেশিয়ায় রূপান্তরিত হোক—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), ডিসেম্বর, ১৯৯৪।
২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

সুইজারল্যান্ডে ইসলাম ঃ অতীত ও বর্তমান

বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ড পৃথিবীর অন্যতম শান্তির দেশ বলে খ্যাত। এ দেশটিতে এক সময় ইসলামের বিজয় পতাকা পত্‌পত করে উড়েছিল তা আজ অনেকেরই জানা নেই। সুইজারল্যাণ্ড এক সময় আরব স্পেনের একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল। ৭১১ খৃস্টাব্দে স্পেনে সর্বপ্রথম আরব মুসলমানদের আগমন ঘটে। মুসলিম উম্মাহ্‌র সাহসী সিপাহসালার তারিক ও মূসার নেতৃত্বে আরব মুসলমানরা পরবর্তীতে স্পেন অধিকার করে নেয়। স্পেনে মুসলিম শাসনের এক পর্যায়ে সুইজারল্যান্ড আরব স্পেনের ঔপনিবেশে পরিণত হয়। এভাবেই সুইজারল্যান্ড মুসলিম সুইজারল্যান্ডে পরিণত হয়। সুইজারল্যান্ডে আজো ইসলামী স্থাপত্যশিল্প মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছিলেন "মূসা ও তারিকের স্পেন বিজয়ের অভিযান যদি স্তব্ধ হয়ে না যেত, তাহলে ফ্রান্সের গীর্জাগুলো মসজিদে পরিণত হতো এবং বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কুরআন-হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্র আলোচিত হতো।"

অনুসন্ধিৎসু মন আর শানিত চোখ দিয়ে ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল পাতাগুলো উল্টালে দেখতে পাওয়া যায় যে, ৭৩২ সালে আরব মুসলমানরা ফ্রান্সে আগমন করে এবং দ্রুত তারা ফ্রান্সের Arles, Narbonne, Marseille, Avignon প্রভৃতি শহরে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ৮০২ সালে আরব সৈনিকরা Corsica Nice এবং Rome উপকূলে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু ৮১৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী সেখানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ৮১৪ সালে মুসলিম বাহিনী Crete এবং ৮২৭ সালে Sicily অধিকার করে নেয়।

৮৮৯ সালে ২০ জন আরব বণিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে স্পেন ত্যাগ করে। স্পেন ত্যাগের পর মুসলিম বণিকদের জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে এবং তাদের জাহাজটিকে দক্ষিণ ফ্রান্সের St. Tropez এর উপকূলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জাহাজটি উপকূলে ভেড়ার সাথে সাথেই মুসলিম বণিকরা জাহাজ থেকে নেমে পড়ে। জায়গাটি ছিল ঘন জঙ্গলে পূর্ণ। জাহাজ থেকে নেমে বণিকরা আশেপাশের পাহাড়গুলো বেয়ে উপরে উঠে আশেপাশের অবস্থান সম্পর্কে জেনে নেয়। তারা দেখতে পেল, পাহাড়ের এক পাশে সমুদ্র এবং অপর পাশে Alps নামক ঘন বনাঞ্চল। তারা চিন্তা

www.pathagar.com

করলো, এ এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তারা এও চিন্তা করলো যে, সমুদ্রপথে স্পেন থেকে খাদ্যসামগ্রীসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমগ্রী আমদানী করা সম্ভব হলে এ এলাকায় বসবাস শুরু করা যেতে পারে। কারণ এলাকাটি ঘন বন ও পর্বতমালা দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে বেষ্টিত থাকায় অনেকটা নিরাপদ বলেই তাদের নিকট মনে হয়। সবদিক বিবেচনা করে তারা এ এলাকায় বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতে এ এলাকাকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করে। ইতিহাসের ছোট এ ঘটনাটি আমাদেরকে একথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ইসলামের বিজয় যুগে মুসলমানরা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থেই দেশত্যাগ করেনি বরং ইসলাম প্রচার ও প্রসারও ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মুসলিম বণিকদের এ ক্ষুদ্র দলটি এ এলাকায় বসতি স্থাপনের পর এলাকাটিকে ইসলামী সমাজের আদলে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে আশেপাশের এলাকাগুলোতে মুসলমানদের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য তারা তাঁদের মুসলিম ভাইদেরকে এ অঞ্চলে এসে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানায়। একজন ফরাসী ঐতিহাসিক Mr. Renault তাঁর "By the way" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "Muslim Colonies in Northern france, Italy and Switzerland." এ উক্তির অর্থ হলো, মুসলিম স্পেনের সীমানার বাইরে খৃস্টান শাসনাধীন রাষ্ট্রেও আরব মুসলমানরা বসবাস করতো। এ সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে ছিল শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও চিকিৎসক। কিন্তু সুইজারল্যান্ডকে মুসলিম স্পেনের কলোনী হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য সময়ের দাবী অনুযায়ী তখন সেখানে মুসলিম সেনাছাউনি তথা দুর্গ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল।

নতুন বসতি স্থাপনের পর মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র দলটি স্পেনের মুসলমানদেরকে তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করা এবং তাদের দুর্দিনে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করার জন্য আহ্বান জানায়।

শীঘ্রই মুসলিম বণিকরা বেশ কয়েকটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাদের বসতি সংলগ্ন দুর্গটি। এটি সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সুরক্ষিত। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এ দুর্গটি নির্মাণ করা হয়। এটি প্রথম মুসলিম জনপদ বা গ্রাম "Garde Frainet" এর সংলগ্ন।

আরব স্পেনের ঔপনিবেশিক এ অঞ্চলটির ল্যাটিন নাম "Fraxinetum" এ সমধিক পরিচিত ছিল। মাত্র ২০ জনের এ ক্ষুদ্র দলটি একটি নতুন

www.pathagar.com

জনপদ প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন হয়নি। এর কারণ ছিল এ ক্ষুদ্র দলটি ভবিষ্যতে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক আকাশে ঝড় তুলতে পারবে বলে তার কোনো ধারণা তাদের ছিল না। যে এলাকায় এ ক্ষুদ্র মুসলিম জনপদটি গড়ে ওঠে সে এলাকাটি Boson নামক একজন রাজার শাসনাধীন ছিল। রাজাকে "King of Arles" বলা হতো। রাজার প্রতি সকল লোকের আনুগত্য ছিল না। সবাই রাজার কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারেনি। ফলে এ অঞ্চলে রাজার বিরোধী একটি শক্তিশালী গ্রুপের অস্তিত্ব ছিল। মুসলমানরা এ সুযোগেই তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং প্রায় নির্বিঘ্নেই তারা সফলতা অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে Mr. Renault নামক একজন ফরাসী ঐতিহাসিক বলেন ঃ

"During the Arab excursions in france, we find that they were supported by people without belief and without land and that there were always some people who did not hesitate to go over to the enemy."

অর্থ ঃ "ফ্রান্সে আরব পর্যটকদের পরিভ্রমণকালে আমরা লক্ষ করলাম যে, তারা ধর্মবিশ্বাসহীন এবং ভূমিহীনদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে এবং সর্বদাই কিছুসংখ্যক লোক ছিল যারা ইতস্ততঃ করা ছাড়াই শত্রুদের নিকট যাতায়াত করতো।"

Mr. Renault -এর এ উক্তি থেকে বুঝা যায় দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলমানদের আগমনকে স্বাগত জানায় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবেই একটি ক্ষুদ্র জনপদ স্থানীয় লোকদের ইসলাম গ্রহণের ফলে একটি বৃহৎ জনপদে পরিণত হয়। ইসলাম গ্রহণের জন্য মুসলমানরা শক্তি প্রয়োগ করেনি। বরং ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েই তারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এ ক্ষুদ্র জনপদের মুসলমানদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আরব স্পেন সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। আরব স্পেনের সহযোগিতা পাবার ফলে অধিক হারে মুসলমানরা এসে এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। মুসলমানদের আগমনের এ ধারা অব্যাহত থাকার প্রেক্ষিতে মুসলিম সেনাবাহিনীর একটি দলও এসে এখানে শিবিরস্থাপন করে এবং অল্প

www.pathagar.com

সময়ের মধ্যেই তারা দেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে নেয়। অপরদিকে রাজনৈতিক তৎপরতার ফলেও দেশের কিছু অংশ মুসলমানদের প্রভাবাধীনে আসে। এভাবেই ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল আরব মুসলমানদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

৯০৬ সালে আরব মুসলমানরা French-Italian Alps অতিক্রম করে Mount Cenis এ এসে উপস্থিত হয়। Mount cenis এ পৌঁছার পর মুসলমানরা Piemont সীমান্তে অবস্থিত Monastery of Novalese পরিদর্শন করেন। সন্ন্যাসীদের আশ্রমে পৌঁছার পর তারা দেখতে পেলেন যে, আশ্রমের মূল্যবান সামগ্রীসহ সন্ন্যাসীরা আশ্রম ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সন্ন্যাসীরা এ মূল্যবান সামগ্রী Turin নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। অবশ্য আশ্রমের সকল সন্ন্যাসীই ইতোমধ্যে আশ্রম ত্যাগ করে Turin-এর পথে পাড়ি দিয়েছে। মাত্র দুজন সন্ন্যাসীই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশ্রমে ছিল। মুসলমানরা এ সন্ন্যাসীদের কোনো ক্ষতি করেনি বরং তাদেরকে তাদের ধর্মকর্ম পালন করার সকল প্রকার নিশ্চয়তা বিধান করে। সন্ন্যাসীরা মুসলমানদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে আশ্রম জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের নিকট বর্ণনা করে। ৯১১ সালের মধ্যেই ফ্রান্স ও ইতালী যাতায়াতের সকল সড়ক পথ আরব মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ৭৩২ সালে মাত্র ২০ জন আরব বণিক Grade- Frainet-এ যে ক্ষুদ্র জনপদটি গড়ে তুলে তা অষ্টম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে সমগ্র ফ্রান্সে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

মুসলমানরা ঠিক কখন সর্বপ্রথম সুইজারল্যান্ডের মাটিতে পা রাখে তার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন ফ্রান্স-ইতালী যাতায়াতের সকল সড়ক পথের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে তার সমসাময়িককালে ৯১১ সালের কোনো এক সময়ে মুসলমানরা সর্বপ্রথম সুইজারল্যান্ডের মাটিতে পা রাখে। ধীরে ধীরে মুসলমানরা তাদের সীমানা সম্প্রসারিত করতে থাকে এবং অল্প সময়ের ব্যবধানেই তারা Great St. Bemard Mountain এ যাবার পথের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে এবং ৯২৫ সালে আরব মুসলমানরা সুইজারল্যান্ডের St. Gall অধিকার করে নেয়। সুইজারল্যান্ডের সাবেক মেয়র Mr. J. G. Mayer তাঁর "The History of the Bistum chur" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে ঃ

"The Saracenes were Wild Arabs who came from Spain. Their hordes now entered the Swiss Alps.

www.pathagar.com

They occupied the mountains of the Grisons, Sargans, Toggenburg and Appenzell and from there made excursions to the inhabited plains and velleys, murered people, robbed cattle and food staffs and burdned down houses. They put to ash the city of coire.The damage, which the churches of coire, pfaefers, Disentis and St. Gall had to bear were enormous. In order to relieve the suffering, king otto-1 gave some gifts to Bishop waldo, larger ones followed later."

অর্থ ঃ "স্পেন থেকে আগত আরবরা ছিল জংলী। তাদের যাযাবর দল এখন সুইজারল্যান্ডে প্রবেশ করেছে। তারা গ্রিসন্স, সারগানস, তোজেনবার্গ এবং এ্যাপেনজেল পর্বতসমূহ দখল করে নিয়েছে এবং সেখান থেকে তারা সমতল ভূমি ও উপত্যকাসমূহ পরিভ্রমণ করছে। তারা জনগণকে হত্যা করছে, গবাদিপশু ও খাদ্যসামগ্রী লুট করছে এবং ঘর-বাড়ী পুড়ে দিয়েছে। তারা কোয়েরে শহরটাকে ছাই ভস্মে পরিণত করেছে। তারা কোয়েরে কেইকাস এবং সেন্ট গল শহরের গীর্জাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে যা সংস্কার করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। এ যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য রাজা অটো-১, বিশপের জন্য গিফট পাঠিয়েছেন যা পরবর্তীতে অন্য কেউ অনুসরণ করবে।"

The History of the Bistum chur নামক গ্রন্থ পাঠে আরো জানা যায় যে, ৯৩৯ সালে আরব মুসলমানরা valais এবং ৯৪০ সালে Disentis, Coire, St. Gall, ও ৯৫৪ সালে Jura Hills দখল করে নেয়। ৯৪০ থেকে ৯৬০ সালের মধ্যে মুসলমানরা সুইজারল্যান্ডের একটি বিরাট অংশ দখল করে নেয়। এ দখলকৃত অংশের সীমানা দক্ষিণে সাগর পশ্চিমে থন (Thone) নদী, উত্তরে জেনেভা শহর এবং Jura পাহাড় থেকে Bale শহর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

স্পেনের মুসলিম শাসকদের সহযোগিতা বন্ধ হয়ে গেলে ৯৬০ সাল থেকে সুইজারল্যান্ডে মুসলমানদের পতন শুরু হয়। ৯৬০ সালে মুসলমানদের শক্তঘাটি St. Berard, ৯৭২ সালে Grenoble এবং ৯৭৫ সালে Grade-Frainer-এর পতন ঘটে। ফলে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানরা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এ দেউলিয়া জীবনের

www.pathagar.com

অবসানের লক্ষে মুসলমানরা আবার স্পেনে ফিরে আসে। তবে ক্ষুদ্র একটি দল সুইজারল্যান্ড থেকে যায়। এরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সুইস জনগণের নির্যাতন ও নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। কারণ এ সময় যুদ্ধবন্দীদেরকে বাধ্যতামূলক ভাবে দাসত্বের জীবন বরণ করতে হতো। স্থানীয় লোকদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদেরকে দাসত্বের বন্দীত্ব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

ইতিহাস স্বাক্ষী মুসলমানরা কখনো তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনি। তাই আমরা দেখতে পাই, মুসলিম স্পেনে অনেক সরকারী উচ্চপদে খৃস্টানরা কর্মরত ছিল। কিন্তু তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কখনো বাধ্য করা হয়নি। বর্তমানকালেও আমরা দেখতে পাই ইরাক ও মিসরে খৃস্টানদের মন্ত্রীসভায় স্থান দেয়া হয়েছে। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই খৃস্টান শাসিত দেশে মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। ইউরোপে মুসলিম শাসনের অবসান হলেও মুসলিম সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত করা সম্ভব হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাই ইউরোপের এককালিন মুসলিম শাসিত দেশসমূহে আজো মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্দশন বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলমানরা আবার সুইজারল্যান্ডে ফিরে আসে। ১৯৬৩ সালে সুইজারল্যান্ডের সর্ববৃহৎ শহর জুরিখে মুসলমানরা একটি মসজিদ নির্মাণ করে এবং জেনেভায় দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে ও স্থানে অসংখ্য নামায ঘর রয়েছে—সেখানে মুসলমানরা তাদের দৈনন্দিন পাঞ্জেগানা নামায আদায় করে থাকে। বর্তমানে সুইজারল্যান্ডে দুই লাখ মুসলমান বসবাস করছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে জীবিকার সন্ধানে এ সমস্ত মুসলমানরা সুইজারল্যান্ডে আগমন করে। অবশ্য বর্তমানে কিছু সংখ্যক সুইস নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করায় সুইজারল্যান্ডে ইসলাম একটি বিকাশমান জীবনাদর্শ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে আগামী দিনের সুইজারল্যান্ড ইসলামী সুইজারল্যান্ডে পরিণত হোক এবং সুইজারল্যান্ডের আকাশে কালেমার পতাকা পুনঃ উড্ডীন হোক এটাই আমাদের আজকের প্রত্যাশা।

তথ্য সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), মার্চ, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

বুলগেরিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান

বুলগেরিয়ায় কখন কিভাবে ইসলামের আগমন ঘটে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, উসমানীয় খেলাফত সুদূর রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সময় অনেক তুর্কী মুসলমান এ অঞ্চলে আগমন করে। এ সমস্ত তুর্কী মুসলমানরাই কোনো এক সোনালী দিনে বুলগেরিয়ায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়। বুলগেরিয়া সাবেক সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া ব্লকের একটি দেশ। বুলগেরিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় এক মিলিয়ন। দীর্ঘদিন থেকে বুলগেরিয়ান মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হচ্ছে। ১৯৮৪ সাল থেকে মুসলমানদেরকে তাদের জাতীয় পরিচয় মুছে বুলগেরীয় হবার জন্য বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন করা হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক মুসলিম নামের পরিবর্তে বুলগেরীয় নাম ধারণ করতে বাধ্য করা হয়। এতে মুসলমানরা ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে সেনাবাহিনীর সাথে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সংঘর্ষে প্রায় শতাধিক মুসলমান নিহত হয়। লন্ডনভিত্তিক এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ সংবাদ বিশ্ববাসীকে সর্বপ্রথম অবহিত করে।

১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াকে মুসলিম মুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সোফিয়া থেকে মুসলিম বিতাড়ন শুরু করা হয়। মুসলমানরা নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিম উচ্ছেদের এ অভিযানকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য এ সময় বুলগেরীয় টিভি. একটি ন্যক্কারজনক টিভি সিরিজ প্রোগ্রাম শুরু করে। এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেখানো হয় যে, উসমানীয় শাসনামলে মুসলিম শাসকরা জোরপূর্বক বুলগেরীয়দেরকে ধর্মান্তরিত করেছিল। অথচ এটি ইতিহাসের একটি নির্লজ্জ উপাখ্যান মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উসমানীয় খিলাফতের সময় বুলগেরীয়রা ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। বুলগেরীয় সরকার তুর্কী মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় নাম পরিহার করে স্লাভিক নাম ধারণ করার জন্য বাধ্য করে। নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে চাপ দিয়েই সরকার ক্ষান্ত হয়নি বরং তুর্কী ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করাসহ নামায, রোযা ও কুরআন পাঠ করার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। বুলগেরীয় মুসলমানদের

www.pathagar.com

ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণের এ ন্যক্কারজনক ভূমিকার বিরুদ্ধে বিশ্ববাসী কোনো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এমনকি অধিকাংশ মুসলিম দেশও এ দমননীতির বিরুদ্ধে কোনো বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেনি।

বুলগেরীয় তুর্কী মুসলমানদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের এ করুণ কাহিনী ইস্তাম্বুলে পৌঁছার পরপরই হাজার হাজার তুর্কী মুসলমান এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে এবং তারা চিৎকার করে বলতে থাকে ঃ

"How many of our brothers and sisters have to die first before the worlds takes any notice."

অর্থ ঃ "আমাদের কত ভাই বোনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, বিশ্বকে কোনো কিছু ঘোষণা দেয়ার পূর্বে প্রথমে তা জানাতে হবে।"

বুলগেরীয় সরকারের ধর্মীয় দমননীতির ফলে এ সময় প্রায় ১ লক্ষ তুর্কী মুসলমান দেশত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করে। দেশত্যাগী একজন যুবক সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান,

"It is a bad life for us here and Turkey is our father land."

অর্থ ঃ "এখানে বসবাস করা আমাদের জন্য খুবই দুঃসহ জীবনের ন্যায়। অথচ তুরস্ক আমাদের পিতৃভূমি।"

১৯৮৯ সালের মে মাসের একটি ঘটনা। Egdana নামক একজন যুবতী জানান যে, তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। হঠাৎ সামনে একটি জটলা দেখে তার গাড়ী থেমে গেল। Egdana-এর গাড়ী থেকে একজন সহগামী নেমে ভীড়ের দিকে এগিয়ে গেল, তারা দেখতে পেল বরযাত্রীর সাথে আগত তার শ্বশুর গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছার পথেই তার শ্বশুর তার স্বামীর উরুতে মাথা রেখে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কি নির্মম পরিহাস! মেহেদীপরা যুবতী শ্বশুরের বুলেটবিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ নিয়ে সংসার যাত্রা শুরু করলো। বুলগেরিয়ার মুসলমানদের জীবনে এ ধরনের ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

বুলগেরীয় সরকারের নির্যাতনের ফলে দলে দলে তুর্কী বংশদ্ভূত মুসলমানরা দেশত্যাগ করছে। ফলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেশের অর্থনীতিকে আঘাত করছে। কারণ সক্ষম জনশক্তি দেশত্যাগ করার

www.pathagar.com

কারণে দেশে শ্রমশক্তি হ্রাস পায়। এতে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দেশের অর্থনীতিকে চাঙা করতে হলে মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে তাদের পেশা ফিরিয়ে দিতে হবে।

আমরা আশা করবো বুলগেরীয় মুসলমানরা শত নির্যাতন ও প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করে আগামী দিনের বুলগেরীয়ায় ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করবেই।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, জুলাই ও আগস্ট, ১৯৮৯।

www.pathagar.com

হাবশা ঃ ইসলাম সমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্র

সোমবার। ৯ রবিউল আউয়াল। ৬১০ খৃস্টাব্দ। একটি সুন্দর সকাল। হেরার অপ্রশস্ত গহ্বরে ধ্যানমগ্ন মুহাম্মাদ। তিনি এক ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হলেন, "তোমার সেই রবের নামে পাঠ কর—যিনি (সমস্তই) সৃষ্টি করেছেন।" হঠাৎ হেরার রাজতোরণ এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে পাপতাপদগ্ধ পৃথিবীতে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে সুকৃতির এবং শয়তানের বিরুদ্ধে ঈমানদারদের সমরভেরী বেজে উঠলো। পৃথিবী হক ও বাতিল এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নেতৃত্বে হেরার রাজতোরণমুখী সত্যের সাক্ষদাতাদের মিছিল ধীরে ধীরে দীর্ঘায়িত হতে লাগলো। তিন বছর পর্যন্ত গোপনে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত থাকে। এ সময় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিবি খাদিজা, হযরত আলী, হযরত আবু বকর, যায়েদ, উম্মে আয়মান, আসমা বিনতে আবু বকর, আসমা বিনতে আমিছ, হযরত ওসমান, হযরত যুবায়ের, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, তালহা, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আবু ওবায়দা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ প্রমুখ। সত্য পন্থীদের মিছিল দীর্ঘায়িত হতে দেখে ঈমানদারদের উপর মুশরিকদের নির্যাতন শুরু হলো। আরবের প্রত্যেক গোত্র তার মধ্যকার মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়লো। নির্যাতন ও নিপীড়নের সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলো। নির্যাতন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। এমনি এক সময়ে রাসূলে করীম (স) সাহাবীদেরকে বললেন, "তোমরা যদি আবিসিনিয়ায় (হাবশা) চলে যাও মন্দ হয় না। সেখানে একজন রাজা আছেন যার রাজত্বে কারো ওপর যুলুম নিপীড়ন হয় না, ঐ দেশটা সত্য ও ন্যায়ের আশ্রয়স্থল। যতদিন এ অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে মুক্ত না করেন ততদিন সেখানে অবস্থান করো।" এ উপদেশ অনুসারে সাহাবীদের একটি দল নিজেদের দীন ও ঈমানকে বাঁচানোর তাকিদে হাবশায় হিজরত করেন। হযরত ওসমান (রা)-এর নেতৃত্বে ১৪জন সাহাবী এ হিজরতে অংশগ্রহণ করেন। এ হিজরতের জন্য যাঁরা প্রথম স্বদেশ ত্যাগ করেন তাঁরা হলেন,

১. উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)
২. রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কন্যা রুকাইয়া (উসমান (রা)-এর স্ত্রী)
৩. আবু হুযাইফা ইবনে উতবা

www.pathagar.com

৪. সাহলা বিনতে সুহাইল (হযরত উতবার স্ত্রী)
৫. যুবাইর ইবনুল আওয়াম
৬. মুসআব ইবনে উমাইর
৭. আবদুর রহমান ইবনে আউফ
৮. আবু সালামা ইবনে আবু উমাইয়া
৯. উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া
১০. উসমান ইবনে মাযউন
১১. আমের ইবনে রাবীয়া
১২. লায়লা বিনতে আবী হাসমা (আবু সালামার স্ত্রী)
১৩. আবু মাবরা ইবনে আবু রুহম।
১৪. সুহাইল ইবনে বাইদা।

এরপর দেশত্যাগ করেন জাফর ইবনে আবু তালিব।

এ হিজরতের মধ্য দিয়ে ইসলাম আরব ভূমি থেকে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে হাবশা বা আবিসিনিয়া স্বল্প পরিসর লোহিত সাগরের ওপারে অবস্থিত। এর অধিপতি ছিলেন সম্রাট নাজ্জাশী। মক্কার অমুসলিমরা হিজরতকারী মুসলমানদের রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত করে তাদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর জন্য সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে। কিন্তু সম্রাট নাজ্জাশী মুসলমানদের মক্কায় ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। এ সময় সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারের সভাসদগণের সামনে মুসলমানদের মুখপাত্র যে যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন তাতে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূলে করীম (স) গায়েবানা জানাযার নামায পড়ান।

লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের সংযোগস্থলে আবিসিনিয়া বা হাবশা (ইথিওপিয়া) অবস্থিত। এর আয়তন ১২ লক্ষ ২১ হাজার ৯০৫ বর্গকিলোমিটার। এর পূর্বে জিবুতি ও সোমালিয়া, দক্ষিণে কেনিয়া এবং উত্তর পশ্চিমে সুদান অবস্থিত। দেশটির রাজধানী আদ্দিস আবাবা ২৪৪০ মিটার উচ্চে অবস্থিত। আজকের ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়ায় বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাস। আমহারা নামক একটি সংখ্যালঘু গোত্রের ভাষা আমহারিক দেশটির সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষা হচ্ছে ওরোমো। এ ছাড়াও তিগরে, তিগরিনা, গুরেজ, ইংরেজী, আরবী ও ইতালী ভাষাও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে।

www.pathagar.com

বর্তমানে ইথিওপিয়ার লোকসংখ্যা ৫০-৫৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ২৫-৩০ মিলিয়ন।

হযরত ওসমান (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের যে দলটি সর্বপ্রথম হাবশায় হিজরত করে তারা প্রথম দশ বছর অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে হাবশায় ইসলাম প্রচার করেন। মুসলমানদের চরিত্র, তাদের আচার-ব্যবহার এবং দৃঢ় মনোবলের সাথে পরিচিত হয়ে স্থানীয় অধিবাসীরাও ধীরে ধীরে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, আবিসিনিয়ায় প্রথম যিনি হিজরত করেন তার নাম মুহাম্মাদ। তিনি নবী করীম (স)-এর চাচাত ভাই জাফর বিন আবী তালিব-এর ছেলে।

হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের প্রতি রাসূলে করীম (স)-এর উপদেশ ছিল, "হাবশায় ইসলামের ভীত মজবুত না হওয়া পর্যন্ত হাবশা ত্যাগ করা যাবে না। তিনি এ দেশটিকে মুসলমানদের দ্বিতীয় আবাসভূমি হিসেবে অভিহিত করেন। হাবশা আজ ২৫-৩০ মিলিয়ন মুসলমানের স্বদেশভূমি। সেদিনের হাবশা আজকের ইথিওপিয়ায় মুসলমানরা একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

হাজার বছর ধরে ইথিওপিয়ার রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, ইথিওপিয়ান মুসলমানরা কখনও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে না। তাই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনপদগুলোকে কিছুটা স্বায়ত্বশাসন দিয়েছে। অথচ বৈদেশিক শক্তির সহযোগিতায় স্থানীয় খৃস্টানরা বহুবার মুসলিম জনপদগুলোতে আক্রমণ করে। এতে দেশটাতে সামাজিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

ইথিওপীয় সম্রাট হাইলে সেলাসীর শাসনামল ছিল অত্যাচার, নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতার প্রতীক। হাইলে সেলাসীর শাসনাবসানে রুশপন্থী কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে। কমিউনিস্ট শাসনামলে মসজিদের সম্পত্তিকে জাতীয়করণ করে মসজিদের নিয়ন্ত্রণভার সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৪ সালে রুশপন্থী কমিউনিস্ট সরকার মুসলমানদেরকে সামন্তবাদী বুর্জোয়া আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে চরম নিপীড়ন চালায়। কমিউনিস্ট শাসকরা মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নেয়। ১৯৭৮ সালে রাজধানী আদ্দিস আবাবার নিউমার্কেট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদে ধর্মীয় আলোচনা চলাকালে কমিউনিস্ট সৈন্যরা জোরপূর্বক মসজিদে প্রবেশ করে উপস্থিত মুসল্লীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। এতে

www.pathagar.com

২০ জন মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। সৈন্যদের পৈশাচিকতা এখানেই থেমে যায়নি বরং মসজিদে ইসলামী জলসা করার অনুমতি দেয়ার অপরাধে ইমাম সাহেবের দু' ছেলেকে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করা হয়। মুসলমানদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করার লক্ষে মুসলমানদের লাশগুলোকে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়। এ লাশগুলো ছিল কমিউনিস্টদের লাল সন্ত্রাসের দলীল।

বিগত ৩০ বছর ধরে বিভিন্নভাবে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। খৃস্টান এন. জি. ও গুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পাশাপাশি মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সরকারও কৃষক পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষিজীবী মুসলমানদেরকে পরিকল্পিতভাবে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করছে। খৃস্টান এনজিও এবং সরকারের ইসলাম বিরোধী কর্মসূচির ফলে অনেক দরিদ্র মুসলমান যেমন ধর্মান্তরিত হচ্ছে তেমনি আবার অনেকের মধ্যে ইসলাম বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হচ্ছে। ফলে অনেক মুসলমান তাদের সন্তানদেরকে কুরআনিক স্কুল, মাদরাসা ও মসজিদে না পাঠিয়ে খৃস্টানদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পাঠাচ্ছে। ফলে মুসলিম শিশু কিশোররা খৃস্টধর্মে দীক্ষিত না হলেও স্বধর্ম সম্পর্কে তাদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে।

সরকারের এ নির্যাতন ও দমননীতির মধ্যেও মুসলমানরা তাদের স্ব উদ্যোগে সনাতন পদ্ধতিতে ইসলামী শিক্ষা অব্যাহত রেখেছে। মুসলমানদের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে ইসলামিক সেন্টার ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সমস্ত সেন্টার ও মক্তবগুলোতে মুসলিম শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়। সরকারের ইসলাম বিরোধী শিক্ষানীতির কারণে মুসলমানদের শিক্ষার হার খুবই কম। বর্তমানে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৫%-১০% জন। উল্লেখ্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৫%। সেনাবাহিনীতেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।

মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৭৪ সালে Majlis al A'ala Supreme Council for Islamic Affairs of Ethiopia গঠন করা হয়। কিন্তু তৎকালীন সামরিক জান্তা সংস্থাটিকে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ দেয়নি। এমনকি সংস্থাটিকে সরকারী অনুমোদনও দেয়া হয়নি। ১৯৯১ সালে সামরিক জান্তার বিদায়ের পর নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের

www.pathagar.com

পর সকল ধর্মের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য "A Representative of all ethnic groups" নামে একটি "Supreme council" গঠন করেছে। সংস্থাটি নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করলে মুসলমানদের স্বার্থ কিছুটা হলেও সংরক্ষিত হবে বলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ মনে করেন। এ সমস্ত কার্যক্রমগুলো হলো ঃ

ক. সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

খ. মুসলমানদের বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া।

গ. মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া।

ঘ. ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে ধর্মীয় বিধিনিষেধ রহিত করা।

ঙ. আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগের অনুমতি দেয়া।

অনুন্নত ও অনগ্রসর মুসলিম জনপদগুলোতে বসবাসকারী দরিদ্র মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এন. জি. ও কর্তৃক নিম্নোক্ত সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

কর্মসূচি

ক. ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা।

খ. ইয়াতিমখানা স্থাপন করা।

গ. বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা।

ঘ. স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করা।

ঙ. বৃত্তিমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

চ. মহিলাদের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ছ. কৃষি প্রকল্প চালু করা।

জ. মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষে কুটির শিল্প স্থাপন করা।

এ সমস্ত কর্মসূচি আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠী আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে এবং দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারবে।

www.pathagar.com

ইথিওপিয়ার বর্তমান সচেতন মুসলিম জনগোষ্ঠী আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, ভবিষ্যত হাবশা বা ইথিওপিয়ায় ইসলামের বিজয়ের জন্য আরো নিবিড়ভাবে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে হবে। তাই আমরা বলতে পারি ঃ

The Habsha land will once again prove to be a country of peace and prosperity where the Muslims will play the historic role of acquiring the sell pride to work on an aqual footing with other religious groups.

অর্থ ঃ "মুসলমানরা যখন আবার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে তখন হাবসা আবার শান্তি ও সমৃদ্ধির দেশে পরিণত হবে।"

আমরা ইথিওপিয়া বা হাবশার মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. মোস্তফা চরিত–মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

২. সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রকাশনায়–বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর– ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

৪. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), এপ্রিল, ১৯৯৬।

www.pathagar.com

পোল্যান্ডে ইসলাম ঃ একটি সমীক্ষা

মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে মানুষকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং আর্ত-পীড়িত মানবতার মুক্তির লক্ষে আরবের মরুভূমিতে ইসলামের আগমন ঘটে। ইসলাম সাম্য ও শান্তির ধর্ম। অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম এক প্রচণ্ড বিভীষিকা। তাই ইসলামের আগমনের ফলে শত নির্যাতন আর নীপিড়নকে উপেক্ষা করে অধিকার হারা বঞ্চিত মানুষ দাসত্বের শৃঙ্খল ভেদ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সমস্ত নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষ ইসলামের সংস্পর্শে এসে অধিকারহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে।

ইসলামের এ সুমহান আদর্শের কথা এবং অধিকারহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বিদ্যুৎ বেগে আরবের মরুভূমি থেকে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে পথহারা মানুষ পথের সন্ধান পেলো। এমনি এক পর্যায়ে ইসলাম পোলিশ জ নগণের হৃদয়ের কড়া ধরে নাড়া দেয়। জেগে ওঠে ঘুমন্ত পোলিশ জনগণ। ধীরে ধীরে তারা ইসলামের আলোকে আলোকিত হতে থাকে। এভাবেই পোল্যান্ডে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়।

কবে, কখন এবং কিভাবে পোল্যান্ডে ইসলামের আগমন ঘটে তার কোনো সঠিক তথ্য জানা যায়নি। তবে ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পোল্যান্ডে সর্বপ্রথম ইসলামের আগমন ঘটে। ঠিক এ সময়ে মঙ্গোলরা পোল্যাণ্ড দখল করে নেয়। কালক্রমে মঙ্গোলরা বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যও দখল করে নেয় এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে মুসলিম জনপদসমূহ শাসন করে। এ সময় তারা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। মঙ্গোলদের ইসলাম গ্রহণের ফলে ইউরোপে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ প্রশস্ত হয়। তাইতো বলা হয় ঃ

> "They (Mongols) themselves became the cause of expansion of Islam in Europe."

অর্থ ঃ "ইউরোপে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতিতে তারা (মঙ্গোল) নিজেদেরকে নিয়োজিত করে।"

www.pathagar.com

১৫৭৭ সালে ওসমানীয় খেলাফতের শাসনামলে খলীফা ও পোলিশ রাজার সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী পোল্যান্ড খলীফার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায় এবং বিনিময়ে পোল্যান্ডে দ্রুত ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ঃ

ক. পোলিশ ভাষায় ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ।

খ. ব্যাপকভাবে ইসলামী সাহিত্য বিতরন।

গ. মুসলমানরা পুরোপুরি ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ লাভ করে।

ঘ. পোল্যাণ্ড সোভিয়েত মুসলিম শরণার্থীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হওয়া।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পোল্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাজী জার্মানীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। ফলে মুসলমানরা চরম নির্যাতন আর নিপীড়নের শিকার হয়। এ সময়টা ছিল পোলিশ মুসলমানদের জীবনের একটি কালো অধ্যায়। মুসলমানরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং নাজী জার্মানীর হাত থেকে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। হাজার হাজার মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত হয়। অথচ স্বাধীনতা উত্তর পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। শুধু নির্যাতনই নয় বরং মুসলমানরা যাতে ঐক্যবদ্ধ একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে না পারে সেজন্য কমিউনিস্ট সরকার মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় দমন অভিযান চালায়। কমিউনিস্টদের মুসলিম বিরোধী এ দমন অভিযান পরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সকল প্রকার সযোগিতা করে। এভাবেই সমাজতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডে মুসলিম নিধনের নতুন মাত্রা সংযোজন হয়।

পোল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক পরিসংখ্যান জানা যায়নি। তবে Association of East European Muslims এর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পোল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল এক থেকে দেড় লাখ। একজন পোলিশ মুসলিম নেতা এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, হিটলারের জার্মানী এবং লেলিনের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রেড আর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হাজার হাজার মুসলমান নিহত হয়। তিনি আরো বলেন যে, সোভিয়েত রেড আর্মী পোল্যান্ড দখল করার পর পোলিশ মুসলমানরা নির্মম গণহত্যার শিকার

www.pathagar.com

হয়। এ নির্মম নিধনযজ্ঞের ফলে পোল্যান্ডে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। বর্তমানে পোল্যাণ্ডে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ১০ হাজার। এ সংখ্যার মধ্যে অতি সাম্প্রতিককালে ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী পোলিশ মুসলমানরাও রয়েছে। মুসলমানদের বর্তমান সংখ্যা থেকে জানা যায় যে, পোল্যান্ডকে মুসলিম শূন্য করার জন্য সেখানে পাইকারীভাবে গণহত্যা চালানো হয়।

পোল্যান্ডের Biavostok শহরে মুসলমানদের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উসমানীয় খেলাফতকালে এ শহরে বড় বড় দুটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কালের স্বাক্ষী হিসেবে মসজিদ দুটি আজো Biavostok শহরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ শহরেই মুসলমানদের একটি বড় গোরস্তান রয়েছে। গাদানস্ক (Gdansk) বন্দরে মুসলমানদের সংখ্যা ২ হাজার। মুসলমানরা তাদের আনুষ্ঠানিক ইবাদাত নামায আদায়ের জন্য অতিসম্প্রতি গাদানস্কে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেছে। আগামী দিনে এ মসজিদটি গাদানস্কের মুসলমানদের সকল প্রকার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কমিউনিস্ট শাসনামলে মুসলমানরা কোনো প্রকার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারত না। এমনকি সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে পোলিশ মুসলমানরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে পারিবারিক পরিমণ্ডলেও শরয়ী নিয়মনীতি পালন করতে পারতো না। ফলে মুসলমানরা ইসলামী আদর্শ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যায় এবং নতুন প্রজন্ম ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। এভাবেই পোলিশ মুসলমানদের ধর্মীয় বন্ধন শিথীল হয়ে পড়ে এবং তারা খৃস্টানদের চালচলন ও আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

পোলিশ মুসলমানদেরকে ইতিহাসের এ দুঃখজনক অবস্থা (Woeful plight) থেকে উদ্ধার করতে হলে দেশের আলেম, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাবিদদের সময়োচিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে পোল্যান্ডে বেশ কিছু ইসলামী সংগঠন ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। এ সমস্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে The Supreme Islamic Assembly অন্যতম। এ সংগঠনটি ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো ঃ

১. পোলিশ ভাষায় ইসলামী পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণ।

২. ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ম্যাগাজিন প্রকাশ ও বিতরণ।

www.pathagar.com

৩. মসজিদ ও মাদরাসা (দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠা।

৪. ইসলামী পাঠাগার ও ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা।

৫. শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

উপরোক্ত কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে The Supreme Islamic Assembly পোল্যান্ডে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আদর্শিক অনুভূতি জাগ্রত রাখতে সক্ষম হয়েছে। পোল্যান্ডে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য রাবেতা আলমে ইসলামীসহ আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনগুলোর এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

আগামী দিনের পোলিশ জনগণকে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে পোলিশ ভাষায় ব্যাপকভাবে ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ও বিতরণ করা, পোলিশ ভাষায় কুরআনের তাফসীর ও হাদীস প্রকাশ ও বিতরণ করা, দীনী শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, বিদেশে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে ছাত্রবৃত্তি চালু করা, সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত জাতি গঠনের লক্ষে হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা, অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পোলিশ মুসলমানদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে ঋণদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাসহ বিভিন্নমুখি কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমরা আশা করবো আগামী দিনের পোল্যান্ডে ইসলামকে একটি অপ্রতিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনগুলো সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারিত করবে। আমরা পোল্যান্ডের মুসলমানদের সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

আলবেনিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

আলবেনিয়া পূর্ব ইউরোপের একটি দেশ। মোট জনসংখ্যার ৭০-৭৫ ভাগ মুসলমান। পূর্ব ইউরোপের একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ আলবেনিয়া। অথচ বিগত ৫০ বছর দেশটি মুসলিম বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিল। ১১ হাজার ১০০ বর্গমাইলের এ দেশটি এ সময় কমিউনিস্ট শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল।

অনুসন্ধিৎসু ও উৎসাহী মন নিয়ে ইতিহাসের অমলিন পাতাগুলো উল্টাতে গিয়ে দেখা গেলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে মেডিটারিয়ান উপকূল দিয়ে ইসলাম আলবেনিয়ায় প্রবেশ করে। ১২৯০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত উসমানীয় তুর্কী সালতানাত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের সুবিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এ সময় পূর্ব ইউরোপের সকল বলকান রাষ্ট্র উসমানীয় খেলাফতের আন্তর্ভুক্ত ছিল। আলবেনিয়াও একটি বলকান রাষ্ট্র হিসেবে এ সময় তুর্কী উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৪২৩ সালে তুর্কী সুলতান মুরাদ আলবেনিয়া সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেয় এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত দেশটি তুর্কী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১২ সালে আলবেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ১৯২০ সালে আলবেনিয়াকে একটি স্বাধীন রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

আলবেনিয়ার উত্তরে মন্টেনেগরো, দক্ষিণে গ্রীস, পূর্বে মেসিডোনিয়া ও কসোভো এবং পশ্চিমে অ্যাডরিয়াটিক ও আইওনিয়ান সাগর অবস্থিত। আলবেনিয়ার বর্তমান লোকসংখ্যা ৩.৫ মিলিয়ন। আলবেনিয়ায় বর্তমানে প্রধান তিনটি ধর্মের লোক বাস করে। এদের মধ্যে মুসলমান ৭৫%, অর্থডক্স খৃস্টান ১৫% এবং ক্যাথলিক ১০%।

বর্তমানে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আলবেনীয় ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ Dr. S. Sophic Suku-এর মতে, আলবেনিয়ার আদিবাসীরা পৌত্তলিক ছিল। এ পৌত্তলিক জাতির একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। Dr. Sophic Suku-এর মতে, তারা একসময় একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তিনি বলেন ঃ

"They (Albanians) are an ancient people. Most scholars agree they are Illyrians. The Illyrians

www.pathagar.com

founded an immense empireextending from Epirus in what is now north-western Greece to the Danube and the Black sea. They fought with Greck valour against the Romans for more than a century. Eventually the Romans conquered the whole of Illyria."

অর্থ ঃ "তারা (আলবেনীয়) ছিল প্রাচীন সভ্য জাতি। অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে তারা ছিল পৌত্তলিক। এ সময় তারা ইরিপাস থেকে ডানবি ও ব্ল্যাক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যা বর্তমানে উত্তর পশ্চিম গ্রীস নামে পরিচিত। তারা সাহসী গ্রীক জাতির সাথে মিলিত হয়ে শত বছরেরও অধিক সময় ধরে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু অবশেষে রোমানরা এ বিশাল সাম্রাজ্যটি দখল করে নেয়।"

অর্থডক্স খৃস্টানরা জোরপূর্বক আলবেনীয় জনগণকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু, অধিকাংশ আলবেনীয় ইসলামের সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশ্য বর্তমানে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের ধারণা আলবেনিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার পর তুর্কী শাসকরা জোরপূর্বক আলবেনীয়দেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে। কিন্তু ইতিহাস এ অপপ্রচারকে প্রত্যাখ্যান করে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তুর্কীরা যখন আলবেনিয়া দখল করে তখন সেখানে মসজিদ ও মুসলমানদের দেখে তুর্কী সৈন্যরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। কারণ আলবেনিয়া তুর্কী সালতানাতের অধীনে আসার পূর্বে সেখানকার মুসলমানদের সম্পর্কে তুর্কী মুসলমানদের কোনো ধারণাই ছিল না। সুতরাং ইতিহাস একথা প্রমাণ করে না যে, তুর্কী শাসকরা জোরপূর্বক আলবেনীয়দের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে। বরং ইতিহাস একথারই সাক্ষ দেয় সে, তুর্কীরা আলবেনিয়ায় আসার পূর্বেই ইসলাম আলবেনিয়ায় আগমন করে।

তুর্কী উসমানীয় শাসনামলে আলবেনিয়া

পঞ্চদশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মোট ৪৫০ বছর আলবেনিয়া তুর্কী উসমানীয় সালতানাতের শাসনাধীন ছিল। এ সময় আলবেনিয়ার অধিকাংশ লোক ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। অবশ্য জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি অংশ অর্থডক্স ও

www.pathagar.com

ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মে অবিচল থাকে। উসমানীয় খেলাফতের সময় আলবেনিয়ায় স্ট্যাস্টসম্যান সুলভ নেতৃত্ব, বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও বহু সংস্কারকের জন্ম হয়। এ সময় আলবেনীয় সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে ইসলামী সংস্কৃতিতে রূপান্তর করা হয়। ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে পরিবর্তিত সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ সময় আরবী, তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অনুবাদ করা হয়। এ সমস্ত ধর্মীয় পুস্তকগুলোতে আল্লাহর একত্ববাদ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়গুলোর বিশদ আলোচনা ছাড়াও ইসলামের বিচার ব্যবস্থা এবং দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৪৫০ বছর দেশটি শাসনের পর উসমানীয় সালতানাত আলবেনিয়ার সাথে একটি সামরিক চুক্তির মাধ্যমে দেশটির স্বায়ত্বশাসন প্রদান করে। কিন্তু সার্বরা এ চুক্তির বিরোধিতা করে। রাশিয়া এবং ফ্রান্স সার্বীয়দের সমর্থন করে। অপরদিকে প্রতিবেশি রাষ্ট্র গ্রীসও একটি স্বাধীন আলবেনিয়ার উত্থানকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। রাশিয়া, ফ্রান্স ও গ্রীসের মদদে ১৯১২–১৯১৩ সালে সার্বরা পোড়ামাটি নীতি (Scorched earth policy) গ্রহণ করে। এর ফলে আলবেনিয়ায় গণহত্যা শুরু হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৩ সালের ৩০ মে লন্ডন চুক্তির ভিত্তিতে আলবেনিয়াকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী নতুন দেশটির সীমানা চিহ্নিত করার জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। আজকের আলবেনিয়ার রাষ্ট্রীয় সীমানা এ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর Ahmed Bey zog আলবেনিয়ার প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯২০ সালে তিনি আলবেনিয়াকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ১৯২৪ সালে তিনি দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষমতার মোহ তাকে মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। তাই নিজের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য ১৯২৮ সালে তিনি নিজেকে King zog-1 হিসেবে ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৩৯ সালের ৭ এপ্রিল ইতালীর ফ্যাসিস্ট শাসক মুসেলিনী আলবেনিয়া দখল করে নেয়। King zog-1 দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। King zog পালিয়ে যাবার পর Italian King vittorio Emmanuel-111 নিজেকে আলবেনিয়ার নতুন King হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৪১ সালে ইতালীর শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করার পর হিটলারের জার্মানী আলবেনিয়া দখল করে নেয় এবং ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

www.pathagar.com

দেশটি শাসন করে। ১৯৪৬ সালের ১১ জানুয়ারী কমিউনিস্ট নেতা আনোয়ার হোজ্জা (Enver Hoxha) আলবেনিয়াকে People's Republic of Albania হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তিনি দেশের রাষ্ট্র প্রধানের পদটি অলংকৃত করেন। আনোয়ার হোজ্জার নেতৃত্বাধীন Labour party (Known as Communist Party) দেশে সরকার গঠন করার পর দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করে।

আনোয়ার হোজ্জার নেতৃত্বাধীন Albanian Labour Party ক্ষমতা দখল করার সময় দেশে অসংখ্য মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট সরকার এক নির্বাহী আদেশে মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়। ফলে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবেই আলবেনিয়ায় কমিউনিস্ট শাসকরা একটি জাতির সম্ভাবনাময় নতুন প্রজন্মকে স্বকীয় আদর্শ ও তাহযীব-তমদ্দুন থেকে কৌশলে দূরে সরিয়ে রাখে।

কমিউনিস্ট শাসনামলে আলবেনিয়া

উসমানিয়া সালতানাতের পতনের পর আলবেনিয়ায় ইসলামের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং কমিউনিস্টদের উত্থান শুরু হয়। আনোয়ার হোজ্জার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দেশটির নাম পরিবর্তন করে Albanian People's Socialist Republic নামকরণ করা হয়। কমিউনিস্টরা ক্ষমতা গ্রহণ করার পরই ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়। দেশে একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েম হয়। ফলে দেশটি সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এভাবেই দেশটি একটি বিরাট বন্দীশিবির বা Concentration camp-এ পরিণত হয়।

আনোয়ার হোজ্জার নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট শাসনামলে দেশের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চালচিত্র নিম্নে পেশ করা হলো।

ধর্মীয় অবস্থা

কমিউনিস্ট শাসনের শুরুতেই সরকার জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। এ সময় অনেক মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়। আবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদ ও ধর্মীয় উপাসনালয়কে Ware Houses, Stables, Museums ও Art Galleries-এ রূপান্তরিত করা হয়। ধর্মীয় নেতাদেরকে হত্যা, গ্রেফতার, নির্যাতনের শিকার হতে হয়। গ্রেফতারকৃত ধর্মীয় নেতাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া

www.pathagar.com

হয়। কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ধর্মীয় নেতাদের অধিকাংশই কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। সরকার সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং ১৯৬৪ সালে রাজধানী তিরানায় অবস্থিত ইসলামী কলেজও বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করেই সরকার ক্ষান্ত হয়নি বরং অনেক আরবী ও ইসলামী পাণ্ডুলিপিও ধ্বংস করে দেয়া হয়। দেশ থেকে ইসলাম নির্মূলের এ কার্যক্রম আনোয়ার হোজ্জার পুরো শাসনামলে অব্যাহত থাকে।

আনোয়ার হোজ্জা একজন মার্ক্সবাদী নেতা ছিলেন। তিনি আলবেনিয়াকে একটি মার্ক্সবাদী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হলে তিনি এ সাংস্কৃতিক বিপ্লব দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আলোকে তিনি কঠোর নীতি অবলম্বন করেন এবং তার গৃহীত কর্মসূচির বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের সমালোচনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইসলামী অনুশাসন না মানার জন্য জনগণকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়। ১৯৬৭ সালে আনোয়ার হোজ্জা দেশটিকে একটি নাস্তিক (Atheist) রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সকল প্রকার ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে নিষিদ্ধ করা হয়। যারা এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করবে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়। মসজিদগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ইমাম ও ইসলামী নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়।

উসমানীয় খেলাফতের পতনের পর এবং আনোয়ার হোজ্জার নেতৃত্বে কঠোর মার্ক্সবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার পর আলবেনিয়া থেকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। আনোয়ার হোজ্জার ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের ফলে উসমানীয় খেলাফতের অনেক ইসলামী নিদর্শন আলবেনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য নিচিহ্নি হয়ে যায়। যে সকল প্রতিষ্ঠান এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো আনোয়ার হোজ্জা ও তার শাসনামলের নির্মম সাক্ষ্য বহন করছে। বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবীকে এ সময় অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয় এবং অনেককে গুম করা হয়। Peter prifti-এর গ্রন্থে এ সময়ের বহু নির্যাতনের বিবরণ রয়েছে। তিনি লিখেন ঃ

> "Socialist Albania since 1944 has cited many harrowing examples of the ruthless repression that had followed the Marxist victory in Albania. Notable

Muslim leaders, such as Baba Fajo and Baba Fozo were murdered in cold blood in 1947. Several Muslim Preachers simply disappeared in mysterious circumstances."

অর্থ ঃ "সমাজতান্ত্রিক আলবেনিয়ায় মার্ক্সীয় দর্শনের বিজয়ের জন্য ১৯৪৪ সাল থেকে অনেক হৃদয় বিদারক ও নির্মম নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে যা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, প্রখ্যাত মুসলিম নেতা বাবা ফেজু ও বাবা ফুজুকে ১৯৪৭ সালে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এমনি রহস্যময় পরিস্থিতিতে অনেক দায়ী ইলাল্লাহও (দীন প্রচারক) অদৃশ্য হয়ে যান যাদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।"

১৯৬৭ সালে আলবেনিয়াকে একটি নাস্তিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার পর মসজিদ, মন্দির ও গীর্জাসহ মোট ২১৬৯টি উপাসনালয়কে ধ্বংস করা হয় এবং ২০০ ধর্মীয় নেতাকে বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে পাঠানো হয়। কেউ ধর্মীয় পোশাক পরিধান করলে তাকে ১০ বছর জেল দেয়া হতো। এ সময় অনেক মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করা হয়, বড় মসজিদ-গুলোকে জিমনেসিয়ামে পরিণত করা হয় এবং ছোট মসজিদগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। কমিউনিস্ট শাসনের ৫০০ বছর পূর্বে উসমানীয় খেলাফতকালে Adriatic সাগরের পাদদেশে নির্মিত ঐতিহাসিক "King's Mosque"-কে প্রেক্ষাগৃহে রূপান্তর করা হয়। মসজিদকে প্রেক্ষাগৃহে রূপান্তর করার পূর্বে এর সুউচ্চ মিনার থেকে আযানের সুমধুর ধ্বনী ভেসে আসতো—আর এখন ভেসে আসে নতর্কীদের বেলেল্লাপনার আওয়াজ। ইসলাম আর মুসলমানদের প্রতি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টদের এ ঘৃণ্য আচরণের প্রতিবাদ করার ভাষা আলবেনিয়াবাসী হারিয়ে ফেলেছিল। আলবেনিয়ায় সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার পর শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তিদের ধর্মীয় নিয়মানুযায়ী দাফন করার সীমিত অনুমতি দেয়া হয়। সকল কমিউনিস্ট সুপারভাইজারদের ঘুমিয়ে পড়ার পর মধ্যরাতে এ দাফনকর্ম সমাধা করতে হতো। এ নিয়ম লংঘন করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হতো। এ সময় যে সকল প্রখ্যাত মুসলিম নেতাকে বিনাবিচারে কারাগারে আটক রাখা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Kotchi, Faek khoja, Hafiz sadek Roya, Musa Qarbuti এবং Ali Saraya। বিগত ৫০ বছর যাবত মার্ক্সীয় শাসনের যাতাকলে আলবেনিয়া থেকে ইসলাম,

www.pathagar.com

মুসলমান, মসজিদ, ইবাদাত ইত্যাদি পরিভাষাসহ সকল ইসলামী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আলবেনিয়ার বর্তমান মুসলমানরা ইসলাম সম্পর্কে খুব কমই জানে। বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে ইসলাম একটি ভীতিকর বিষয়।

আনোয়ার হোজ্জার কমিউনিস্ট শাসন ছিল লেনিন এবং স্ট্যালিনের শাসনের চেয়েও কঠোর, নির্মম ও নিষ্ঠুরতায় ভরপুর। এ সময় গোটা দেশটাকে একটি বড় কারাগারে পরিণত করা হয়। ইচ্ছা করলেও কারো পক্ষে এ কারাগারের বাইরে জীবন যাপন করা সম্ভব হতো না। আনোয়ার হোজ্জার এ নির্দয় শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে দেশ থেকে মানবতা আর মনুষ্যত্ব বিদায় নেয়। সারা দেশটিতে মিউজিয়ামের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। এখানে কেউ কথা বলে না শুধু তাকিয়ে থাকে। মনে হয় যেন মানুষগুলোকে মমি করে রাখা হয়েছে। এভাবে আনোয়ার হোজ্জার কমিউনিস্ট শাসন দেশের সমস্ত জনগণকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকরুদ্ধ করে ফেলে। ফলে এ সময় সারা দেশে কবরের নীরবতা বিরাজ করছিল। শুধু আনোয়ার হোজ্জার শাসনামলেই নয় সকল কমিউনিস্ট শাসিত দেশেই মুক্তিকামী মানুষের কণ্ঠকে এভাবে নীরব ও নিস্তব্ধ করে দেয়া হয়। দীর্ঘ পৌনে এক শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ববাসী এ নির্মম নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করে। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে কমিউনিস্ট শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত নির্যাতিত নির্বাক মানুষগুলোর পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও বেদনার প্রথম সফল বিস্ফোরণ ঘটে। গাদানস্ক-এর কয়লা খনীতে দ্রুত বিদ্রোহের এ আগুন ছড়িয়ে পড়ে সকল কমিউনিস্ট শাসিত দেশসমূহে। মুক্তিকামী মানুষ বেরিয়ে আসে লৌহ কপাটের অন্তরাল থেকে। মানুষের রক্ত ও বিপ্লবের লেলিহান শিখা লৌহ কপাটগুলো এক এক করে খুলে ফেলে। পতন ঘটে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের। এখন যা টিকে আছে তা সমাজতন্ত্রের 'ফসিল'। আলবেনিয়ায় ও এ বিদ্রোহের প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। হোজ্জার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি নিক্ষিপ্ত হয় ডাস্টবিনে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে আধুনিক আলবেনিয়ায়। আলবেনিয়ার জনগণ আজ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করছে। মুসলিম বিশ্বের সাথে আবার তাদের যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়েছে। আলবেনিয়ায় মসজিদের দরজাগুলো আবার খুলে দেয়া হয়েছে। মানুষ প্রাণভরে আজ আল্লাহর ইবাদাত করছে। এভাবেই শত নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতার অবসান ঘটিয়ে আলবেনিয়ার মুসলমানরা আবার ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে।

www.pathagar.com

আনোয়ার হোক্সার কমিউনিস্ট শাসনামলে দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিল। তখন জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৮.৫ মার্কিন ডলার। মন্ত্রীদের বেতন ছিল ২০০ মার্কিন ডলার। দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০% বেকার ছিল। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ৩.৫ মিলিয়ন। কমিউনিস্ট শাসন উত্তর বর্তমান সরকার দেশ থেকে বেকারত্ব দূর করার চেষ্টা করছে। বিগত সরকারের আমলে সম্পত্তিতে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকার না করায় বর্তমানে ব্যক্তি পুঁজির অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে দারিদ্র বিমোচনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। দেশটিতে বর্তমানে অন্ন ও বস্ত্রের তীব্র সংকট বিরাজ করছে। শুধুমাত্র অন্ন ও বস্ত্রের ক্ষেত্রেই নয় বরং সকল ক্ষেত্রেই এ সংকট বিরাজমান। প্রকৃতপক্ষে দেশের সমস্ত জনগণ জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাই ভোগ করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। অর্থের অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দরজা-জানালাও লাগানো সম্ভব হয়নি। এমনকি বিদ্যালয়গুলোতে ব্লাকবোর্ডের ব্যবস্থা করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অপরদিকে দক্ষ লোকের অভাবে চিকিৎসা সেবা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। আর্থিক সংকটের এ দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে আলবেনীয়দের রক্ষা করতে হলে দেশটিতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই একটি জাতিকে অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

কমিউনিস্ট শাসন উত্তর আলবেনিয়া

কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের পর পর বহু খৃস্টান এন. জি. ও এবং খৃস্টান মিশনারী সংস্থা ভেটিক্যান, ইউরোপ, গ্রীস ও ইউ. এস. এ থেকে আলবেনিয়ায় দ্রুত আগমন করে। বিভিন্নমুখী সাহায্যের ছদ্মাবরণে এরা উদীয়মান যুবশক্তিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। বৈষয়িক সুযোগ সুবিধার লোভে এরা দলে দলে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করছে। খৃস্টান মিশনারীগুলো এ ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর। কমিউনিস্ট শাসনামলে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় মুসলিম যুবশক্তি ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। ফলে তাদের ধর্মান্তরিত করা খুবই সহজ হয়ে পড়েছে।

মাদার তেরেসা তাঁর জীবদ্দশায়ই আলবেনিয়ায় সাহায্যের ছদ্মাবরণে ধর্মান্তরকরণ কর্মসূচি অত্যন্ত সুকৌশলে বাস্তবায়ন শুরু করেছিলেন। আলবেনিয়ার বিভিন্ন শহরে তিনি সেলাই প্রকল্প চালু করেন। এ সমস্ত

www.pathagar.com

প্রকল্পগুলোতে সাধারণত অভাবী লোকদেরই বেশি আগমন ঘটে থাকে। এরা অর্থ ও বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা পেলে সহজেই ধর্মান্তরিত হয়। ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রমিকদের গলায় বর্তমানেও খৃস্টধর্মের ক্রুশচিহ্ন শোভা পাচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এর অর্থ বুঝে না। এ ব্যাপারে আলবেনিয়ার গ্র্যান্ড মুফতির উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"Many christian missionaries are comming from all over the world, which have been trying to convert people in different riligions and paying a lot of money to the people, whom this type of money entices them due to poverty."

অর্থ ঃ "সারা দুনিয়া থেকে অনেক খৃস্টান মিশনারীরা এখানে আসছে এবং তারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে বহু অর্থের বিনিময়ে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করছে। দরিদ্রতাই এ সমস্ত লোকদেরকে অর্থের লোভে ধর্মান্তরিত হতে প্রলুব্ধ করছে।"

বর্তমান সরকারের ধর্মবিষয়ক দায়িত্বশীল Mr. Bardlyl Fico-এর মতে আলবেনিয়ায় বর্তমানে ২০টি ইসলামিক সংগঠন এবং ১০০টি ধর্মীয় সমিতি রয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে বহু খৃস্টান মিশনারী সংস্থা, বাহাই, কাদিয়ানী, লুথারিয়ান, চার্চ, প্রোটেস্ট্যান্ট, ইভ্যাঞ্জেলিস্ট, জোহাভা প্রভৃতি গ্রুপ আলবেনিয়ায় মিশনারী কাজ করছে। এ সমস্ত সংস্থা ও গ্রুপগুলো কমিউনিস্ট শাসনাবসানের পর আলবেনিয়ায় আগমন করে। খৃস্টান মিশনারী সংস্থাগুলো বর্তমানে আলবেনিয়ায় হাসপাতাল ও পলিক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করছে। তারা কঠিন এবং জটিল রোগীদের উন্নততর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিজ ব্যয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠাচ্ছে। এছাড়াও নতুন প্রজন্মকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে তাদেরকে খৃস্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট করছে। Mr. Bardlyl Fico বলেন ঃ

"The christian organisations have opend hospitals, Polyclinics and sent some people for trcatment in Europe."

অর্থ ঃ "খৃস্টান সংস্থাগুলো অনেক হাসপাতাল ও পলিক্লিনিক স্থাপন করেছে এবং জটিল রোগীদের উত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সংস্থার ব্যয়ে তাদেরকে ইউরোপে পাঠানো হচ্ছে।"

www.pathagar.com

খৃস্টান মিশনারীদের এ অপতৎপরতার মুকাবিলায় ইসলামী দেশ ও সংস্থাগুলোর এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে Mr. Fico মনে করেন। তিনি বলেন ঃ

"I think it is the duty of the Islamic countries to move more closer to the Albanian Muslims, especially at this hard moment."

অর্থ ঃ "আলবেনিয়ার মুসলমানদের বর্তমান কঠিন সময়ে তাদের সহযোগিতা করার লক্ষে ইসলামী দেশগুলোকে আলবেনীয়দের আরো সান্নিধ্যে আসা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।"

কমিউনিস্ট শাসনামলে জন্মগ্রহণকারী বর্তমান প্রজন্ম ইসলাম ও খৃস্টধর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করতে পারছে না। কারণ কমিউনিস্ট শাসনামলে ইসলাম সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ ছিল না। বর্তমানে খৃস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার মোকাবিলায় মুসলিম যুবশক্তিকে রক্ষা করতে হলে ব্যাপকভাবে কুরআন ও হাদীসের চর্চা করা প্রয়োজন বলে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা মনে করছেন। শায়খ শাবরী নামক একজন প্রখ্যাত মুসলিম বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে, আলবেনিয়ার যুব শক্তিকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হলে দেশে ব্যাপকভাবে ইসলামী স্কুল স্থাপন করা প্রয়োজন।

আলবেনিয়ার বর্তমান শাসক দেশের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষে মুক্তবাজার অর্থনীতি কায়েম করছেন। মুক্তবাজার অর্থনীতির সুযোগে অনেক ইউরোপীয় দেশ আলবেনিয়ার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছে। কিন্তু তারা চায় না যে, আলবেনিয়ায় অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরে আসুক। বরং তাদের উদ্দেশ্য আলবেনিয়া একটি ভিক্ষুকের দেশে পরিণত হোক যাতে দেশটি কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। আলবেনিয়াকে এ কঠিন অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুসলিম দেশগুলোর দ্রুত এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে আলবেনিয়ার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী মনে করছেন। বিগত ৫০ বছর যাবত মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দায়শোধ করার লক্ষে বর্তমান সরকার মুসলিম বিশ্বের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৯১ সালে আলবেনিয়া সরকার প্রধান জনাব রমিজ আলিয়া সউদী আরবের সাথে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯৯১ সালের

www.pathagar.com

মে মাসে রাবেতা আলমে ইসলামীর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ আবদুল্লাহ বিন ওমর নাসীফ-এর নেতৃত্বে ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আলবেনিয়া সফর করেন। প্রতিনিধিদলে উল্লেখযোগ্য সদস্যরা হলেন ঃ

১. রাষ্ট্রদূত ইব্রাহীম বকর, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ওআইসি

২. ড. ফরিদ ইয়াসিন কুরাইশী, সুপারভাইজার জেনারেল (অব.), আই আই আর ও

৩. ড. কে. আবদুল হক, সহকারী, প্রেসিডেন্ট আইডিবি

৪. জনাব এম. আল ক্লিবি, ওআইসি

৫. জনাব শেখ কামাল সিরাজ উদ্দিন, রাবেতা আলমে ইসলামী (মক্কা)

৬. জনাব ইসমত আবদুল কাদির, প্রখ্যাত প্রকৌশলী।

প্রতিনিধি দলের সফরের পরই আরবেনিয়ার রাষ্টপ্রধান জেদ্দাসহ ওআইসি এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সউদী আরব, কুয়েত ও মালয়েশিয়া ব্যাপকভাবে সফর করেন। সর্বত্রই তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়া হয়। তাঁর এ সফরের ফলে মুসলিম বিশ্ব নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আলবেনিয়াকে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা করে। সাহায্যের ক্ষেত্রগুলো হলো ঃ

ক. কারিগরী সহায়তা দান।

খ. সমাজ উন্নয়নের লক্ষে সাহায্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

গ. শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা এবং ছাত্রবৃত্তি মঞ্জুর করা।

ঘ. অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার লক্ষে সাহায্য হিসেবে অর্থ বরাদ্দ দেয়া।

মুসলিম বিশ্বের সাথে আলবেনিয়ার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে আলবেনিয়াকে ওআইসি এবং আইডিবির সদস্য করা হয়।

আলবেনিয়ার দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতিকে চাঙা করার লক্ষে ১৯৯৪ সালের জুন মাসে আলবেনিয়ায় Arab Albanian Islamic Bank প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর সউদী আরবের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নর Mr. Hoti বলেন ঃ

www.pathagar.com

"Spiritually the country is looking forward to closer ties with Arabs and Muslims, for whom we can be the bridge to Europe."

অর্থ ঃ "ধর্মীয় দিক থেকে দেশটি বর্তমানে আরব ও মুসলমানদের আরো সান্নিধ্যে যাবার চেষ্টা করছে এবং এ ধরনের সম্পর্ক ইউরোপের সাথে আমাদের সেতুবন্ধন স্থাপনে সহায়ক হবে।"

১৯৯৩ সালের ২২-২৪ নভেম্বর আইডিবি-এর উদ্যোগে আলবেনিয়ায় Investment conference অনুষ্ঠিত হয়। এ Conference-এর ফলশ্রুতিতেই আলবেনিয়ার মৃতপ্রায় অর্থনীতিকে চাঙা করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত বিনিয়োগ কর্মসূচি নিয়ে আলবেনিয়ায় আগমন করে। প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রের পরিচিতি নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম	বিনিয়োগের পরিমাণ	বিনিয়োগের ক্ষেত্র
সউদী ক্যাবল কোম্পানী, জেদ্দা	১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	টেলি কমিউনিকেশন ইকুইপ্টমেন্ট
আল-ফাহাদ সার্ভিস গ্রুপ, রিয়াদ	-	পরিবহন
রাফা ট্রেডিং কোং রিয়াদ	-	পরিবহন
এ্যালিউনটিড	১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রথম কিস্তি)	কৃষি, খনিজ, বন, পর্যটন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র
আইডিবি, জেদ্দা	৪.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ঋণ)	১৭৫ বেডের হাসপাতাল নির্মাণ
ওপেক, জেদ্দা	১০.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	হাসপাতাল ও ক্লিনিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন

ইতোমধ্যে আরো বহু প্রতিষ্ঠান আলবেনিয়ায় অর্থ বিনিয়োগের লক্ষে এগিয়ে এসেছে। এ সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলবেনিয়ায় বর্তমানে ইসলাম একটি বিকাশমান ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

www.pathagar.com

শৃংখলমুক্ত আলবেনীয়রা ইসলামকে জানার জন্য আজ ব্যাপকভাবে কুরআন-হাদীস চর্চা শুরু করেছে।

দেশের অর্থনীতিকে দ্রুত চাঙা করার জন্য কুয়েত ও মালয়েশিয়া ১৬.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের লক্ষে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও পাকিস্তান এবং তুরস্কসহ অন্যান্য মুসলিম দেশও আলবেনিয়ায় অর্থ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনেক আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা বিভিন্নমুখি কর্মসূচি নিয়ে আলবেনিয়ায় আগমন করছে। এ সমস্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. রাবেতা আলমে ইসলামী, সউদী আরব।
২. আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা, সউদী আরব।
৩. আল হারামাইন চ্যারিটি ফাউন্ডেশন, পাকিস্তান।
৪. আল-জামীল গ্রুপ, সউদী আরব।
৫. ওয়ামী, সউদী আরব।
৬. সউদী রেড ক্রিসেন্ট, সউদী আরব।

এ সংগঠনগুলোর চলমান কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

ক. মসজিদ সংস্কার, পুনঃনির্মাণ ও নির্মাণে অর্থসহায়তা করা।
খ. ক্লিনিক ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।
গ. মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সরবরাহ করা।
ঘ. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।
ঙ. পাঠ্যপুস্তক ও ইসলামী সাহিত্য সরবরাহ করা।
চ. আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে কম্পিউটার ও টেকনিক্যাল সেন্টার স্থাপন করা।
ছ. উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা ইত্যাদি।

সউদী সরকারের হজ্জ মন্ত্রণালয় ও রাবেতা আলমে ইসলামীর যৌথ আমন্ত্রণে ১৯৯১ সালে ১৮০ জন এবং ১৯৯২ সালে ৩০০ জন আলবেনীয় মুসলিম ৪০ বছর পর পবিত্র হজ্জব্রত পালনের সুযোগ লাভ করে। কমিউনিস্ট শাসনামলে আলবেনিয়াকে একটি নাস্তিক রাষ্ট্র ঘোষণা করায় আলবেনিয়ার মুসলমানরা হজ্জের মত একটি পবিত্র ইবাদাতের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

www.pathagar.com

মুসলিম দেশ ও আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলোর গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে আলবেনীয় জনগণের আশাতীত সফলতা সূচিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো ঃ

ক. অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

খ. জনগণের ইসলামী পরিচিতি ও স্বাতন্ত্রবোধ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুসলিম দেশ ও ইসলামী সংস্থাগুলোর আশাতীত কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে আলবেনিয়ার গ্র্যান্ড মুফতী বলেন ঃ

"If our Muslim brothers come to our help we will stay strong even against the undeclared resolve of Europe which does not want to see an Islamic country in thier midst."

অর্থ ঃ "যদি আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে তাহলে ইউরোপের অঘোষিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা এখানে শক্তভাবে অবস্থান করবো যদিও ইউরোপের বুকে তারা কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে চায় না।"

আলবেনিয়ার গ্র্যান্ড মুফতীর এ পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে তুলতে হলে আলবেনীয় মুসলমানদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিহার করে ঐক্যবদ্ধভাবে কালেমার পতাকা নিয়ে আগামী দিনের সুবহে সাদিককে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং এভাবেই কমিউনিস্ট দুঃশাসনে ক্ষতবিক্ষত আলবেনিয়া একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে ইউরোপের বুকে ইসলামী আলবেনিয়া হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে বলে আশা করা যায়। আমরা আলবেনীয় মুসলমানদের সেই গৌরবোজ্জল বিজয় প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), জুলাই, ১৯৯৭।
২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

কোরিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পৃথিবীর প্রতিটি জনপদ ইসলামের ছোঁয়ায় ধন্য। কারণ ইসলামের আগমন কোনো গোত্র বা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয় বরং সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যই। তাই আজকে যেসব জনপদকে অমুসলিম অধ্যুষিত জনপদ বলে আমরা জানি সেসব জনপদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে লুকিয়ে আছে ইসলামের গৌরবময় তথ্য। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এক পর্যায়ে আজকের কোরিয়ায়ও ইসলামের আগমন ঘটেছিল।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজা হাইউন জং-এর রাজত্বকালে সপ্তদশ বর্ষে এবং লী রাজ বংশের রাজা ডান জং-এর শাসনের সপ্তম বর্ষে আরব বণিকরা কোরিয়ায় আগমন করে। এ বণিকদের মাধ্যমেই কোরিয়ায় ইসলাম প্রচার শুরু হয়। ১৯৫০–১৯৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সময় সে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ কোরিয়ায় শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে। শান্তিরক্ষী বাহিনীতে তুর্কী সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তুর্কী সৈন্যদের সাথে দু'জন ইমাম ছিলেন। এঁরা হলেন আবদুর রহমান ও জুবায়ের কোচি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এঁরা একটি তাঁবুকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন এবং এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। পঞ্চাশের দশকে এ দু'জন মর্দে মুজাহিদ একটি ছোট্ট তাঁবুতে ইসলামের যে বীজ রোপণ করেন, তা আজ বিরাট মহিরূহে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমানে কোরিয়ার জনসংখ্যা ৪২ মিলিয়ন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ হাজার। ১৯৫০-৫৩ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের পরই মুসলমানরা কোরিয়ায় একটি সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৯ম শতাব্দীতেই কোরিয়ার জনগণের সাথে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ সময় আরব বণিকরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোরিয়ায় আগমন করে। কোরিয়ায় মুসলমানদের আগমনকে প্রধানতঃ দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় ঃ ১। প্রাচীন কাল ২। বর্তমান কাল বা আধুনিক কাল।

প্রাচীন কালে কোরিয়ার সাথে মুসলমানদের যোগাযোগকে আমরা প্রধানতঃ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। যেমন—

www.pathagar.com

প্রথম পর্যায় ঃ কোরিয়ার ঘটনাপঞ্জী ও আরব পণ্ডিতদের মতে, ১০ম শতাব্দীতে কোরিয়ার Unified Shilla dynasty-এর শাসনামলে আরব মুসলমানদের সাথে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কোরিয়ার ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১০২৪ সালে ১০০ জন আরব পরিব্রাজক কোরিয়া সফর করেন। এ সময় কোরিও রাজবংশের রাজা হাইউন জং কোরিয়া শাসন করেন। মুসলিম পরিব্রাজক এ দলটির নেতৃত্ব দেন হাসান রাজা। পরবর্তী বছর আরো একশত আরব বণিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কোরিয়ায় আগমন করেন। আরব পরিব্রাজক ও বণিকরা এ সময় কোরিয়ায় নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি চালু করেন। অনেকে মনে করেন আরব বণিকদের 'হো-রিন্ড' শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ থেকেই দেশের নামকরণ করা হয় 'কোরিয়'। মুসলিম পণ্ডিত ইবনে রুশদ, মাসুদী, আল-ইদ্রিসীসহ অন্যান্যদের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১০ম শতাব্দী থেকেই কোরিয়ায় মুসলমানদের আগমন ঘটে। ১১শ শতাব্দীতে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে কোরিয়া সফর করে। তবে এ সময় তারা স্থায়ীভাবে কোরিয়ায় বসবাস শুরু করেনি। কিন্তু তারা তাদের ধর্মীয় আচরণ কঠোরভাবে মেনে চলে যা অনেক কোরিয়ানকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ১২৭০ সালে কোরিয়া যখন মঙ্গোলদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তখন মুসলমানরা দ্বিতীয় পর্যায়ে কোরিয়ায় আগমন করে। এ সময় অনেক মুসলমান মঙ্গোলীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগদান করেন। এ সমস্ত মুসলিম প্রশাসকরা সরকারের Policy তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১২৭০ সাল থেকে ১৩৬৮ সালের মধ্যে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে কোরিয়ায় আগমন করে এবং তারা কোরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপন করে। এ সময় মুসলমানরা কোরিয়ার রাজধানীতে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করে। এ মসজিদটির নামকরণ করা হয় "Ye-kung Mosque"। এ সময় কোরিয়ায় "Koryo Dynasty"-এর রাজত্বকাল ছিল। এ রাজবংশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন-King Yuan (১২৭০-১৩৬৮)।

কোরিয়ায় ইসলামের অব্যাহত প্রচার ও প্রসার দেখে কোরিয়ার সরকার ১৪২৭ সালে একটি ডিক্রী জারী করে। এ ডিক্রীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এমনকি এ ডিক্রী মুসলমানদের সনাতন ধর্মীয় পোশাক ও

www.pathagar.com

শিরোভূষণ পরিধানের উপরও কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে। মুসলমানরা এটিকে একটি কালো আইন বলে অভিহিত করে।

১৩৯২ সালে Chosun dynasty প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১০ সাল পর্যন্ত এ রাজবংশ কোরিয়া শাসন করে। এ রাজ বংশের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসলামসহ অন্যান্য বিদেশী ধর্মের প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ শুরু করা হয়। এ বিধি-নিষেধের আওতায় মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন মুছে ফেলা হয়। মুসলমানরা পর্যায়ক্রমে তাদের নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রথা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে কোরীয় সমাজে মিশে যায়। দীর্ঘ ১৫০ বছর পর্যন্ত কোরিয়ার মুসলমানরা তাঁদের নিজস্ব পোশাক পরিধান করতে পারেনি। এমনকি এ সময় তারা নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি চর্চা করতে পারেনি। প্রকাশ্যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম ইসলাম থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ রাশিয়ায় বলশেভিকদের শাসনামলে (১৯২০ইং) অনেক রাশিয়ান-তুর্কী মুসলমান নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৯২০ সালে কোরিয়ায় আগমন করে। ১৯২০ সালে ২০০ রুশ-তুর্কী মুসলমানের প্রথম দলটি রাশিয়া থেকে কোরিয়ায় আগমন করে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত রাশিয়া ও জাপান থেকেও বহু মুসলমান কোরিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এ সমস্ত মুসলমানরা জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করে। ১৯৩০ সালে এক সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, এ সময় কোরিয়ায় তুর্কী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০ জন। অবশ্য বেসরকারী সূত্রমতে এ সংখ্যা ২০০–২৫০ জন। এ সমস্ত মুসলমানরা অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশ সচ্ছলতা অর্জন করে। তাঁরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের লক্ষে নিজস্ব কমিউনিটি গড়ে তোলে। এ মুসলিম কমিউনিটির নাম দেয়া হয় Mahall-i-Islamiya। এখানে বসবাসকারী মুসলমানরা অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার সুযোগ পায়। কিন্তু খুব শীঘ্রই মুসলমানদের উপর নেমে আসে রাজনৈতিক নির্যাতন ও নিপীড়ন। মুসলমানদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৯৪৫ সালে কোরিয়ার স্বাধীনতা লাভের পর মুসলমানদের উপর রাজনৈতিক নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এ নির্যাতনের শিকার হয়ে কোরিয়ার তুর্কী মুসলমানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্কে হিজরত করে। এভাবেই কোরিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের আগমনের প্রাচীনকাল শেষ হয়।

২৪—

www.pathagar.com

আধুনিক কোরিয়ায় ইসলাম

১৯৫০-৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে জাতিসংঘ কোরিয়ায় শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে। এ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে তুর্কী সৈন্য অর্ন্তভুক্ত ছিল। তুর্কী সৈন্যদের মাধ্যমেই আধুনিক কোরিয়ায় নতুন উদ্যমে ইসলাম প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। আধুনিক কোরিয়ায় ইসলামী দাওয়াহ্ কাজকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। যেমন—

ক. প্রথম পর্যায় ঃ ১৯৫০—১৯৬০ ইং

খ. দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ১৯৬০—১৯৭৬ ইং

গ. তৃতীয় পর্যায় ঃ ১৯৭৬—বর্তমান কাল পর্যন্ত।

কোরীয় যুদ্ধ চলাকালে ১৯৫৫ সালে তুর্কী সৈন্যদের একটি দল জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে কোরিয়ায় আগমন করে। সৈন্যরা তাদের সৈনিক জীবনের পাশাপাশি দায়ীর ভূমিকাও পালন করে। তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফলে আগামী দিনের কোরিয়ায় ইসলাম একটি বিকাশমান ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হবে।

তুর্কী এ শান্তি ব্রিগেডে Abdul Gafur Karalismailoglu নামে একজন ইমাম কর্মরত ছিলেন। যে সকল কোরিয়ান তুর্কী ব্রিগেড পরিদর্শনে আসতো তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রোগ্রাম উপলক্ষে সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এ সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে কোরীয় জনগণের নিকট তিনি ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরে তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। ইমাম আবদুল গফুরের এ দাওয়াতী তৎপরতার ফলে যারা পথম ইসলাম গ্রহণ করেন তারা হলেন ঃ Abdullah Kim yu-do, Umar Kim Jin-Kyu, Muhammad Yoor Doo Young অন্যতম।

কোরিয়ায় ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষে ১৯৫৫ সালে কোরীয় নওমুসলিমদের উদ্যোগে Koria Islamic society নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সোসাইটির উদ্যোগে সিউলে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে ইসলামী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে তুর্কী ব্রিগেডের ইমাম আবদুল গফুর উপস্থিত থেকে ইসলামের বিভিন্ন দিক তাদের সামনে তুলে ধরতেন। কোরিয়া ইসলামিক সোসাইটি এবং ইমাম আবদুল গফুরের এ অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে বহু

www.pathagar.com

কোরীয় জনগণ ইসলামের সাম্য-স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হতে সক্ষম হয়। ইমাম আবদুল গফুরের সাপ্তাহিক আলোচানা শুনে ১৯৫৫ সালের ১০ জুন ৫৭ জন কোরীয় ইসলাম গ্রহণ করে। এক সাথে ৫৭ জন কোরীয়র ইসলাম গ্রহণ কোরিয়ায় দ্রুত ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বা ইতিহাসের বাঁক ঘুরানো ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে যেসব শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে তাদের জন্য তুর্কী সৈন্যদের উদ্যোগে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে সেনা ব্যারাকে 'Chung Jin Madrasah' নামে একটি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোরিয়ায় এটাই ছিল প্রথম দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে ইমাম আবদুল গফুরের সেনা ব্রিগেডকে স্বদেশে প্রত্যাহার করা হলে ইমাম আবদুল গফুরকেও স্বদেশে ফিরে যেতে হয়। এ ব্রিগেডটি চলে যাবার পর নতুন একটি ব্রিগেড শান্তিরক্ষী বাহিনীতে যোগদান করে। এ ব্রিগেডের ইমাম ছিলেন যুবায়ের কোচ। তিনি তখন মাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ ও উদ্যমী দায়ী ইলাল্লাহ্। ইমাম আবদুল গফুরের অসমাপ্ত কাজকে চূড়ান্ত মঞ্জিলে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সভাসমাবেশের আয়োজন করেন এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে কোরিয়ায় ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। সেনা ব্যারাক থেকে দাওয়াহ কাজকে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষে সিউলের কেন্দ্রস্থলে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে একটি বিরাট মিনারসহ মসজিদ নির্মাণ করতে সক্ষম হন। এটাই কোরিয়ায় নির্মিত প্রথম মসজিদ। মসজিদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন ৫৮ জন কোরিয়ান নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ইমাম যুবায়ের-এর ব্রিগেডকে কোরিয়া থেকে স্বদেশে প্রত্যাহার করা হয়। এ সময় পর্যন্ত ২০৮ জন কোরীয় ইসলাম গ্রহণ করেন।

১৯৬০ সালে কোরিয়ায় ইসলামী দাওয়াহ কাজের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় এবং ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর সাথে কোরিয়ার নওমুসলিমদের যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। এ সময় পাকিস্তান এবং

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার সাথে কোরীয় নওমুসলিমদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। টেংকু আবদুব রহমান ছিলেন তখন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। তিনি কোরীয় মুসলমানদের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁর এ আশ্বাসের অংশ হিসেবে তিনি সিউলে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য তিনি ৩৩ হাজার মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেন। এছাড়াও কোরিয়ার মুসলমানদের অবস্থা অবগত হবার জন্য মালয়েশিয়ার জাতীয় পার্লামেন্টের স্পীকার জনাব হাজী নোয়ার নেতৃত্বে একটি মালয়েশীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল কোরিয়ায় প্রেরণ করেন। এ প্রতিনিধি দলের সুপারিশের ভিত্তিতে টেংকু আবদুর রহমানের নেতৃত্বাধীন মালয়েশীয় সরকার কোরিয়ার মুসলমানদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। একই সময় পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ও Qur'an Society of Pakistan-এর সভাপতি মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ জামিল কোরিয়া সফর করেন এবং নওমুসলিমদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৬৭ সালে কোরিয়ার মুসলমানদের উদ্যোগে "কোরিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই বঁছর সরকার ফাউন্ডেশনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেন। কোরীয় সরকার ফাউন্ডেশনের রেজিস্ট্রেশনের পর এটিকে কোরীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক বৈধ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময় ইসলাম দ্রুত বিকাশমান ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ সময় মুসলিম দেশগুলোর সাথে কোরীয় মুসলমানদের যোগাযোগে রাষ্ট্রীয় কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকায় আরব বিশ্বসহ অনান্য মুসলিম দেশের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং এ যোগাযোগের ফলে অন্যান্য দেশের মুসলমানদের সাথে কোরীয় মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ যোগাযোগের ফলেই ১৯৭৬ সালে সিউলের কেন্দ্রস্থলে সিউল কেন্দ্রীয় মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে কোরিয়ায় ৬টি বড় মসজিদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে–

১. সিউল কেন্দ্রীয় মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার

২. পুসান আল-কাতাহ মসজিদ

৩. কাওয়াং জু মসজিদ

৪. আনয়াং রাবিতা মসজিদ।

৫. জিয়ন-জু আবু বকর আল-সিদ্দীক মসজিদ।

www.pathagar.com

সিউল সেন্ট্রাল মসজিদ নির্মাণের জন্য কোরীয় সরকার ১৯৬৯ সালের মে মাসে ১৫০০ বর্গমিটার জমি দান করে এবং এ জমির উপরই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৭৬ সালের ২১ মে মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে মসজিদটির সম্প্রসারণের জন্য কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করলে ১৯৯১ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। আইডিবি-র আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৯১ সালে মসজিদটাকে একটি তিনতলা মসজিদে উন্নীত করা হয়।

পুসান আল-ফাতাহ মসজিদ ১৯৮০ সালে, কাউয়াংজু মসজিদ ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে, জিয়ন জু আবু বকর আল-সিদ্দীক মসজিদ ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে আনয়াং রাবিতা মসজিদ ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়।

বর্তমানে কোরিয়ায় বেশ ক'টি ইসলামী সংগঠন ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা পালন করছে। এ সমস্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. কোরিয়া ইসলামিক সোসাইটি
২. কোরিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৩. দাওয়াতুল ইসলাম
৪. জামায়াতে ইসলামী
৫. কোরিয়ান মুসলিম ফেডারেশন
৬. তাবলীগী জামায়াত ইত্যাদি।

এ সমস্ত সংগঠনগুলোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো ঃ

ক. ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা এবং ইয়াতীম প্রতিপালন।

খ. দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ. মসজিদ নির্মাণ এবং মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তব পরিচালনা করা।

ঘ. ইসলামী পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণ করা।

ঙ. সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট কালে মুসলমানদের আইনগত সহায়তা দান।

চ. কোরিয়ান ভাষায় ইসলামী পুস্তক অনুবাদ, প্রকাশ ও বিতরণ করা।

ছ. সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা।

জ. ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা এবং মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার্থে মুসলিম দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা।

www.pathagar.com

ঝ. সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করা। উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রগুলো হলো ঃ

i) Weekly Muslim News Letter

ii) Al-Islam

iii) The Korea Islam Herald

কোরিয়ার মুসলমানরা অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য কোরিয়ানদের মতই মোটামুটি সচ্ছল। ফলে কোরিয়ায় বর্তমানে কর্মরত ইসলামী সংগঠনগুলো স্থানীয় কোরীয় মুসলমানদের আর্থিক সহযোগিতায়ই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলোর ওপর তাদের নির্ভরশীলতা খুব কম। কোরীয় ইসলামী সংগঠনগুলোর অব্যাহত দাওয়াহ্ কাজের ফলে ১৯৭০ সালে ১০০০ কোরীয় ইসলাম গ্রহণ করে। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ১০০০–১২০০ জন স্থানীয় কোরীয় ইসলাম গ্রহণ করে। ১৯৮০ সালের পর থেকে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫০ জনে উন্নীত হয়েছে। কোরীয় মুসলমানদের দাওয়াহ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে এবং প্রয়োজনীয় দাওয়াহ্ উপকরণের সরবরাহ্ সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হলে আগামী দিনের কোরিয়ায় ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা কোরিয়ার মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, অক্টোবর, ১৯৯৭।

www.pathagar.com

উগান্ডায় ইসলাম ঃ শত বছরের চালচিত্র

উগান্ডা একটি সংখ্যালঘু মুসলিম দেশ। জেনারেল ইদি আমিনের শাসনকালে উগান্ডা বিভিন্ন কারণে বার বার বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ইদি আমিনের শাসনামলে উগাণ্ডা আর ইদি আমিনের অস্তিত্ব একাকার হয়ে গিয়েছিল। তখন ইদি আমিন মানে উগান্ডা আর উগান্ডা মানেই ইদি আমিন বলা হতো। ইদি আমিনের উগান্ডায় ১৮৮৪ সালে সর্বপ্রথম ইসলামের আগমন ঘটে।

উগান্ডা আফ্রিকা মহাদেশের একটি রাষ্ট্র। আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। অন্ধকার মহাদেশ বলেই আফ্রিকা মহাদেশ বেশি পরিচিত ছিল। মানবতার প্রিয়তম বন্ধু, আর্ত-পীড়িত মানুষের প্রিয়তম সাথী, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানবতার আশা ভরসার স্থল, সর্বোপরি একটি প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনেই হযরত ওসমান (রা)-এর নেতৃত্বে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে আফ্রিকা মহাদেশে এবং ইথিওপিয়ার (হাবশা) সম্রাট নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে আফ্রিকায় ইসলামের সুবাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

১৮৮৪ সালে যখন ইসলাম উগান্ডায় আগমন করে তখন সম্রাট সুন্না দ্বিতীয় (King Sunna-II) উগান্ডার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। উগান্ডা তখন বুগান্ডা (Buganda) নামেই পরিচিত ছিল। বুগান্ডার প্রতিবেশী কয়েকটি ছোট ছোট দেশ বুগান্ডার সাথে মিলিত হয়ে উগান্ডা নাম ধারণ করে। উগান্ডার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টানদের সহঅবস্থান ছিল। কিন্তু অচিরেই তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ দ্বন্দ্বে ঔপনিবেশিক শক্তির সহযোগিতায় খৃস্টান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের বিজয় হয়। আর এ দ্বন্দ্বে মুসলমানরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

১৯০০ সালে বুগান্ডা চুক্তি নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ফলে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টানদের নামে সরকারীভাবে প্রচুর জ মি বরাদ্দ করা হয়। খৃস্টানরা এ সমস্ত জমিতে মিশনারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল স্থাপন করে। ফলে একদিকে তাদের ধর্ম প্রচার এবং অপর দিকে তাদের অনুসারিদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়

www.pathagar.com

অবারিতভাবে। অথচ সামাজিক কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য মুসলমানদের নামে সরকারিভাবে জমি বরাদ্দের কোনো সুযোগ বুগান্ডা চুক্তিতে রাখা হয়নি। ফলে মুসলমানরা অঘোষিতভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। বুগান্ডা চুক্তির ফলে উগান্ডায় খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

উগান্ডায় খৃস্টধর্মের অবাধ চর্চার মুকাবিলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার অনেকাংশে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। বুগান্ডা চুক্তির ফলে সরকারিভাবে মুসলমানদের জন্য জমি বরাদ্দের সুযোগ না থাকায় মুসলমানদের উদ্যোগে মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল নির্মাণ করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সরকারীভাবে জমি বরাদ্দ না পাওয়ায় মুসলমানরা স্থানীয়ভাবে নিজেদের উদ্যোগে সীমিত পরিসরে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এ ধরনের একটি মসজিদ হলো 'কিবুলি মসজিদ'। এটি একটি বিখ্যাত মসজিদ। প্রিন্স বদরুর কাকুনগুলো ও হাজী মূসা কাসুলী এ মসজিদ নির্মাণে অর্থ যোগান দেন। উগান্ডায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পেছনে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো জমি বরাদ্দের ওপর সরকারি বিধি নিষেধ আরোপ করা।

দ্বিতীয়তঃ দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি। অথচ মুসলমানদের জমির পরিমাণ কম থাকায় কৃষি উৎপাদনেও তারা পেছনে পড়ে রয়েছে। অপরদিকে খৃস্টানদের জমির পরিমাণ বেশি থাকার কারণে তাদের উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণও বেশি। ফলে অধিক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৯৭১ সালে জেনারেল ইদি আমিন উগান্ডার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তার ক্ষমতারোহণের মধ্য দিয়ে উগান্ডায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলমানদের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলামের প্রতি ইদি আমিনের সহানুভূতিশীল মনোভাবের কারণে খৃস্টান প্রচার মাধ্যমসমূহ তাঁকে দুনিয়াবাসীর সামনে অপ্রকৃতিস্থ ও পাগল প্রমাণের জন্য আদা-পানি খেয়ে লেগেছিল। তাদের চক্রান্তেই ১৯৭৯ সালে ইদি আমিন ক্ষমতাচ্যুত হন। ইদি আমিন ক্ষমতায় থাকাকালীন জমি বন্দবস্তির ব্যাপারে ১৯৭৫ সালে একটি ডিক্রী জারী করেন। এ ডিক্রীর ফলে মুসলমানরা জমি ক্রয় করার সুযোগ লাভ করে এবং অনেক মুসলমান এ সুযোগে জমি ক্রয় করে জমির মালিকানা স্বত্বও লাভ করে। কিন্তু ইতোমধ্যেই জমির

www.pathagar.com

মালিকানার ব্যাপারে জেনারেশন গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা বুগান্ডা চুক্তিরই নির্মম পরিণতি।

১৯০০ সালের বুগান্ডা চুক্তির অপর বিশেষ দিক হলো এ চুক্তিটি ছিল ইসলাম বিরোধী এবং এ চুক্তির ফলে খৃস্টানরাই নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। আইন প্রণেতা, পুলিশ কর্মকর্তা, ট্যাক্স কর্মকর্তা, বিচারক প্রভৃতি পদে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টানদের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। কৃষকদের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও খৃস্টনাদেরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ফলে মুসলমানরা সর্বত্রই নিগৃহীত হয়। এমনকি স্বাধীনতা উত্তর উগান্ডায় ২৭০ আসনের পার্লামেন্টে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০জন। বৈষম্য কাকে বলে ? এটাই পশ্চিমাদের মানবাধিকারের নমুনা। ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত উগান্ডার বর্তমান বৈরী পরিবেশকে নির্যাতিত ও নিগৃহীত মুসলমানদের অনুকূলে আনা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই এ বৈরী পরিবেশ থেকে মুক্তির জন্য উগান্ডার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবী। এ উপলব্ধি তাদের মধ্যে যত তীব্র হবে, ততই তাদের মুক্তির পথ ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

উগান্ডার বর্তমান সরকার মুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রেও অনাহুত বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে। জুমআর নামায সুষ্ঠুভাবে আদায়ের জন্য অধিক সময় বরাদ্দের দাবীতে মুসলমানরা দীর্ঘদিন থেকে সরকারের নিকট দাবী করে আসছে। কিন্তু সরকার এ দাবীর ব্যাপারে এখনও নির্লিপ্ত রয়েছে। অপরদিকে খৃস্টানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য শনিবার ও রোববারকে সাধারণ ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

উগান্ডায় বর্তমানে একটি নতুন সংবিধান রচনার কাজ চলছে। সংবিধানে মৌলিক নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উগান্ডার মুসলিম সংগঠনগুলো মুসলমানদের দাবী দাওয়া সম্বলিত একাধিক স্মারকলিপি সরকারের নিকট পেশ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো ইতোমধ্যে যে খসড়া সংবিধান প্রকাশিত হয়েছে তাতে মুসলমানদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকারের কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ম্যাকরোর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন' এর নেতৃবৃন্দ জুডিসিয়াল সিস্টেমে ইসলামিক আইন সংযোজন করার দাবী করেছিল যা আইনে পরিণত হলে মুসলমানদের বিবাহ, তালাক ও

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো দেশের প্রচলিত আইনের আওতায়ই ফায়সালা করা যেতো। কিন্তু উগান্ডা সরকার মুসলিম ছাত্রদের এই দাবীর প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করেনি। উগান্ডার সংবিধানে জুডিসিয়াল সিস্টেমে ইসলামিক আইন সংযোজন করা হলে আইনের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিরোধ মিমাংসার জন্য বিভিন্ন স্তরে 'শরীয়াহ্ কোর্ট' চালু করা সম্ভব হতো। 'শরীয়াহ্ কোর্ট' প্রতিষ্ঠিত হলে উগান্ডায় সাধারণ কোর্টে যে সমস্ত বিচার ফায়সালা করা হয় অনুরূপ বিচার ফায়সালা শরয়ী কোর্টেও পরিচালনা করা সম্ভব হতো।

ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক উত্তর শাসকরা দেশে দু' ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছে। যেমন—

ক. সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ এ শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সাদা চামড়া ও এশিয়ানদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ লাভ করে।

খ. মিশনারী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ এ শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানমূহে আফ্রিকান ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আফ্রিকান শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

স্বকীয় তাহজীব ও তমদ্দুন রক্ষার লক্ষে মুসলমানদের মধ্যে কোনো মিশনারী গ্রুপ সৃষ্টি না হওয়ায় মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে আর্থিক দৈন্যের কারণে মুসলমানরা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছে না। কারণ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির সিংহভাগই মুসলমান। দরিদ্রতার কারণে নিজেদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই অবস্থায় মুসলমানদের সামনে দুটি বিকল্প পথ খোলা রয়েছে। যথা—

প্রথমত পড়াশুনার জন্য মুসলিম ছেলেমেয়েদেরকে মিশনারী স্কুলে প্রেরণ করা। এ সমস্ত স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ধর্মান্তরিত করার কাজও দক্ষতার সাথে সুসম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে খৃস্টান সেন্টার রয়েছে, যেখানে ধর্মান্তরের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়।

মিশনারী স্কুলে পড়ার সুবাদেই মুসলিম শিশু ইউসুফ পরিণত বয়সে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে উইসুফ লুলে নাম ধারণ করে। এ ধর্মান্তরিত

www.pathagar.com

মুসলিম যুবকই ১৯৭৯ সালে উগান্ডার প্রেসিডেন্টের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়। তাই মুসলমানরা তাদের সন্তানদেরকে মিশনারী স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে নিরুৎসাহ বোধ করছে।

দ্বিতীয়ত সেকিউলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম শিশুদের ভর্তি না করা। শিক্ষার ব্যাপারে এ দুটির কোনো বিকল্প না থাকায় মুসলিম শিশুদের শিক্ষালাভের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে বেড়ে ওঠা মুসলিম যুবকদের অধিকাংশই নিরক্ষর থেকে যাচ্ছে।

অপরদিকে সরকারের নীতি হলো সেকিউলার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ না করলে কোনো মুসলিম যুবকই সরকারের ক্যাডার সার্ভিসে যোগদানের ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। ফলে সরকারি চাকরির সোনার হরিণ মুসলিম যুবকদের নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর নয়। একান্ত বাধ্য হয়েই মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে সেকিউলার ও মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। উচ্চশিক্ষার দ্বার মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একেবারেই রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষা বর্ষে 'ম্যাকরোর বিশ্ববিদ্যালয়ে' সর্বমোট ১৯৯০জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়, এর মধ্যে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ১১০জন এবং ১৯৯২-১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ১৯৫২জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় এর মধ্যে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ১৩০জন। এ পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেলো মুসলমানদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার কিভাবে সীমিত করে রাখা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসন ও স্বাধীনতা উত্তরকালের শাসনকার্যে মুসলমানরা কখনো অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। ফলে মুসলমানরা উগান্ডায় একটি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে এবং মুসলিম বিশ্বের সাথেও উগান্ডার তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। ১৯৭১ সালে ইদি আমিন উগান্ডার ক্ষমতায় আসার পর মুসলিম বিশ্বের সাথে উগান্ডার যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং ইদি আমিনের শাসনামলেই উগান্ডা 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থার' সদস্য পদ লাভ করে। ফলে সরকারিভাবে উগান্ডার মুসলমানদের জন্য কোনো দীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব না হলেও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্যান্য মুসলিম দেশের আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো বিভিন্নমুখী

www.pathagar.com

প্রকল্প নিয়ে উগান্ডায় যাওয়ার সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে রাবেতা আলমে ইসলামী, আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থা, ইসলামিক চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন উগান্ডায় তাদের মিশনারী কার্যক্রম শুরু করেছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের আওতায় মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে উগান্ডার মুসলমানদের মনে আশার আলো দেখা দিয়েছে। তারা এখন আর নিজেদেরকে অসহায় ভাবে না বরং মুসলিম উম্মাহর সদস্য হিসেবে গর্ববোধ করে। এ সমস্ত আন্তর্জাতিক ইসলামী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর আর্থিক সহযোগিতায় ইতোমধ্যেই উগান্ডায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আগামীদিনের তারেক ও মূসার জন্ম হবে বলে উগান্ডার মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী উগান্ডায় মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০% জন মুসলমান। অথচ ইদি আমিনের ক্ষমতারোহণের সময় এই হার ছিল ২৫% এবং ক্ষমতাচ্যুতির সময় এ হার ছিল ৬০%। বর্তমানে মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষায় কিছুটা অগ্রসর হওয়ায় তারা ইতোমধ্যেই একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। উগান্ডার বর্তমান ক্যাবিনেটে ৫ জন মুসলমান মন্ত্রী আছেন। তাঁরা হলেন, হাজী মোসেস কিগনগো, হাজী জাবেরী বিদানদী শা আলী, হাজী আলী কিরুন্ডা, হাজী কাকুমবী মোকাশা এবং সেলিম বাচ্চু। এ ছাড়াও 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স কাউন্সিল'-এর কয়েকজন সদস্য পার্লামেন্টে কর্মরত রয়েছেন। যদিও এ সংখ্যা খুবই কম। তবুও আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তারা স্বজাতির জন্য কিছু ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে উগান্ডার মুসলমানরা মনে করে। ইতোপূর্বে সরকার মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব 'ঈদ-উল-আযহার' জন্য কোনো ছুটি ঘোষণা করেনি। কিন্তু বর্তমান পার্লামেন্ট 'ঈদুল আযহার' দিনকে সরকারী ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে বর্তমান ক্যাবিনেটের মুসলিম সদস্য ও পার্লামেন্টের সচিবালয়ে কর্মরত মুসলিম আমলাদের অনমনীয় মনোভাবের কারণেই। এটা মুসলমানদের জন্য একটি বিরাট বিজয় বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

১৯৫৩ সাল পর্যন্ত উগান্ডার মুসলমানরা সাধারণত কৃষিকাজের মাধ্যমেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। তবে কিছুসংখ্যক লোক ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে উগান্ডার মুসলমানরা ভারী শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। যদিও এ উদ্যোগ মোট জনসখ্যার তুলনায় খুবই কম। তবুও এ উদ্যোগের ফলে

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমানরা নিজেদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে এবং এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে তারা উগান্ডার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে বলে বিশ্বাস। ইতোমধ্যেই মুসলমানদের উদ্যোগে 'গ্রীনল্যাণ্ড ব্যাংক' ও 'ফ্লাই ওয়ে লিমিটেড' নামে ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এ ব্যাংকের মাধ্যমে মুসলমানরা আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সংযোগস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। অতি সম্প্রতিকালে তারা বাহরাইনের 'ফয়সাল ইসলামী ব্যাংকের' সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কস্থাপন করেছে। এ যোগাযোগের ফলে যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে উগান্ডার মুসলমানরা অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

উগান্ডার মুসলমানদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল দীর্ঘদিনের। ১৯২২ সালে মুসলিম নেতা Prince Nuhu Mbogo -এর মৃত্যুর পর এ দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে যা ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ১৯৭১ সালে ইদি আমিন ক্ষমতা গ্রহণের পর বিবাদমান মুসলিম গ্রুপগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেন। Uganda Muslim Supreme Council"-এর অধীনে সকল বিবাদমান গ্রুপগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে ইদি আমিন মুসলমানদেরকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। ইদি আমিনের অবর্তমানে এ ঐক্যে কিছুটা ফাটল দেখা দিলেও তা মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। বর্তমানে উগান্ডায় প্রধানতঃ তিনটি উপদলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। এ উপদলগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো মতপার্থক্য নেই। মুসলমানদের যে কোনো সাধারণ বিষয়ে এ উপদলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে থাকে। তাদের এ মানসিকতা ভবিষ্যতে মুসলমানদেরকে একক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে— ইনশাআল্লাহ।

মুসলমানদের বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে উগান্ডায় তাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া এখন সময়ের দাবী। প্রস্তাবিত পদক্ষেপ সমূহ ঃ

১. মুসলমানদের মধ্যে চলমান উপদলীয় বিরোধ নিষ্পত্তি করে সুদৃঢ় একক ঐক্য স্থাপন করা ;

২. সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করা ;

www.pathagar.com

৩. পেশা ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা। যেমন—চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, শিক্ষক, ব্যবসায়ীসহ প্রত্যেক গ্রুপের পৃথক পৃথক পেশাভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নেয়া।

৪. পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে পেশাভিত্তিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা এবং এ প্রকল্পসমূহে মুসলমানদেরকে অধিক হারে সম্পৃক্ত করা।

৫. মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের সাথে বেসরকারী উদ্যোগে যৌথভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলা।

উগান্ডার মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষে উপরোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যেমন সুদৃঢ় আদর্শিক ঐক্য প্রয়োজন তেমনি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মুসলমানদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যও ইদি আমিনের মতো একজন অসম সাহসী ও যোগ্য নেতার প্রয়োজন এখন সময়ের দাবী। উগান্ডার মুসলমানদের এ ক্রান্তিকালে একাধিক ইদি আমিনের জন্ম হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্য সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, এপ্রিল '৯৪ অবলম্বনে।

www.pathagar.com

জার্মানীতে ইসলাম ঃ জ্যাকব দম্পতির ভূমিকা

হিটলারের দেশ জার্মানী। 'জার্মান জাতি দুনিয়ার সেরা জাতি এবং দুনিয়াকে শাসন করার অধিকার জার্মান জাতিরই'—হিটলারের এই অহংবোধ থেকেই মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। লক্ষ লক্ষ বনিআদম এ যুদ্ধে নিহত হয়। জার্মানরা তাদের স্বাধীনতা হারায় এবং দেশটির ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হিটলারের প্রেতাত্মা এখনও জার্মানীর রাজনৈতিক ও সামাজিক আকাশে মাঝে মাঝে তার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা দিয়ে যায়। বিজ্ঞানের অবিনাশী তত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা জানি 'বস্তুর ধ্বংস হয় না বরং বস্তুর রূপান্তর ঘটে'। হিটলারের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবিনাশী তত্ত্ব প্রযোজ্য। কারণ শরীরী হিটলারের ধ্বংস হয় ১৯৪৫ সালে। অথচ আজও জার্মানীর পত্র-পত্রিকায় মাঝে মধ্যে নব্য হিটলার তথা হিটলারের প্রেতাত্মাদের অস্তিত্বের খবর বিশ্ববাসীকে শুনতে হয়। তাই বলা যায় হিটলারের প্রেতাত্মাদের মৃত্যু নেই।

হিটলারের জার্মানীতে বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা ৪০,০০,০০০। এর মধ্যে শতকরা ৮০ জন তুর্কী। অবশিষ্ট ২০ জন আফগানী, লেবাননী, পাকিস্তানী, ইরাকী ও ইরানী। জার্মানীতে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৫০,০০০ জার্মানী ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আব্বাস ও খায়রুন্নেসা জেকব দম্পতি বর্তমানে জার্মানীতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ দম্পতিটি অত্যন্ত অমায়িক ও বন্ধুভাবাপন্ন। দাওয়াতী কাজের জন্য এ দুটি গুণের কোনো বিকল্প নেই। ১৯৬০ সালে ১৯ বছর বয়সে জার্মান প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান তরুণী ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে এক সাক্ষাতকারে এ সাবেক জার্মান তরুণী বলেন, "কিছু সংখ্যক ফিলিস্তিন ছাত্র ১৯৬০ সালে জার্মানীর Hamburg University-তে অধ্যয়নরত ছিল। আমি এ সময় ছাত্রদের সাহচর্যে এসে ইসলামের বিপ্লবী আহবানের সাথে পরিচিত হই এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করি।" ফিলিস্তিন ছাত্রদের কাছ থেকে তিনি ইসলামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন। তিনি নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ইসলামের সামাজিক

www.pathagar.com

ও সাংস্কৃতিক জীবনের তুলনামূলক বিচারে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে অভিভূত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন ঃ

> "These students were all poor. I was impresed with the manner in which they shared their meagre food amongest each other. That incident opened the doors to Islam for me."

অর্থ ঃ "এ সকল ছাত্ররা সবাই ছিল গরীব। তারা যখন তাদের স্বল্প পরিমাণ খাবার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে খায় তখন আমি খুব অভিভূত হয়ে পড়ি। এ ঘটনাটি আমার জন্য ইসলাম গ্রহণের দরজা খুলে দেয়।"

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি খায়রুন্নেসা নাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খায়রুন্নেসা একজন প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টান ছিলেন। তিনি লুথারের শিষ্য এবং যীশুর বাণী প্রচারক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর জার্মানীতে বসবাসকারী ৩২ বছর বয়স্ক দক্ষিণ আফ্রিকার যুবক আব্বাস জেকবকে তিনি বিয়ে করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ১৯ বছর বয়স্কা খৃস্টান তরুণী ব্যাংক ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

আব্বাস জেকব Hamburg-এ নেতৃত্বস্থানীয় একজন দাওয়াহ কর্মী ছিলেন। ১৯৬০ সালে খায়রুন্নেসা আব্বাসের সান্নিধ্যে আসেন। আব্বাস জেকব শুধু জার্মানীতেই নয় বরং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহেও সক্রিয়ভাবে দাওয়াহ কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। আব্বাস জেকবকে বিয়ে করার পর খায়রুন্নেসা নিজকে দাওয়াহ কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত করেন এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারকে নিজের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন।

জার্মানীতে বর্তমানে মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামিক সেন্টারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। খায়রুন্নেসা জেকব ইসলামিক সেন্টার ও মাদরাসায় মহিলাদের মাঝে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। দাওয়াতী কার্যক্রমের পাশাপাশি খায়রুন্নেসা সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায়ও দক্ষতার ছাপ রেখে যাচ্ছেন। লেবানন, আফগানিস্তান, তুরস্ক, প্যালেস্টাইন, জর্দান, ইরাক ও যুগোস্লাভিয়া থেকে আগত মহিলা শরণার্থীদের মাঝে তিনি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

www.pathagar.com

দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য তিনি একটি সমাজকল্যাণ সংস্থাও গঠন করেছেন।

কুরআন ও সুন্নাহ ঘোষিত মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে খায়রুন্নেসা জেকব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন–

"Women are the foundation for a disciplined Ummah and yet we are too naive about the rights bestowed on us in the Qur'an. We must read the Quran in the language we speak, study it and educate ourselves as Muslim Mothers."

অর্থ ঃ "মহিলারা হলো সুশৃঙ্খল জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। কিন্তু এখনও আমরা কুরআনে বর্ণিত নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন নই। আমাদেরকে আমাদের মাতৃভাষায় কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হবে এবং কুরআনের শিক্ষার আলোকে নিজেদেরকে মুসলিম মা হিসেবে প্রশিক্ষিত করতে হবে।"

শিশুদের ইসলামী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"It was good for children to attend Madrasha, but the basic teaching and their upbringing depended on the situation at home."

অর্থ ঃ "ইসলামী শিক্ষার জন্য শিশুদের মাদরাসায় পাঠানো উত্তম। কিন্তু তাদের মৌলিক শিক্ষা ও লালন পালনের বিষয়টি পারিবারিক অবস্থার ওপরে নির্ভর করে।"

অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে জার্মানীতে আগত মাইগ্র্যান্ট ও শরণার্থী মুসলিম মহিলাদের ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখেন যে, তাদের অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা শুধুমাত্র মুসলিম স্বামীদের সহধর্মিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। জার্মানীতে বসবাসকারী মুসলিম মহিলাদের জীবন যাপন পদ্ধতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষাপটে মুসলিম রমণীদের ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন–

"Although more that a million muslim women of different nationalities live in Germany, one knows very little about their way of life, their wishses and

www.pathagar.com

their values.In most cases they are only seen as migrants or refugees, and then only as belongings of their men."

অর্থ ঃ "বিভিন্ন জাতীয়তার এক মিলিয়নের অধিক মুসলিম মহিলা জার্মানীতে বসবাস করছে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই তাদের জীবনপদ্ধতি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জানে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা নিতান্তই অভিবাসী এবং শরণার্থী এবং তারপর শুধুমাত্র তাদের স্বামীদের জীবন সঙ্গী হিসেবে আছে।"

মুসলিম মহিলারা শরীয়াতসম্মত পোশাক পরিধান করে রাস্তায় বেরুলে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো তা লক্ষ করে বিশ্বময় সংবাদ ছড়িয়ে দেয় যে, মুসলিম মহিলারা অশিক্ষিতা, অসহায়া, পশ্চাদগামী এবং পারিবারিক কঠোর বন্ধনে জীবন যাপন করছে যা কোনো অবস্থায়ই প্রগতিশীল জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অবশ্য কোনো কোনো মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়কদের প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের কারণেও সে সকল দেশসমূহে মহিলারা ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হতে পারে। এটা ইসলামের দোষ নয় বরং ইসলামী আইন বাস্তবায়নকারী রাজনৈতিক শক্তির বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য ইসলামকে দোষ দেয়া যায় না। কখনো কখনো ইসলামী দেশসমূহে ইসলামী আদর্শের অপপ্রয়োগের কারণেও পশ্চিমা দুনিয়া পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে ঘোষণা করে যে, মুসলিম মহিলারা বাধ্য হয়ে পর্দার অন্তরালে থেকে জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারছে না।

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচারের কারণ ব্যাখ্যা করে জার্মানী দায়ীয়াহ খায়রুন্নেসা বলেন, "পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের অপপ্রচার সত্ত্বেও জার্মানীতে নও মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নও মুসলিমদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। নওমুসলিমদের মধ্যে শতকরা ৭০ জনই মহিলা। পশ্চিমাদের মতে, হাজার রাত হেরেমে সুখ নিদ্রার চেয়ে একরাত মুক্ত বিহংগের মত সময় কাটানো অনেক অনেক বেশি আনন্দের ও সুখকর। তাদের অপপ্রচার ও প্রলোভন সত্ত্বেও জার্মানী মহিলারা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে।"

কোনো মুসলিম দেশের রমণীরা যখন তাদের স্বামীদের সাথে স্কার্ফ পরিধান করে পশ্চিমা দেশে জীবিকার জন্য আগমন করে তখন পশ্চিমা

www.pathagar.com

মিডিয়া তাদের নিয়ে নানা রকম ব্যাংগ-বিদ্রূপ করে থাকে। এ সমস্ত পশ্চিমা দেশে মুসলিম মহিলারা স্কার্ফ পরে কর্মস্থলে নীরবে কাজ করে যায়। কাজ শেষে তারা বাসায় ফিরে আসে। তাদের আচরণে কোনোরূপ যৌন সুড়সুড়ি লক্ষ করা যায় না এবং শালীনতা বজায় রেখেই দায়িত্ব পালন করে থাকে। এটা পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারকদের জন্য পসন্দনীয় নয়। খায়রুন্নেসা জেকব এ ধরনের মহিলাদের সাহায্যে সর্বদা তাদের পাশে থাকেন এবং তাদেরকে স্বকীয় বৈশিষ্ট বজায় রেখেই কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করার জন্য উৎসাহিত করে থাকেন এবং প্রয়োজনে আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকেন। খায়রুন্নেসা জেকবের এ সাহসী ভূমিকার জন্যই মুসলিম মহিলারা নিজেদের অসহায় না ভেবে বরং স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বেশি সাহসী হয়ে ওঠেন। খায়রুন্নেসা জেকবের এ ভূমিকা জার্মান মহিলাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে উৎসাহিত করছে। ফলে মহিলাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার হার পুরুষদের তুলনায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খায়রুন্নেসা জেকব বলেন, পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো তৃতীয় বিশ্বকে ক্ষুধা, দারিদ্র, গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, পশ্চাৎপদ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে থাকে। মুসলিম বিশ্বও তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত বলে মুসলিম দেশগুলোকেও একই বিশেষণে বিশেষিত করে থাকে। একই কারণে জার্মানীতে বসবাসকারী মুসলিম মহিলাদেরকেও প্রচার মাধ্যমে অশিক্ষিতা, পশ্চাৎগামীতা ইত্যাদি ঋণাত্মক বিশেষণে বিশেষিত করে থাকে।

খায়রুন্নেসা মনে করেন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের এ অপপ্রচারের একমাত্র কারণ হলো মুসলিম দেশের নব্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের এ অজ্ঞতারই সুযোগ গ্রহণ করছে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচার সত্ত্বেও মুসলিম দেশে দেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। এ অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়ার জন্য ইসলামী আদর্শ অনুসরণকারীদেরকে মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে চলমান সমাজকাঠামো থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ চেষ্টায় তারা কিছুটা সফলতাও অর্জন করেছে।

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচার সত্ত্বেও দেশে দেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। খায়রুন্নেসা জেকব বিশ্বাস করেন যে, পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলোর অপপ্রচারের কারণ হলো ক্রমবর্ধমান হারে বিশ্বব্যাপী ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে পশ্চিমাদের প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে এবং ইসলাম একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হবে।

পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে ইসলামী আন্দোলন হলো ঃ

"Islamic movement is backward and exploitive of poverty and ignorance with those participating being brain washed and backward"

অর্থ ঃ "ইসলামী আন্দোলন হলো পশ্চাৎপদতা এবং যারা এ আন্দোলনে শরীক হবে তাদের দরিদ্রতা ও অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের মগজ ধোলাই করে তাদেরকে পশ্চাৎপদতার দিকে ঠেলে দেয়া হয়।"

মহিলাদের হিজাব পরাকে প্রগতির অন্তরায় বলে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রচার করে থাকে। হিজাব পরাকে মহিলাদের উন্নয়নের অন্তরায় বলে মনে করা হয় এবং হিজাব পরার কারণে মুসলিম মহিলারা স্বাচ্ছন্দে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে না বলে অমুসলিম নেতৃবৃন্দের ধারণা। এ সকল কঠিন অবস্থার মুকাবিলা করে খায়রুন্নেসা জেকব জার্মানীতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জার্মানীতে মুসলিম মহিলাদেরকে পশ্চিমী জীবন যাত্রায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য উপর্যুপরি আহ্বান জানানো হচ্ছে। তবে তাদেরকে স্বকীয় ধর্মীয় স্বাতন্ত্র বজায় রাখার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে। জার্মানদের এ আহ্বানের তীব্র সমালোচনা করে খায়রুন্নেসা জেকব বলেনঃ

"This works better is theory then practice."

অর্থ ঃ "তাদের এ কাজ প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির চেয়ে থিওরী হিসেবে অনেক ভালো।"

উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন একজন মুসলিম মহিলা একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে চাকরির জন্য আবেদন করলে শুধুমাত্র হিজাব পরার কারণে তার ইন্টারভিউ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো হয়। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম মহিলারা তাদের হিজাব পরার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয়। জার্মানীতে যে সকল মুসলিম ছাত্রীরা স্কার্ফ পরে স্কুলে যায় তাদেরকে নানাভাবে বিদ্রূপ করা হয় এবং তাদেরকে স্কার্ফ

www.pathagar.com

না পরে স্কুলে যাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ জোর করে মুসলিম ছাত্রীদেরকে ছেলেদের সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার জন্য বাধ্য করছে।

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচার সত্ত্বেও খায়রুন্নেসা নিজে হিজাব পরিধান করেন এবং অন্যান্য মুসলিম মহিলাদেরও হিজাব পরতে উৎসাহিত করেন। মহিলাদের হিজাব পরার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনিও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলছেন। হিজাব পরার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"I wear the Hijab for Allah : it makes me strong for Islam. The Hijab shows me that I am a woman, because I am proud to be a woman and most of all, because I am proud to be a Mother."

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহর জন্য হিজাব পরিধান করি ; কারণ ইসলামের ওপর টিকে থাকার জন্য হিজাব আমাকে সাহায্য করে। হিজাব আমাকে একজন নারী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়, সে জন্য আমি গর্বিত এবং সর্বোপরি একজন মা হিসেবেও আমি গর্ববোধ করি।"

এ মহিয়সী নারী হিজাব পরিধান সম্পর্কে আরো দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন ঃ

"Let us remember that the Hijab of the Muslim woman is the banner of Islam in our Continual Jihad (internal and external strugle) for the cause of Allah. May Allah always guide us to the right path, Insha Allah."

অর্থ ঃ "হিজাব মুসলিম মহিলাদের জন্যে ইসলামের প্রতীক যা আমাদেরকে আল্লাহর পথে অব্যাহতভাবে সংগ্রাম (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) করতে সাহায্য করে। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত করবেন–ইনশাআল্লাহ্।"

খায়রুন্নেসা জেকবের দাওয়াহ কাজের প্রধান ক্ষেত্র হলো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও মহিলারা। তিনি জার্মান ভাষায় তাদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। খায়রুন্নেসা জেকব স্কুলে ঘুরে ঘুরে মুসলিম ছাত্রীদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

www.pathagar.com

ছাড়াও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুসলিম মহিলাদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করেন। এ মহিয়সী মহিলা ইসলাম প্রচার ও প্রসারকে জীবনের একমাত্র মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সকল প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে নিজের মিশনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুসলিম মহিলাদেরকে হালাল খাদ্য সরবরাহ করার জন্য তিনি নিয়মিত ভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

জেকব দম্পতি জার্মানীর যে শহরে বসবাস করেন সেখানে কোনো মসজিদ না থাকায় জেকব দম্পতি তাদের বাড়ীর একটি কক্ষকে ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন। আব্বাস জেকব প্রতি শুক্রবার নির্ধারিত কক্ষে সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। প্রথমে তিনি জার্মান ভাষায় খুতবা দেন পরে তা আরবীতে অনুবাদ করে শোনান এবং বসনীয় ভাষায় ব্যাখ্যা প্রদান করেন। জার্মানীর বিভিন্ন এলাকার পাঁচশতটি স্থানে নামাযের ব্যবস্থা রয়েছে তবে মসজিদের সংখ্যা ৫/৬টির বেশি নয়। নামাযের জন্য আযান দেয়ার কোনো অনুমতি জার্মানীতে নেই।

জার্মানীতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁরা মুসলিম বিশ্ব থেকে কোনোরূপ আর্থিক সহযোগিতার পরিবর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণ কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য সরবরাহের জন্য রাবেতা আলমে ইসলামীর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানান। জেকব দম্পতি ১৯৮৮-১৯৮৯ সালে ওমরাহ পালন করেন এবং ১৯৯০ সালে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। রাবেতা আলমে ইসলামীর মেহমান হিসেবে ১৯৯৩ সালে তাঁরা পুনরায় হজ্বব্রত পালন করেন।

ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তাঁদের সকল তৎপরতা আল্লাহ কবুল করুন এবং এ তৎপরতা তাঁদের পরকালীন নাজাতের উছিলা হোক এটাই আমাদের কামনা।

জার্মানীর ন্যায় অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহেও ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা নিরসনের জন্য আব্বাস-খায়রুন্নেসা দম্পতির ন্যায় আরো দম্পতিদের আবির্ভাব ঘটুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, সেপ্টেম্বর, '৯৪।

www.pathagar.com

জিবুতি ঃ হর্ন অব আফ্রিকা

জিবুতি আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ। আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। অন্ধকার মহাদেশ বলে পরিচিত আফ্রিকা। অথচ এ অন্ধকার মহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে রাসূলে করীম (স)-এর মক্কী জীবনেই। হযরত ওসমান (রা)-এর নেতৃত্বে ১৫ জন মর্দে মুজাহিদ সর্বপ্রথম আফ্রিকার অবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন। তাঁদের এ হিজরতের মধ্যদিয়েই ইসলামের আলো অন্ধকার বিদূরিত করে আফ্রিকার জনগণকে আলোকিত রাজপথের সন্ধান দেয়। এ আলোকিত রাজপথ আজ অনেক প্রশস্ত ও বিস্তৃত।

দেশটি বিগত কয়েক দশক ধরে উপজাতীয় কোন্দলের শিকার। এ কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ইতোমধ্যেই বহু বনী আদম প্রাণ হারিয়েছে। আফ্রিকার শৃংগ বলে পরিচিত এ দেশটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বহু উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু কোনো উদ্যোগই সফল হয়নি। দেশটির শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে অতি সাম্প্রতিককালে বিদ্রোহী উপদলগুলোর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জিবুতি প্রজাতন্ত্রের রাজধানী রেড সি স্টেট-এ এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। শান্তিবাদী মানুষ আশা করছে এ চুক্তির ফলে উপজাতীয় কোন্দলের চির অবসান ঘটবে এবং দেশের সর্বত্রই শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে।

বিবদমান পৌত্তলিক ও ঈসা গ্রুপের মধ্যে চলে আসা এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত দীর্ঘ দিনের। তাদের এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাঝে মাঝে প্রচণ্ড সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ বিবদমান গ্রুপগুলো একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পূর্ব হতেই ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। এ ধ্বংসাত্মক কাজের মাধ্যমে একটি গ্রুপ অপর গ্রুপকে নিশ্চিহ্ন করে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করার স্বপ্নে বিভোর। তাদের এ অনাকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন একটি দেশের স্থিতিশীলতা, সংহতি ও সমৃদ্ধিকে প্রচণ্ডভাবে প্রশ্নবোধক করে রেখেছে। জাতীয় সমৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য এ অনাকাঙ্ক্ষিত বিরোধ মীমাংসায় সাম্প্রতিক কালের চুক্তিটি শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জিবুতির বিবদমান প্রধান দুটি গ্রুপের কয়েক দশকের মন কষাকষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মতভেদ এ উর্বর ও সমৃদ্ধিশালী দেশটির অগ্রগতিকে শ্লথ করে দিয়েছে। গৃহযুদ্ধে দেশটি ক্ষত-বিক্ষত। প্রাকৃতিক সম্পদে উর্বর

www.pathagar.com

এ দেশটিকে দ্রুত উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে হলে বিবদমান প্রধান প্রধান গ্রুপগুলোর মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়ন প্রয়োজন। দেশে বিরাজমান অশান্তির পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে জিবুতিবাসীদের নিপুণতা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি দেশের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এক সময় জিবুতি ইথিওপিয়ার ঔপনিবেশ ছিল। হাইলে সেলাসীর নিষ্ঠুর নির্যাতনের ফলে জিবুতিবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো দলিত মথিত হয়ে যায়। সম্রাট হাইলে সেলাসী অত্যন্ত ধূর্ত ও কায়েমী স্বার্থবাদী ছিল। তার নিষ্ঠুরতার কথা জিবুতিবাসী কখনো ভুলতে পারবে না। ষাটের দশকে জিবুতির জনগণ প্রতিবেশি সোমালিয়ার রাজনৈতিক সংস্কারের আলোকে জিবুতিকে পুনর্গঠন করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। সোমালিয়ার রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাব জিবুতির জগণকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। জিবুতির জনগণের এ রাজনৈতিক আগ্রহ তাদেরকে এ্যাকার ও ঈসা গ্রুপে বিভক্ত করে ফেলে। তাদের এ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য দেশটির ঐক্য, সংহতি ও স্থিতিশীলতাকে প্রশ্নবোধক করে তোলে। দেশের সুন্দর ভবিষ্যত এ উপদলীয় কোন্দল অবসানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

জিবুতি এক সময় ফ্রান্সের ঔপনিবেশ ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে কলোনী শাসনের অবসান হয় এবং দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটি যাতে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে না পারে সে জন্য ফ্রান্স দেশটিতে জাতিগত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ইন্ধন দেয়। ফলে দেশের রাজনৈতিক আকাশ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এমনি একটি মুহূর্তে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী নেতা মুহাম্মাদ হারবী ফ্রান্সের গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। তাঁর হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে ক্ষুদ্র উপদলীয় নেতা এ্যাকার (নেতা) আলী আরিফ বোরহান আপাততঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং উপজাতীয় দ্বন্দ্বে তিনি অত্যন্ত হিংস্র ও ভয়ংকর কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। এ্যাকার নেতা আলী আরিফ বোরহানের এ হিংস্র মনোভাবের কারণে মুহাম্মাদ হারবীর অনুসারী জাতীয়তাবাদী নেতা হাসানের আন্দোলনে কিছুটা ভাটার টান পড়ে। জিবুতির স্বাধীনতা আন্দোলনে সোমালিয়া ও আরব লীগ জাতীয়তাবাদী গ্রুপকে সমর্থন করে। তারা জাতিসংঘ কমিশনের আওতায় দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্য একটি গণভোটের আয়োজন করার পক্ষে মত দেয়। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বি গ্রুপগুলো ফ্রান্সের কলোনী শাসন অব্যাহত রাখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

জিবুতির স্বাধীনতা উপদলীয় কোন্দলকে দূর করে পারেনি। ফলে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সেখানকার নিত্য দিনের ঘটনা। ক্ষমতার ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব কোনো দেশেই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। জিবুতির ক্ষেত্রেও এ সত্যটিই আবার প্রমাণিত হলো। দেশকে গড়তে হলে দেশের মানুষকে ভালো বাসতে হবে এবং ক্ষমতার জন্য ক্ষুধার্ত কুকুরের ন্যায় না দৌড়িয়ে দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে। তাহলেই একদিন জনগণ তাদের পরীক্ষিত নেতা ও দলকে ক্ষমতায় বসাবে এটাই গণতন্ত্রের মূলকথা। এ মূলমন্ত্র যে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনুসরণ করবেন সে দেশে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অপ্রত্যাশিতভাবে কমে আসবে এবং দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আশানুরূপ ফল লাভ করবে। এটা জিবুতির ক্ষেত্রে যেমন সত্য অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। এ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই সকল রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের কাজ করা প্রয়োজন। দেশের ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা এবং গণতন্ত্র কায়েমের জন্য অতি সম্প্রতি জাতীয়তাবাদী নেতা হাসান ও সরকারের মধ্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তি বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যত। এ চুক্তি মুতাবেক দেশের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসন করতে সক্ষম হলে দেশের অচলাবস্থার নিরসন হবে এবং দেশটি হংকং-এর ন্যায় একটি সমৃদ্ধশালী দেশে দ্রুত উন্নীত হতে পারবে বলে জিবুতিবাসী মনে করে। আমরাও জিবুতিবাসীর এ মহৎ প্রত্যাশার সাথে একমত।

কৌশলগত দিক থেকে জিবুতি একটি পোতাশ্রয় বিশিষ্ট নগর। ইথিওপিয়ার সাথে রয়েছে এর সংযোগ। এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলো জিবুতিকে একটি ফ্রি জোন হিসেবে দেখতে চায়। যাতে তারা জিবুতির ওপর দিয়ে অবাধে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এক দেশ থেকে অপর দেশে যাতায়াত করতে পারে।

জিবুতির বিবদমান গ্রুপগুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, তাদের দীর্ঘদিনের উপদলীয় কোন্দল দেশ ও জনগণের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি বরং সাম্প্রতিককালে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যেই দেশ ও জনগণের উন্নতি নিহিত রয়েছে। চুক্তিটির অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, জিবুতির বর্তমান সংবিধানকে সময়ের চাহিদানুযায়ী নতুনভাবে সাজানো এবং বিবদমান গ্রুপগুলোর সদস্যদেরকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে উপযুক্ততার ভিত্তিতে সমন্বয় করা। জিবুতি অতি সাম্প্রতিককালে ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়ার সাথে পৃথক পৃথক চুক্তির মাধ্যমে এ অঞ্চলে

www.pathagar.com

শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চুক্তির ফলে অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য জিবুতি যে উদ্যোগ নিয়েছে তা আগামী দিনের সমৃদ্ধিশালী জিবুতি প্রতিষ্ঠায় মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে জিবুতিবাসীর বিশ্বাস। আফ্রিকার হর্ন বলে পরিচিত জিবুতি এ অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধিশালী দেশে উন্নীত হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, মার্চ, ১৯৯৫।
২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

কসোভো এবং মেটোহিয়ায় ইসলাম ঃ অতীত ও বর্তমান

কসোভো এবং মেটোহিয়া একটি স্ব শাসিত দেশ। এর দক্ষিণে সার্বিয়া, পূর্বদিকে মেসিডোনিয়া, পশ্চিম দিকে আলবেনিয়া। সার্বিয়ান রিপাবলিকের নিয়ন্ত্রণাধীন স্ব শাসিত এ দেশটিতে ৮০% মুসলমান এবং বাকীরা আলবেনীয় পৌত্তলিক।

তুর্কী শাসনামলে চৌদ্দ শতকে সর্বপ্রথম এ ইউরোপীয় দেশটিতে ইসলামের আগমন ঘটে। প্রিস্টিনা এর রাজধানী। রাজধানী শহরটি আধুনিক শিল্প কল-কারখানায় সমৃদ্ধ একটি অত্যাধুনিক শহর। রাজধানীতে মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী বড় বড় ইমারত দেখতে পাওয়া যায়। রাজধানী শহরে অবস্থিত প্রিস্টিনা বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। এতে প্রধানতঃ দুটি ফ্যাকাল্টি রয়েছে। প্রথমতঃ ইসলামী সংস্কৃতি বিভাগ এবং দ্বিতীয়তঃ সনাতন ভাষা বিভাগ।

১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী কসোভোর জনসংখ্যা ২ মিলিয়ন। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১১৫ জন লোক বসবাস করে। জন্ম হার প্রতি হাজারে ৩৫.৩%। অপরদিকে ১৯৮৯ সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়। কসোভোর জনসংখ্যার ৭৩.৮% অলবেনীয়, ১৮% সার্বিয়ান, ২২% তুর্কী মুসলমান, ২.৫% মন্টোনিগ্রিয়ান এবং ৯.২% রোমানীয়। আলবেনীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। নির্ভরযোগ্য একটি স্বতন্ত্র সূত্র থেকে জানা যায় কসোভো এবং মেটোহিয়ার জনসংখ্যার ৮০% ভাগেরও বেশি মুসলমান। অধিকাংশ লোক আলবেনীয় ভাষায় কথা বলে। তবে সার্বীয়রা তাদের নিজস্ব ভাষা চর্চা করে থাকে। আলবেনীয় বংশোদ্ভূত লোকেরা অত্যন্ত সাহসী এবং শারীরিক দিক থেকে বেশ সামর্থবান।

সমগ্র কসোভোর ১০৮৮৭ বর্গ কিলোমিটার পাহাড় পর্বতে ঘেরা। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম সার পাহাড় যার উচ্চতা ২০০০ মিটার। প্রাক লেমিয়া পাহাড়ও একই উচ্চতা বিশিষ্ট। এ পাহাড় দুটি সমগ্র কসোভো অঞ্চলের দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাংশ আবৃত করে রেখেছে। কসোভোর সমতল ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মিটার উচুঁতে অবস্থিত। কসোভোর আবহাওয়া মিশ্র ঠাণ্ডা ও রৌদ্র করোজ্জল শীতকাল এবং গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম।

www.pathagar.com

কসোভো এবং মেটোহিয়া অঞ্চলে আলবেনীয় উপজাতিরা সর্বপ্রথম বসতিস্থাপন করে। এ উপজাতিটি ডারডানিয়া উপজাতি হিসেবে পরিচিত। তাদের একটি আদি রাষ্ট্র ছিল যা 'ডারডানিয়া' হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত। এ "ডারডানিয়া" রাষ্ট্রটিই আজকের কসোভো অঞ্চল হিসেবে পরিচিত।

১৬৮ খৃস্টাব্দে 'কসোভো' রোমান শাসনাধীনে চলে যায় এবং পরবর্তীকালে তা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সার্বিয়ান সাম্রাজ্য কসোভো আক্রমণ করে তা দখল করে নেয় এবং সমগ্র কসোভো অঞ্চল সার্বিয়ান শাসনাধীনে চলে যায়।

১৩৮৯ খৃস্টাব্দে কসোভোর সমতল ভূমিতে সার্বিয়া বাহিনীর সাথে ইসলামী বাহিনীর এক যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে সুলতান মুরাদ শাহাদাত বরণ করেন। সুলতান মুরাদের রক্তাক্ত দেহই কসোভোর আকাশে ইসলামী পতাকা উড্ডীন করে। আর এ রক্তাক্ত পথ ধরেই কসোভো তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কসোভো অঞ্চলটি তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে কসোভোতে বসবাসকারী আলেবনীয় বংশোদ্ভূত সকল নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে ঘোষণা করে। এভাবে কসোভো অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র কসোভো অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসার পর মুসলিম শাসকরা এ অঞ্চলের সমস্ত জনগোষ্ঠির নিকট ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বহু মসজিদ, মাদরাসা, কুরআনিক মক্তব ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য মুসলিম শাসকরা সময়ের চাহিদানুযায়ী অনেক হাসপাতল স্থাপন করে। কসোভো এবং মেটোহিয়ার মসজিদসমূহে বয়স্ক লোকেরা কুরআন শিক্ষা করতো এবং মাদরাসা, মক্তব ও কুরআনিক স্কুলে মুসলিম ছেলেমেয়েরা ইসলামী শিক্ষা অর্জন করতো। মুসলিম কবি হাসান জেকো ক্যাম্বাধীর কবিতা স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণ ভরে আবৃতি করতো। তিনি তুর্কী সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ১৭৮৯ সালের সংঘটিত অস্টো-তুর্কী যুদ্ধের জন্য তাঁকে সেনাবাহিনীতে রিক্রুট করা হয়। তাঁর লিখিত ইসলামী গান সেনাবাহিনীর সদস্যসহ সাধারণ মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রসূলে করীম (স)-এর জন্ম দিবসে প্রিস্টিনার রাজকীয় মসজিদে কবি হাসানের কবিতা ব্যাপকভাবে আবৃত করা হতো।

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দির শুরুতে কসোভো ও মেটোহিয়ার অধিবাসীরা তুর্কী শাসন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং তুর্কী সৈন্যবাহিনীকে স্বেচ্ছায় স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য আহবান জানায়। এ সময় কসোভো অঞ্চলে তুর্কী সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন প্রখ্যাত আরব চিন্তাবিদ ব্রিগেডিয়ার সাদাত আল হোসারী। তিনি কসোভোবাসীর দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে স্বদেশে ফিরে আসেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে, কসোভোবাসী যে দাবী তুলেছে তা কালক্রমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ নেবে এবং এ আন্দোলনকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য তারা যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্যত হবে। সুতরাং স্বেচ্ছায় কসোভোর শাসন ক্ষমতা কসোভোবাসীর হাতে ছেড়ে দিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করাই শ্রেয়। তার এ উপলব্ধির ফলেই তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জাতীয়তাবাদের ওপর লেখনী ধারণ করেন এবং প্রথমেই তিনি আরব জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে লেখা শুরু করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কসোভো এবং মেটোহিয়া সার্ব, ক্রোটস এবং শ্লোভেনস তথা যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। কসোভো এবং মেটোহিয়া যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবার পর এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এবং মুসলমানদেরকে তাদের তাবেদার করে রাখা হয়।

কসোভো এবং মোটাহিয়া অঞ্চল বা প্রদেশের প্রধান শহর হলো প্রিস্টিনা। ৫৫ হাজার লোক এ শহরে বসবাস করে। প্রিষ্টিনা শহরটি অল্প দিনের মধ্যেই একটি অন্যতম বাণিজ্যিক শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রিস্টিনা শহরটি একটি আধুনিক শহরে উন্নীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এখানে বহু শিল্প-কলকারখানা, বহু সংখ্যক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এ শহরের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও স্মৃতিস্তম্ভগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো চৌদ্দ শতকের ইম্পেরিয়াল মসজিদ, উনিশ শতকের টাওয়ার ঘড়ি ইত্যাদি। বিশেষ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনসহ বহু ব্যয়বহুল ভবন প্রিস্টিনা শহরে নির্মাণ করা হয় যা কালের স্বাক্ষী হিসেবে আগামী দিনের প্রজন্মের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কসোভোর মিউজিয়ামের অন্যতম আকর্ষণ হলো একটি বিখ্যাত নৌকা। এ ছাড়াও কসোভোর মিউজিয়াম অত্যন্ত মূল্যবান ও বিরল সম্পদে সমৃদ্ধ। কসোভোর ঐতিহাসিক ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ক্যারোই দ্রামিজা, চৌদ্দ শতকের মসজিদ, সুলতান মুরাদের সমাধি এবং কসোভো বিশ্ববিদ্যালয়। কসোভোর অন্যান্য মুসলিম নিদর্শনগুলো মধ্যে

www.pathagar.com

অন্যতম হলো 'বিসক্রিসট্সা' নদীর ওপর নির্মিত ১৫ শতকের সেতু, সিনান পাশার নির্মিত সতের শতকের মসজিদ, চৌদ্দ শতকের শুরুতে নির্মিত বোগোডিটসা গীর্জা প্রভৃতি।

কসোভো এবং মেটোহিয়ার জনগণ তাদের ইসলামিক পরিচিতির জন্য অত্যন্ত গর্বিত। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কসোভোর আলবেনীয় মুসলমানেরা তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট এখনও বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলিম বিশ্ব কসোভো ও মেটোহিয়ার মুসলমানদেরকে ভুলে যেতে পারবে না। কারণ তাদের মাধ্যমেই ইসলাম পূর্ব ইউরোপ এবং মেডিটারিয়ান অঞ্চলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

কসোভীয়ান জনগণ উসমানীয় খেলাফতের রাজকর্মচারী হিসেবে শত শত বছর কাজ করেছে। সিনান পাশা এবং আহমেদ পাশার নাম আজো তুর্কী সেনাবাহিনীতে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। কারণ উসমানীয় খেলাফতের শাসনামলে এ দু'ভাই তুর্কী সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তুর্কী সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকার সুবাধে কসোভোবাসীরা আধুনিক যুদ্ধ সম্পর্কে নৈপুণ্য অর্জন করে এবং আরবী ও ফার্সী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে। তারা আরবী ভাষায় কুরআনের তাফসীর, ফিকাহশাস্ত্র এবং হাদীস শিক্ষা লাভ করে যা তাদেরকে সত্য সন্ধানী হতে প্রেরণা যোগায়।

মুসলিম শাসনামলে কসোভোকে কবিদের পুণ্যভূমি বলে অভিহিত করা হতো। কারণ এ সময়ে কসোভোয় বহু কবির জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হেলমি মালেচি, কাইক মালোকো ও মুহারিন মাহজুমী।

এ কবিরাই এ সময়ে ইসলামের মৌলিক মানবীয় দিকসমূহ কবিতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন। এতে আকৃষ্ট হয়েই সর্বস্তরের মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে শামিল হয়।

কসোভো এবং মেটোহিয়ার মুসলমানরা আবার তাদের স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে জেগে উঠুক এবং কসোভো এবং মেটোহিয়ায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হোক এটাই কসোভোবাসীর সাথে আমাদেরও প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওর্য়াল্ড লীগ জার্নাল, জুলাই' ১৯৯৫।

www.pathagar.com

নাইজেরিয়ায় শরীয়া আইন ঃ
বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস

আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন ১,১৬,৯৯,০০০ বর্গ মাইল। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। মোট ৫৫টি দেশের সমন্বয়ে আফ্রিকা মহাদেশ গঠিত। নাইজেরিয়া এর অন্যতম।

নাইজেরিয়া পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এর আয়তন ৯,২৩,৭৭৩ বর্গ কিলোমিটার। লাগোস এর রাজধানী।

উত্তর নাইজেরিয়ার একটি প্রদেশ Kano। গত ২১ জুন ২০০০ ইং তারিখে ৫০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে প্রদেশটিতে শরীয়া আইন জারী করা হয়। অবশ্য এর পূর্বে Zamfara, sokoto ও Niger এ শরীয়া আইন বলবৎ করা হয়।

Kano একটি অত্যন্ত পুরনো শহর। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রায় ১০০০ বছর পূর্ব থেকেই মুসলমানরা এখানে বসবাস করতো। Kano-এর অধিবাসীদের মধ্যে ৯০%ই মুসলমান। Kano প্রদেশটি নাইজেরিয়ায় ইসলামের শক্ত ঘাটি হিসেবে পরিচিত। তাই অনেকে বলে থাকেন, "Kano is a bedrock of Islam in Nigeria." Kano প্রদেশের শত শত মসজিদ ও ইসলামী স্কুল সে অঞ্চলে ইসলামের সুদৃঢ় অস্তিত্বের কথাই স্বগৌরবে ঘোষণা করছে। অপরদিকে শত শত বছর ধরে ইসলাম এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গণ্য হয়ে আসছে। Kano প্রদেশের মুসলমানরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী অনুশাসনগুলো কঠোরভাবে মেনে চলছে। শুক্রবারে Kano শহরে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। হাজার হাজার মানুষ জুমার নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আগমন করে। শুক্রবারে মসজিদে মুসল্লীদের জায়গা হয় না। মসজিদ সংলগ্ন রাস্তাগুলো তখন নামাযীদের দখলে চলে যায়। নামাযীদের এ দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন গোটা শহরটাই একটি মসজিদ। এ দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব।

নাইজেরিয়ায় ইসলামের আগমন কখন ঘটেছে তার তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে সে দেশের Muslim Educational Quarterly

www.pathagar.com

Magazine সম্প্রতি একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, ১০৮৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১০৯৭ খৃস্টাব্দের মধ্যে নাইজেরিয়ায় প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে। ১০৮৫ সাল থেকে ১৪০০ সালের শুরু পর্যন্ত ইসলাম ধীরে ধীরে নাইজেরিয়ায় বিকশিত হতে থাকে এবং ১৪০০ সালের প্রথমার্ধে মুসলিম স্কলাররা সেদেশে ইসলামের ব্যাপক পরিচিতি তুলে ধরেন। এভাবেই ইসলাম নাইজেরিয়ায় একটি অপ্রতিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নব উদ্যমে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ Othman Dan Fodio-এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই সর্বপ্রথম নাইজেরিয়ার Hausa city states গুলোতে ইসলামী আইন কার্যকর করেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Kano-তেই সর্বপ্রথম শরীয়া আইন কার্যকর করা হয়নি বরং ১৪০০ ও ১৫০০ শতকের মাঝামাঝি সময়েই Othman Dan Fodio নাইজেরিয়ায় সর্বপ্রথম শরীয়া আইন কার্যকর করেছিলেন। শরীয়া আইনের এ ধারাবাহিকতা ১৯০৪ সাল পর্যন্ত উত্তর নাইজেরিয়ায় বলবৎ ছিল। নাইজেরিয়া দীর্ঘদিন যাবত বৃটেনের উপনিবেশ ছিল। এ সময় ঔপনিবেশিক সরকার পর্যায়ক্রমে বৃটিশ আইন সে দেশে বলবৎ করে। ফলে শরীয়া আইন রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনে পরিণত হয়। এভাবেই শরীয়া আইন ঔপনিবেশিক শাসনামলে সীমিত পরিসরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে ফেডারেল নাইজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের শরীয়া আইন প্রথাগত আইনে পরিণত হয়।

সাম্প্রতিক কালে নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোর মুসলমানরা শরীয়া আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে বলবৎ করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রেখেছে। মুসলমানদের এ অব্যাহত দাবীকে অগ্রাহ্য করার জন্য খৃস্টান সংগঠনগুলোও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে শরীয়া আইন বাস্তবায়নের পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এ অন্তরায় দূর করার জন্য ফেডারেল নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলের ১৯টি প্রদেশের গভর্নররা খৃস্টান নেতাদের সাথে ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে এক বৈঠকে মিলিত হন যাতে শরীয়া আইন বলবৎ করা হলে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা না ঘটে। এ আলোচনা অব্যাহত থাকাকালীন গত অক্টোবর মাসে Zamfara প্রদেশে শরীয়া আইন কার্যকর করা হয়। Zamfara প্রদেশে শরীয়া আইন সফলভাবে বলবৎ করার পর স্বল্পসময়ের মধ্যেই Sokoto, Niger ও Kano তে শরীয়া আইন বলবৎ করা হয়। চারটি প্রদেশে শরীয়া আইনের

www.pathagar.com

সফল বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করে Katsina ও Kaduna প্রদেশের গভর্নররাও সে প্রদেশ দুটিতে শরীয়া আইন বলবৎ করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন। শরীয়া আইন বাস্তবায়ন করার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে ইতোমধ্যে Katsina প্রদেশে পতিতাবৃত্তি, মাদক দ্রব্য এবং জুয়া খেলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

Kano প্রদেশে শরীয়া আইন বলবৎ করার পর এক সাক্ষাতকারে Kano প্রদেশের প্রধান ইমাম শেখ ঈসা ওয়াজিরী বলেন ঃ

"Ninety percent of Kano people are Muslims and as Muslims they have to support shariah, which is sent by Allah. There is no going back."

অর্থ ঃ "ক্যানো প্রদেশের শতকরা ৯০জন লোক মুসলমান হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ আইনকে সমর্থন করে। কারণ তাদের পেছনে ফেরার কোনো সুযোগ নেই।"

তিনি আরো বলেন, "Kano-এর মুসলমানদের শরীয়া আইনের অধীনে বসবাস করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং খৃস্টানদের উচিত মুসলমানদের এ অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করা।"

শেখ ওয়াজিরী আরো বলেন, "শরীয়া আইন মানুষের নৈতিক উৎকর্ষতা সাধনে সাহায্য করে এবং সমাজ থেকে অন্যায় ও পাপাচার দূর করে। তাই প্রতিটি জনপদেই শরীয়া আইন কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।"

Kano-এর গভর্নর সেদেশে শরীয়া আইন কার্যকর করার কথা ঘোষণার সাথে সাথে লাখ লাখ মানুষের এক বিরাট শোকরানা মিছিল বের হয়। মিছিলকারীদের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তোলে। মানুষের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এবং অনেকে পরম প্রশান্তির সাথে রাজপথে সেজদায় লুটিয়ে পরে। সত্যিই কি অপূর্ব দৃশ্য ! Kano-র ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ জনাব আবু বকর মিকাইল হাসান শরীয়া আইন বলবৎ করার প্রাক্কালে এক সাক্ষাতকারে বলেন ঃ

"We Muslims have been yearing to see the shariah code be implemented for many years. It is our right, we are grateful to God Almighty that shariah will be implemented today."

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "আমরা মুসলমানরা বহু বছর যাবত গভীর উৎসুকের সাথে শরীয়া আইন বাস্তবায়ন লক্ষ করে আসছি। এটা আমাদের অধিকার এবং আমরা মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ এজন্য যে, আজ আমাদের অঞ্চলে শরীয়া আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে।"

শরীয়া আইন বলবৎ করার পূর্বে সরকার আশংকা করছিল যে, খৃস্টানরা এ সুযোগে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সরকার সম্ভাব্য বিশৃংখলা রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু শরীয়া আইন ঘোষণা দেয়ার পর দেশের কোথাও কোনো সহিংসতা ঘটেনি। বরং সারাদেশে শোকরানা ও শান্তি মিছিলের মাধ্যমে এ ঘোষণাকে স্বাগত জানানো হয়।

Kano-র জনগণ কর্তৃক শরীয়া আইনকে স্বাগত জানানোর মধ্যদিয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি জনপদে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পথ সুগম হলো।

Kano-র পথ ধরে আগামী দিনের মুসলিম বিশ্ব ইসলামী বিশ্বে রূপান্তরিত হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড (মক্কা), জুলাই ৭, ২০০০।

www.pathagar.com

বসনিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান

বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ইউরোপের বলকান উপদ্বীপের একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এর আয়তন ১৯,৭৪১ বর্গমাইল (৫১,১৭০ বর্গকিলোমিটার)। ১৯৯৭ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ২৬,০৭,৭৩৪ জন। জনগণের ৪০% সার্ব, ৩৮% মুসলমান এবং ২২% ক্রোট। জনসংখ্যার ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মুসলমান ৪০%, অর্থোডক্স ৩১% এবং রোমান ক্যাথলিক ১৫%। দেশটির রাজধানী সারাজেভো। দেশটি একসময় সমাজতান্ত্রিক যুগোশ্লাভিয়ার একটি অঙ্গরাজ্য ছিলো।

প্রথম মহাযুদ্ধে অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের পতনের পর ১৯১৮ সালে যুগোশ্লাভিয়ার জন্ম হয়। ১৯২১ সালে দেশটিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট নেতা মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে দেশটি গণপ্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ইতিহাস গবেষকদের কাছ থেকে জানা যায় যে, ১২১০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিশাল অংশ তুর্কী খিলাফতের শাসনাধীন ছিলো। এতো বড় সাম্রাজ্য এর পূর্বে আর কারো ছিলো না। এ সময় আজকের বসনিয়া হার্জেগোভিনাসহ গোটা পূর্ব ইউরোপ তুর্কী খেলাফতের অধীনে ছিলো। বসনিয়া ইতোপূর্বে অধুনালুপ্ত যুগোশ্লাভিয়ার একটি অঙ্গরাজ্য ছিলো। এ যুগোশ্লাভিয়াও ১৩৮৯ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তুর্কী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। যুগোশ্লাভিয়া মুসলিম শাসনাধীনে আসার পূর্বে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা নামে দুটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত ছিলো। ১৩৮৬ সালে তুর্কীরা বসনিয়া অধিকার করে এবং ১৪৮২ সালে হার্জেগোভিনা তুর্কী শাসনাধীনে আসে। পরবর্তীকালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা একীভূত হয়ে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা নামে একটি রিপাবলিকে পরিণত হয়। তুর্কীরাই সারাজেভোকে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। তখন থেকেই সারাজেভো বসনিয়া-হার্জেগোভিনার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন শুরু হলে মুসলমানরা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ রহিত করা হয়। শুধু তাই নয়, মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ইসলামী পরিচয় বহন করার কারণে

www.pathagar.com

তিরস্কার করা হতো। কমিউনিস্ট শাসন দেশে ইসলামী শরীআতকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে। এমনকি বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার আইনকে নিষিদ্ধ করা হয়। এমনি একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানরা তাদের আদর্শিক স্বাতন্ত্র বজায় রাখার লক্ষে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারীতে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় পরিচয় না দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু মুসলিম নেতৃবৃন্দ সরকারের এ চাপের নিকট মাথানত না করে নিজেদের আদর্শিক পরিচয় ও তাহযীব-তমদ্দুনকে আঁকড়ে ধরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে তাদের ওপর নেমে আসে যুলুম ও নির্যাতন। এ নির্যাতনের ধারাবাহিতকতায় ১৯৮১ সালের ৮ এপ্রিল ৫০ জন মুসলিম নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিলো এরা বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে একটি মুসলিম কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষে The young Muslim or-ganization নামে একটি সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলেছিল এবং মুসলিম দেশসমূহের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্যোগ নিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে এরাই ছিলো বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় ইসলামী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। এদের সাহসী তৎপরতা বসনীয় মুসলমানদেরকে আশার আলো দেখিয়েছিলো। কিন্তু নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার ও দমননীতির ফলে খানিকের জন্য হলেও তাদেরকে আশাহত হতে হয়। গ্রেফতারকৃত নেতৃবন্দকে সরকার প্রহসনমূলক বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। ১৯৮৩ সালের ২০ আগস্ট বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়। এতে ১২ জন মুসলিম নেতাকে ১০-১৫ বছর মেয়াদী কারাদণ্ড দেয়া হয়। এদের মধ্যে স্বাধীন বসনিয়া-হার্জেগোভিনার প্রথম প্রেসিডেন্ট আলিজা ইজ্জেত বেগোভিচ ছিলেন অন্যতম। তাঁকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

বসনীয় মুসলমানরা শত নির্যাতন ও নিষ্পেষণের মধ্যেও তাদের আদর্শিক স্বাতন্ত্রকে বিসর্জন দেয়নি এবং আদর্শিক স্বাতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অব্যাহতভাবে সংগ্রাম করে আসছে। এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতা ঘোষণার পর বসনীয় স্বাধীনতাকামীরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইউরোপীয় কমিউনিটির স্বীকৃতির জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু ইউরোপীয় কমিউনিটি স্বাধীনতার ঘোষণাকে স্বীকৃতি না দিয়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষে গণভোট গ্রহণের পরামর্শ দেয়। এ পরামর্শের ফলে ১৯৯২ সালের

www.pathagar.com

মার্চ মাসে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটের রায় স্বাধীনতার পক্ষে এলে প্রেসিডেন্ট আলিজা ইজেত বেগোভিচ পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা ঘোষণার পর সার্ব সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র গ্রুপগুলো নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা, গণধর্ষণ ও জাতিগত শুদ্ধি অভিযান। দীর্ঘ দু'বছর অব্যাহতভাবে চলে এ নারকীয় ও লোমহর্ষক গণহত্যা, গণধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ। তথাকথিত সভ্য ইউরোপ ও অসহায় মুসলিম বিশ্ব শুধু তাকিয়ে দেখেছে এ নরমেধযজ্ঞ। হায় সভ্য ইউরোপ! হায় অসহায় মুসলিম বিশ্ব ! কোথায় এ যুগের খালিদ, তারিক, মূসা আর সালাউদ্দিন আইউবী ? কোথায় তাদের খাপমুক্ত তরবারি ? এ প্রেক্ষাপটেই আজ বেশি মনে পড়ে আশির দশকের জনপ্রিয় গীতিকার ও কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি গানের কলি, 'শাহজালালের তলোয়ার দেখে আমি বুঝতে শিখেছি—জিহাদের মানে হলো বাঁচতে শেখা।" সত্যিই আজকের এ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এবং মুসলমানদেরকে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তথা তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে খাপমুক্ত তলোয়ার নিয়েই প্রতিটি মুসলমানকে সটান আলীফের মতোই শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এজন্য প্রয়োজন একজন সাহসী নেতার। মুসলিম বিশ্বে এ ধরনের নেতৃত্বের আজ বড় অভাব। যত দ্রুত এ অভাব দূর হবে তত দ্রুতই মুসলিম বিশ্বের আকাশ থেকে অমাবশ্যার কালো অন্ধকার দূর হবে এবং সুবহে সাদিকের অবসানে সোনালী সূর্য উদিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মুসলিম গণহত্যা বন্ধের জন্য ১৯৯৪ সালে রাশিয়া উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাশিয়ার অনুরোধে গণহত্যা বন্ধ হয় এবং আমেরিকার তত্ত্বাবধানে ১৯৯৪ সালের ২১ নভেম্বর ওহাইও রাজ্যের ডেটনে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ফলে বসনিয়া-ক্রোট ফেডারেল রাষ্ট্র গঠিত হয়। ফেডারেল রাষ্ট্র গঠিত হবার পর ১৯৯৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট পদ ও ফেডারেল সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আলিজা ইজ্জেত বেগোভিচ, ক্রোয়াটদের পক্ষে ক্রেসিমির ঝুবাক এবং সার্বদের পক্ষ থেকে সমসিলো ক্রাজিসনিক নির্বাচিত হন। এরা তিনজনই পর্যায়ক্রমে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রথম নির্বাচনে আলিজা ইজ্জেত বোগোভিচ প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আজ বসনিয়া-হার্জেগোভিনা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৯৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশটির মাথাপিছু আয় ৩০০ ডলার এবং সাক্ষরতার

www.pathagar.com

হার ৮৬%। দেশটিতে মাত্র ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। দেশটির মুদ্রার নাম দিনার (১ ডলার = ৫.৭১ দিনার)।

সম্প্রতি বসনিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি Dr. Mustafa Cerice মক্কাভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা রাবেতা আলমে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন ইসলামিক ফিকাহ্ কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে সউদী আরব সফর করেন। সফরকালীন সময় তিনি "মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল"-এর সাথে একটি সাক্ষাতকার দেন। এ সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তিনি বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন।

Dr. Mustafa Cerice একজন উচ্চশিক্ষিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং শিকাগো ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। পিএইচডি ডিগ্রী লাভের পর ১৯৯১ ইং থেকে ১৯৯৩ ইং পর্যন্ত তিনি International Institute of Islamic Thought-এ অধ্যাপনা করেন। এ প্রাজ্ঞ ইসলামী ব্যক্তিত্ব বর্তমানে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার আসন অলংকৃত করে আছেন। এছাড়াও তিনি রাবেতা আলমে ইসলামীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান Islamic Fiqh Council (Makkah)-এর একজন সদস্য। এ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা যেভাবে অবলোকন করেছেন, সেভাবেই পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমরাও তাঁর সাক্ষাতকারের আলোকে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা বাংলাদেশের সচেতন মুসলমানদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

এক প্রশ্নের জবাবে Dr. Mustafa Cerice বলেন, স্পেনের মুসলিম শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে সে দেশের মুসলমানরা তাদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা, আদর্শিক পরিচয়, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং আরবী ভাষা ও কৃষ্টির কথা ভুলে যায়। ফলে স্পেনীয় মুসলমানরা তাদের মুসলিম পরিচয় ভুলে গিয়ে ইউরোপীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে একাকার হয়ে যায়। এভাবেই স্পেনের এক সময়ের সফল শাসকগোষ্ঠীর পরিচয় কালো মেঘের আবরণে ঢেকে যায়। অপরদিকে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানরা বিগত পাঁচশত বছর যাবত প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে নিজেদের মুসলিম পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বলকান মুসলমানরা আরবী, তুর্কী ও ফার্সী ভাষা ও কৃষ্টিকে দৃঢ় ভাবে আকড়ে ধরে রেখেছে এবং স্বদেশ ভূমির সাথে নিজেদের অস্তিত্ব ও

www.pathagar.com

ভাগ্যকে গভীরভাবে জড়িয়ে রেখেছে। ফলে আদর্শিক স্বাতন্ত্রবোধ ও স্বদেশের (বসনিয়া-হার্জেগোভিনা) প্রতি গভীর মমত্ববোধই বলকান অঞ্চলের মুসলমানদেরকে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে শক্তি যুগিয়েছে। বসনীয় মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় চা চামচে মুসলমানদের তৈল রেখে তা ধরে দণ্ডায়মান থাকার মতই কঠিন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঃ

মুক্তির উপায় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই করাই একমাত্র উপায়। কারণ কুরআনের বহু জায়গায় মধ্যমপন্থা অনুসরণ করার কথাই বলা হয়েছে।

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানরা বর্তমানে অতীতের চেয়ে কিছুটা ভালো অবস্থানে আছে। তারা বর্তমানে স্বাধীনতা ভোগ করছে। তবে Freedom of choice বলতে যা বোঝায়, সে ধরনের স্বাধীনতা তারা ভোগ করতে পারছে না। Freedom আরবী শব্দ হুররিয়াত এর সমার্থক নয় বরং তা ইখতিয়ারের সমার্থক। কারণ ইখতিয়ার বলতে মানুষের অধিকার বুঝায়। সুতরাং ইখতিয়ার বলতে যে স্বাধীনতা বুঝায় বসনীয় মুসলমানরা সে স্বাধীনতা থেকে এখনো বঞ্চিত রয়েছে।

Freedom সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে Dr. Mustafa বলেন, কোনো জনপদের মুসলমানরা যখন অধিকার হিসেবে স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ লাভ করে তখন তাদেরকে স্বাধীনতার সবটুকুই ভোগ করা উচিত নয় বরং কিছু ছেড়ে দিয়ে কিছু ভোগ করা উচিত। পুরো Freedom ভোগ করতে চাইলে প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামোর সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়তে পারে। এতে মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশি। গ্রান্ড মুফতীর মতে, Freedom দু'ভাবে লাভ করা যায়। প্রথমত কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকার বা শক্তি কর্তৃক স্বাধীনতা ভোগের অনুমতি দেয়া এবং দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা অর্জন করা।

এতে বুঝা গেল, যারা স্বাধীনতা অর্জন করছে তারা পুরোপুরিই Freedom ভোগ করতে পারছে। আর যারা স্বাধীনতা ভোগের অনুমতি পেয়েছে তাদেরকে শর্তসাপেক্ষেই সেই স্বাধীনতা ভোগ করতে হয়। স্বাধীনতার পুরো স্বাদ গ্রহণ করতে হলে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই বসনীয় মুসলমানরা মার্শাল টিটোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে রক্ত দিয়ে। আবার সমাজতন্ত্রের পর বসনিয়া-

www.pathagar.com

হার্জেগোভিনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে তা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছে। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা লাভের ঘোষণা দেয়ার কারণেই এ যুগের হিটলার ও হালাকু খান নরপিশাচ কারাদজিক ও মিলোসেভিচরা মুসলমানদের পবিত্র রক্ত নিয়ে হোলিখেলা শুরু করে। এ হোলিখেলায় উৎসাহ যোগায় বৃটেনের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী মি. জন মেজর। তিনি বলেছিলেন, "ইউরোপের বুকে কোনো স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেয়া হবে না।" শুরু হয় মুসলিম নিধনযজ্ঞ। লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর-নারীকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হয়। অনেককে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। আর মুসলিম নারীদেরকে পাইকারীভাবে ধর্ষণ করা হয় যা সাম্প্রতিককালের আদভানী, বাজপেয়ী ও নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় গুজরাটের ঘটনা প্রবাহের সাথেই তুলনীয়। এতো ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় সেই স্বাধীনতাকে কুরআনের ভাষায় "Ikhtiar" হিসেবে অভিহিত করা যায়। বসনীয় মুসলমানরা সেই Ikhtiar অর্থেই স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে নিয়োজিত। বসনীয় মুসলমানদের এ স্বাধীনতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে Dr. Mustafa Cerice বলেন ঃ

> "Freedom is one thing that is not granted by some body. Freedom, meaning Ikhtiar, being able to choose good over the bad and right over the wrong has to be earned and demands a very high price for that. We, in Bosnia-Herzegovian unfortunately have been paying the very high price for this freedom by undergoing suffering, giving blood, leaving orphans and in many other ways. But in the end, you will see, as this freedom is very costly, this freedom cannot be bargained there is nothing, after belief in God and after the salvation in the hereafter, more precious for humans than freedom. This freedom has no meaning without responsibility; and there can be no responsibility without freedom."

অর্থ ঃ "স্বাধীনতা কারো অনুদান নয়। বরং স্বাধীনতার অর্থ হলো 'ইখতিয়ার'–যা খারাপের ওপর ভালো এবং মিথ্যার ওপর সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উচ্চমূল্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে

www.pathagar.com

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদেরকে এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নির্মম নির্যাতন ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগের পাশাপাশি রক্তদান ও সন্তানদের ইয়াতীম করা সহ অসংখ্য দামী নজরানা পেশ করতে হয়েছে। পরিশেষে দেখা যাবে যে, এ স্বাধীনতার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। অথচ স্বাধীনতা কোনো দরকষাকষির বিষয় নয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তিলাভ দুনিয়ার স্বাধীনতা থেকে অনেক বেশি মূল্যবান। দায়িত্ব ছাড়া যেমন স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই ঠিক তেমনি স্বাধীনতা ছাড়াও দায়িত্বের কোনো গুরুত্ব নেই।"

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Dr. Cerice বলেন, "বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানরা ভবিষ্যতে স্বদেশের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্নও হবে না এবং মূল স্রোতধারার সাথে একীভূতও হবে না বরং সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে তারা নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম হবে।" তিনি আরো বলেন, "ইউরোপে মুসলমানদেরকে ব্যক্তিগতভাবে নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যের মাধ্যমেই বেঁচে থাকতে হবে।" তাই ইউরোপের দেশে দেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তোলা সময়ের দাবীতে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। আমরা আশা করবো ইউরোপের মুসলমানরা এই সত্য উপলব্ধি করবেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তুলবেন। এভাবেই মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে প্রতিকূল পরিবেশকে মুকাবিলা করে বেঁচে থাকতে পারবে বলে আশা করা যায়। ১১ সেপ্টেম্বরের পর পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসবাদের সাথে একাকার করে অব্যাহতভাবে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তার মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে ইসলামের সঠিক দাওয়াত নিয়ে অমুসলিমদের কাছে পৌছানোর আহ্বান জানিয়ে Dr. Cerice বলেন, 'রাসূলে করীম (স)-এর অন্যতম প্রধান দু' শত্রু আবু সুফিয়ান ও ওমর ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও মুসলমানদের আকর্ষণীয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। আজকের দিনেও রক্তাক্ত প্রতিটি মুসলিম জনপদের মুসলমানরা ইসলামের মহান সম্পদ কুরআন ও সুন্নাহর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অমুসলিমদের সামনে তুলে ধরে তাদেরকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। এভাবেই মুসলমানদের শত্রুর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে

www.pathagar.com

আশা করা যায়। বসনিয়া-হার্জেগোভিনার নির্যাতিত মুসলমানরাও ইসলামের এ স্বাভাবিক দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের বর্তমান সমস্যা কাটিয়ে উঠে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং সমগ্র বলকান অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য সংগ্রামী প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

❐

www.pathagar.com

আজারবাইজানে ইসলাম ও মুসলমান

মার্ক্স-এঙ্গেলস আর লেলিনের অবৈজ্ঞানিক ও মানবতা বিরোধী মতবাদের নিষ্ঠুর যাতাকলে দীর্ঘ ৭০ বছর শাসিত হবার পর ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে একই বছর ডিসেম্বর মাসে আজারবাইজান স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটির আয়তন ৮৬,৬০০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোক সংখ্যা ৮ মিলিয়নের অধিক। জাতিগত বিশ্লেষণে লোক সংখ্যার ৮৩% আজারী এবং অবশিষ্টরা রুশ, আর্মেনীয় ও অন্যান্য জাতিগত লোক। আজেরীয়দের (আজারবাইজানী) মধ্যে ৭০% শিয়া এবং ৩০% সুন্নী মুসলমান। জনসংখ্যার ৫৪% শহরে এবং ৪৬% গ্রামে বাস করে।

অবস্থানগত দিক থেকে দেশটির দক্ষিণে ইরান, পূর্বদিকে কাসপিয়ান সাগর, পশ্চিমে আর্মেনিয়া, উত্তর-পশ্চিমে জর্জিয়া এবং উত্তরে রাশিয়ান ফেডারেশনের দাগেস্তান স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্র। দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা আজারবাইজানী। এটি একটি দক্ষিণ তুর্কী ভাষা। তুর্কী এবং স্থানীয়দের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা একটি মিশ্র জাতির নাম আজারবাইজানী।

আজারবাইজানের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এ দেশটির নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য ইরান, তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে বহুবার বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ বিরোধ অবসানের জন্য ১৮২৮ সালে তুর্ক-মেনচাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ফলে আরাক নদী বরাবরে দেশটি দু'ভাগে বিভক্ত করে এর উত্তরভাগ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ক্ষমতার পালাবদলের ফলে জারদের শাসনের অবসান হয় এবং বলশেভিকরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বলশেভিক বিপ্লব তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর বলশেভিকপন্থী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয়তাবাদীদের পরাজয় ঘটলে আজারবাইজান সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রভুক্ত হয়। দেশটিতে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর সমাজতান্ত্রিক রুশ সরকার ১৯২২ সালে আজারবাইজান, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়াকে নিয়ে ট্রান্সককেশীয় ফেডারেল সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট প্রজাতন্ত্র গঠন করে। কিন্তু ১৯৩৬ সালে এ ব্যবস্থা ভেঙে আজারবাইজানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গপ্রজাতন্ত্র

www.pathagar.com

হিসেবে পুনর্গঠন করে এর নাম রাখা হয় The Soviet Socialist Republic of Azerbaijan (সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র)।

সোভিয়েত শাসনাধীনে থাকার সময় দেশের অধিকাংশ মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়া হয়। দেশে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট শাসকরা ধর্মীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। শুধু তাই নয় হাজার বছরের আজারীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যিকেও মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এমনি এক কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৭০ বছর পর্যন্ত মুসলমানদেরকে একান্ত ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া পর্যায়ে সীমিত পরিসরে ইসলাম চর্চা অব্যাহত রাখতে হয়। এর ফলে নতুন প্রজন্ম ইসলাম থেকে অনেকটা দূরে সরে যায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ইসলামী নেতৃবৃন্দ এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আজারবাইজানে ইসলামের ইতিহাস অনেক পুরনো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে উতবা ইবনে ফারকাদ আসসালামীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আজারবাইজানের প্রধান শহর তাবরিজ দখলের মধ্যদিয়ে আজারবাইজানে মুসলিম শাসনের শুভ সূচনা করে। হযরত ওমর (রা) উতবা ইবনে ফারকাদকে অজারবাইজানের প্রথম গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তাবরিজকে আজারবাইজানের রাজধানী ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশ আজারবাইজানে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজধানীও পরিবর্তন করে নেয়। একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কী উপজাতীয় সদস্যরা ব্যাপকভাবে আজারবাইজানে এসে বসতি স্থাপন করে এবং পার্সীয়ানদের সাথে একীভূত হয়ে বসবাস করে। এভাবে আজারবাইজানে একটি মিশ্র জাতি সত্তার উদ্ভব ঘটে যারা দীর্ঘদিন আজারবাইজানে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে আজারবাইজান সাফাভী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সাম্রাজ্য তখন ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ ইরান এ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে আজারবাইজান উসমানী খেলাফতের অধীনে আসে এবং সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা উসমানী খেলাফতের শাসনাধীন ছিল।

আজারবাইজানে অনেক প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীর জন্ম হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ

www.pathagar.com

আল খতীব আত্-তাবরীজী, মুজাফফর আত্-তাবরীজী, আবুল ফাতাহ আত্-তাবরীজী, মুহাম্মাদ ইবনে আল-গনী ও ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম। তাঁরা ফিকাহ্শাস্ত্র, ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে এ অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। আজারবাইজানে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষে মক্কাভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণসংস্থা (আইআইআরও) ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ঃ

ক. মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদভিত্তিক মক্তব চালু করণ।

খ. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

গ. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী সাহিত্য বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ।

ঘ. হেলথ কেয়ার সেন্টার ও ল্যাবরেটরী স্থাপন।

ঙ. দুঃস্থ মহিলাদের জন্য সেলাই প্রকল্প পরিচালনা।

চ. ইসলাম প্রচারের লক্ষে দায়ী নিয়োগ।

আজারবাইজানে সাক্ষরতার হার ৯৯%। দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের লক্ষে বেশ কটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. আজারবাইজান টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বাকু।

২. বাকু স্টেট ইউনিভার্সিটি, বাকু।

আজারবাইজানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এখনো সাবেক কমিউনিস্টরা ভিন্ননামে প্রভাব বিস্তার করে আছে। আজারবাইজানে এখনো কোনো শক্তিশালী ইসলামী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। প্রাক্তন কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. পপুলার ফ্রন্ট অব আজারবাইজান

২. সোশ্যাল ডমোক্রেটিক গ্রুপ

৩. আজারবাইজান গ্রীন দল

৪. ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ইনটেলিজেনশিয়া।

আগামী দিনের আজারবাইজানে ইসলামকে মূল রাজনৈতিক নিয়ামক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ইসলামী নেতৃবৃন্দকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে একটি একক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা আশা করবো আগামী দিনের আজারবাইজানের

www.pathagar.com

রাজনীতিকে ইসলামী শক্তির নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ইসলামী নেতৃবৃন্দ সময়ের দাবী অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।

সূত্র ১. মুসলিম জাহান, সোহরাব উদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯ইং

২. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, সউদী আরব, ডিসেম্বর ২০০২ ও জানুয়ারী ২০০৩।

www.pathagar.com

কাজাখস্তানে ইসলাম ও মুসলমান

কাজাখস্তান মধ্য এশিয়ার একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। ১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশটি অধুনালুপ্ত সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট প্রজাতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটির মোট আয়তন ২৭,২৭,১৪৮ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১৯৯৭ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১,৬৮,৯৮,৫৭২। বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার লোকেরা এখানে বসবাস করছে। জাতিসত্ত্বার ভিত্তিতে কাজাখ ৪২%, রুশ ৩৭%, ইউক্রেনি ৫% এবং জার্মান ৫%। কাজাখরা বেশির ভাগই মুসলমান। ওয়ার্ল্ড আলমানাকের মতে, জনসংখ্যার ৪৭% মুসলমান, ৪৪% রুশ অর্থোডক্স এবং ৯% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ১৯৯৫ সালের শিক্ষাশুমারী অনুযায়ী দেশটির সাক্ষরতার হার ৯৮% এবং একই বছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষানুযায়ী জনগণের মাথাপিছু আয় ২৭০০ মার্কিন ডলার।

দেশটির রাজধানী আলমা আতা ভূমিকম্পের ঝুকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় এক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালের ১০ জুন আলমা আতার উত্তরে “আকামোলায়” রাজধানী স্থানান্তর করা হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। নতুন সংবিধানের আলোকে ১৯৯৪ সালের ৭ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে কাজাখ মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৯৫ সালের ৩০ আগস্ট এক গণভোটের মাধ্যমে নতুন সংবিধানের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন নেয়া হয়। সংবিধান অনুমোদিত হবার পর এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা রহিত করে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়। সংসদের উচ্চকক্ষকে সিনেট এবং নিম্নকক্ষকে মজলিস বলা হয়। সিনেটের সদস্য সংখ্যা ৪৭ এবং মজলিসের সদস্য সংখ্যা ৬৭ জন।

উচ্চশিক্ষা বিস্তারের লক্ষে দেশটিতে একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো ঃ

১. কারাগান্ডা ধাতব কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়।

২. কাজাখ আল-কারাবী স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. কারাগান্ডা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. আবে বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

দেশটি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শাসনাধীনে থাকাকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করার অনুমোদন ছিল না। ১৯৯১ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভের পরপরই বেশ কটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলো হলো :

১. ইসলামী রেনেসাঁ পার্টি

২. কাজাখস্তান পপুলার কংগ্রেস

৩. কাজাখস্তানের সোশ্যালিস্ট দল

৪. তুর্কিস্তান পার্টি

৫. ইউনিটি পার্টি

৬. কাজাখ পিপলস কংগ্রেস পার্টি

১৯৮৯ সালে কাজাখ ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর পূর্বে রুশ ভাষা দেশটির সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত। দেশটিতে ছোট বড় ৭০০০ নদী ও ৪৮০০০ হ্রদ রয়েছে।

কাজাখদের ইতিহাস অনেক পুরনো। তুর্কী এবং মোঙ্গল উপজাতি থেকে কাজাখদের উদ্ভব হয়। খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে কাজাখরা এ অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে। পঞ্চদশ শতকে এ অঞ্চলের কাজাখ উপজাতিগুলো একটি জাতীয় কনফেডারেশন গঠন করে। সপ্তদশ শতকে এ ফেডারেশন ভেঙে তিনটি স্থানীয় শাসনাঞ্চলে বিভক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাজাখস্তান রুশ জারের নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সময় ব্যাপক হারে এ এলাকায় রুশ বসতি স্থাপন শুরু করা হলে কাজাখরা এর বিরোধিতা করে। কিন্তু কাজাখদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে রুশ বসতি অব্যাহত থাকে। ফলে কাজাখ অঞ্চলে রুশদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশংকাজনক হারে রুশদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার লক্ষে সারা কাজাখস্থানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৬ সালে এসে এ বিক্ষোভ বিদ্রোহে রূপ নেয়। এ বিদ্রোহ দমনের জন্য জার শাসকরা নিষ্ঠুর দমননীতি চালায়। জারদের এ নিষ্ঠুর দমননীতির ফলে এ সময় প্রায় দেড় লাখ কাজাখ প্রাণ হারায়।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সরকারের পালাবদল হয়। এ সময় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে বলশেভিকরা রাশিয়ার ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে। বলশেভিকরা রাশিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ১৯২০ সালে কাজাখস্তান তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে। ১৯২৫ সালে কাজাখস্তানকে কাজাখ স্বায়ত্বশাসিত

www.pathagar.com

সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট প্রজাতন্ত্র নাম দেয়া হয়। ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে কাজাখস্তানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হয় এবং প্রায় ৭০ বছর দেশটি সোভিয়েত শাসনাধীনে থাকে। নব্বই দশকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে কাজাখস্তান একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশটি স্বাধীনতা অর্জনের পর এর প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নূর সুলতান নজরবায়েভ। তিনি এখনো দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। তিনি একজন সাবেক কমিউনিস্ট। কাজাখস্তানের স্বাধীনতার পূর্বে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন পলিট ব্যুরো ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। বর্তমানে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে নূর সুলতানের সমর্থিত পিপলস ইউনিটি পার্টির সংখ্যা-গরিষ্ঠতা রয়েছে। প্রেডিডেন্ট নূর সুলতান নজরবায়েভের আমন্ত্রণে মক্কাভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী'র মান্যবর সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন আত্-তুর্কীর নেতৃত্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল ২০০৩ সালের ৫মে কাজাখস্তান সফর করেন। এ সময় রাবেতা প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রেসিডেন্ট নজরবায়েভসহ সে দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী ও বেসরকারী নেতৃবৃন্দের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠকের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন এবং কাজাখস্তানে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সমস্ত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

ক. কাজাখস্তানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে সংলাপের আয়োজন করা।

খ. আবে বিশ্ববিদ্যালয়ে (আলমা আতা) ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ চালু করা।

গ. আবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন আত্-তুর্কীর নেতৃত্বে গঠিত একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রশাসনিক কাউন্সিল প্রস্তাবিত সেন্টারটির কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ঘ. মানবতার কল্যাণে সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

কাজাখস্তানে সফররত রাবেতা প্রতিনিধি দলকে ৬ মে প্রেসিডেন্ট ভবনে স্বাগত জানানো হয়। প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নজরবায়েভ এতে প্রধান

www.pathagar.com

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাকালে প্রেসিডেন্ট নজরবায়েভ প্রতিনিধিদলকে জানান যে কাজাখস্তানের স্বাধীনতালাভের পর বিগত এক যুগে কাজাখস্তানে ইসলামের দ্রুত বিকাশ ঘটে। এ সময় অনেক মসজিদ ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে কাজাখ প্রেসিডেন্ট বলেন ঃ

"After 12 years of attaining independence Kazakhstan has witnessed tremendous developments. A number of mosques and centers of researches and libraries have come up. I also want to co-operate with the Rabitat Al-Alam Al-Islami (MWL) in the fields of culture, which highlight Islamic civilisation as will."

অর্থ ঃ "স্বাধীনতা লাভের ১২ বছরের মধ্যে কাজাখস্থানে বিস্ময়কর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ সময়ে অনেক মসজিদ, ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমি রাবেতা আলমে ইসলামীর সহযোগিতায় কাজ করতে চাই যাতে ইসলামী সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলো সকলের সামনে তুলে ধরা যায়।"

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে কাজাখ প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, তাঁর দেশ ইসলামের শাশ্বত নীতিমালা অনুসরণ করে চলছে এবং দেশের জনগণও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করছে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শাসনাধীনে ৭০ বছর দেশটি শাসিত হয়েছিল। এ সময় অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশটির স্বাধীনতা অর্জনের পর ইসলামের হারানো গৌরব ফিরে পাবার জন্য সরকার ও জনগণ সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বন্ধ হয়ে যাওয়া মসজিদগুলোকে আবার খুলে দেয়া হয়েছে এবং দেশের সর্বত্র নতুন নতুন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নজরবায়েভ বলেন ঃ

"During the Iast 12 years, 1500 mosques have been opened in different parts of the country"

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "বিগত ১২ বছর দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৫০০টি মসজিদ খুলে দেয়া হয়েছে।"

তিনি আরো বলেন ঃ

"For the benefit of the humanity kazakhstan is ready to work on the fundamentals of the divine messages of co-existence, co-operation and making peace for all the nations and peoples."

অর্থ ঃ "পবিত্র স্বর্গীয় বাণীর মৌলিক নীতিমালার আলোকে মানবতার কল্যাণার্থে সকল জাতি ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহঅবস্থান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে কাজ করতে কাজাখস্তান প্রস্তুত রয়েছে।"

প্রেসিডেন্টের সাথে মতবিনিময়কালে রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ আবদুল্লাহ্ আবদুল মুহসিন আত্-তুর্কী কাজাখস্তানে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি কাজাখ প্রেসিডেন্টকে খানায়ে কা'বার গিলাফের একটি টুকরা এবং কিছু ইসলামী পুস্তকও উপহার দেন।

আমরা আশা করবো স্বাধীন কাজাখস্তান আগামী দিনে মধ্য এশিয়ায় ইসলাম চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হবে।

সূত্র ঃ ১. মুসলিম জাহান-সোহরাব উদ্দিন আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯।

২. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, সউদী আরব, জুন ২০০৩।

www.pathagar.com

উজবেকিস্তানে ইসলাম ও মুসলমান

উজবেকিস্তান মধ্য এশিয়ার একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত দেশটি অধুনালুপ্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য ছিল। ১৯৯১ সালের ৫ ডিসেম্বর দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত দিক থেকে দেশটি সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ সদস্য উজবেকিস্তানের লোক। কাজেই দেশটির রুশ ফেডারেশনে না থেকে বেরিয়ে আসাটা রাশিয়ার জন্য একটি বড় ধরনের ক্ষতি বলে বিবেচনা করা হয়।

দেশটির আয়তন ৪,৪৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১৭ মিলিয়নের অধিক। ১৯৯৭ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী উজবেক মুসলমান ১,০৫,৬৯,০০০, আভিবাসনকৃত মুসলমান ২৭,৭০,০০০, রুশ বসতি ১,৬৬,০০০, ইউক্রেনী ১,১৪,০০০, ইহুদী ১,০০,০০০, কোরীয় ১,৬৩,০০০ জন। বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ মুসলমানদের জন্মহার ৬.১২% এবং অন্যান্যদের জন্মহার ১.৬%। জাতিগত বিশ্লেষণে ৭১% উজবেক এবং ৮% রুশ। দেশটি প্রধানতঃ সুন্নী মুসলিম প্রধান দেশ।

অবস্থানগত দিক থেকে দেশটির উত্তরে ও পশ্চিমে কাজাখস্তান, পূর্বে কিরঘিজিস্তান ও তাজিকিস্তান এবং দক্ষিণে তুর্কমেনিস্তান অবস্থিত। উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দ। দেশটির প্রধান ভাষা উজবেক ও রুশ। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশটিতে ব্যাপকভাবে আরবী ভাষার চর্চা শুরু হয়েছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দ্রুত আরবী ভাষার প্রতি ঝুকে পড়েছে এবং সহজেই আরবী ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। দেশের আলিম ও বুদ্ধিজীবীরা সর্বস্তরের জনগণকে আরবী ভাষা চর্চা করার জন্য উৎসাহিত করছেন। ফলে আরবী ভাষা দ্রুত বিকাশমান ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। অবশ্য কমিউনিস্ট শাসনের পূর্বে দেশটিতে আরবী ভাষার ব্যাপক চর্চা ছিল। সমাজতান্ত্রিক রুশ সরকার ১৯২৪ সালে দেশটি দখল করে নেয়ার পর জোরপূর্বক আরবী ভাষা চর্চা বন্ধ করে দেয়। ফলে নতুন প্রজন্ম আরবী ভাষা চর্চা থেকে দূরে সরে যায়। আরবী ভাষা চর্চার এ বন্ধাত্ব দূর করার লক্ষে বর্তমানে আলিম, শিক্ষাবিদ ও ইসলামী

www.pathagar.com

চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এ কর্মসূচি ইতোমধ্যেই সফলতার মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে। উজবেকিস্তানের ইতিহাস অনেক পুরনো। ৫৫ হিজরীতে সাইয়েদ ইবনে ওসমানের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী উজবেকিস্তান দখল করে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করে। এর পূর্বে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বৈদেশিক শত্রুর আগ্রাসনের শিকার হয় উজবেকিস্তান। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে পারসিক রাজা দারিয়ুস এবং খৃস্টপূর্ব চতুর্থ দশকে মহাবীর আলেকজান্ডার দেশটি আক্রমণ করে। পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গোলীয় শাসক চেঙ্গিসখান দেশটি আক্রমণ করেন এবং চতুর্দশ শতকে জগতখ্যাত শাসক তৈমুরের শাসনাধীনে দেশটি চলে যায়। পঞ্চদশ শতকে উজবেক জাতির আগমন ঘটে। তারা স্থানীয় জনগণের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া কর্তৃক দেশটি দখলের পূর্ব পর্যন্ত উজবেকদের শাসন অব্যাহত থাকে। ৫৫ হিজরীতে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তনের দিন থেকে শতাব্দীর শেষে এসে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। এ স্বল্পসময়ের মধ্যেই ইসলাম এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে ব্যাপক সাড়া জাগানোর মাধ্যমে ইসলাম এ বৃহত্তম জনগোষ্ঠির নিজস্ব ধর্মে পরিণত হয়। উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দ, বোখারা এবং সমরকন্দ ইসলামের নগরীতে পরিণত হয়। এ অঞ্চলের সাথে ইসলামের ইতিহাসের নাড়ীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ এখানেই জন্মগ্রহণ করেন পবিত্র হাদীস সংকলক ইমাম মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল বুখারী, আবু ঈসা আত্-তিরমিযী এবং আহমদ নাসাঈ। বিশ্বের প্রতিটি মুসলমান এ মনীষীদের নামের সাথে গভীরভাবে পরিচিত এবং ইসলামের প্রতি তাঁদের খেদমতের জন্য গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাঁদেরকে স্মরণ করেন। তাঁরা ইসলামের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। এ মনীষীদের কর্মের ফলেই উজবেকিস্তান গোটা মুসলিম উম্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানদের কাছে পবিত্র আল-কুরআনের পরেই সহীহ্ আল-বুখারীর স্থান। ইমাম বুখারী এ হাদীস গ্রন্থ সংকলন করে ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। এছাড়াও তাশখন্দের কেন্দ্রীয় পাঠাগারে ৪০ হাজারেরও অধিক ইসলামী সাহিত্য রয়েছে যা ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও গবেষণার অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অবশ্য কমিউনিস্ট শাসনামলে (১৯২৪ ইং থেকে ১৯৯১ ইং) দেশটিতে ইসলাম চর্চা ছিল নিষিদ্ধ। এ সময় হাজার হাজার আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদকে হত্যা করা হয় এবং অনেককে কারা প্রকোষ্ঠে নির্মম নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

www.pathagar.com

এছাড়াও এ কমিউনিস্ট শাসনামলে হাজার হাজার মসজিদ ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়া হয়।

১৯৯১ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করলেও সাবেক কমিউনিস্টরাই ভিন্ন নামে দেশটি শাসন করছে। দেশে যাতে দ্রুত ইসলাম বিকশিত হতে না পারে সেজন্য সরকার খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। এটি একটি সেক্যুলার সংবিধান। সংবিধানে বহুদলীয় গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও সাবেক কমিউনিস্ট নেতা ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইসমাইল এ. করিমভ এ অধিকারগুলো ভোগ করা থেকে বিরোধীদের বঞ্চিত রেখেছে। ইসলাম যাতে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারে সেজন্য প্রেসিডেন্ট করিমভ ইতোমধ্যেই ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ করেছে এবং শীর্ষস্থানীয় ইসলামী নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছে। এতে মুসলিমবিশ্ব তার এ স্বৈরনীতির তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করে। উজবেকিস্তান একটি সুন্নী মুসলিম প্রধান দেশ। উজবেক মুসলমানদের মধ্যে শহর থেকে গ্রামের লোকেরাই বেশি ধর্মপ্রাণ। রুশ শাসনামলে যাতে দেশটিতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার না ঘটে সেজন্য কমিউনিস্ট শাসকরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ ধরনের কর্মসূচির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হলো—'Al-Idarah Al-Diniyah'। ইসলামকে বিকৃতভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৯৪১ সালে রাজধানী তাসখন্দে কমিউন্টি শাসকরা Al-Idarah Al-Diniyah নামক একটি ধর্মীয় বিভাগ চালু করে। এ বিভাগটির মাধ্যমে উজবেকিস্তানে ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবকদের শিক্ষা দেয়া হতো যে, ইসলামের সাথে মার্ক্সবাদ ও লেলিনবাদের কোনো পার্থক্য নেই। উভয় মতবাদই মানুষের কল্যাণ কামনা করে। সুতরাং মার্ক্সবাদ ও লেলিনবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এভাবে কমিউনিস্টরা উজবেক মুসলমান বিশেষ করে যুবকদেরকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দিয়ে থাকে। কিন্তু ১৯৯১ সালে কমিউনিস্ট দুঃশাসন মুক্ত হয়ে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করার পর 'Al-Idarah Al-Diniyah' প্রতিষ্ঠানটি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো ঃ (১) কমিউনিস্ট শাসনামলে বন্ধ হয়ে যাওয়া মসজিদ ও নামায ঘরগুলোর তথ্য সংগ্রহ করে তা পুনরায় চালু করা।

www.pathagar.com

২. বিভিন্ন মসজিদে ইমাম ও মুয়ায্যিন নিয়োগ করা এবং তাদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।

৩. অযোগ্য ইমামদের অপসারণ করে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেয়া।

৪. ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে মুবাল্লিগ নিয়োগ ও তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।

উপরোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তার অতীত নেতিবাচক কাজের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করছে। কারণ ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মসজিদ কর্মসূচিই একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত। সমাজের সর্বস্তরের লোকেরা দৈনিক পাঁচ বার আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য মসজিদে আগমন করে। মসজিদ হয়ে ওঠে মুসলিম সমাজের মিলন কেন্দ্রে। মসজিদে আগমনের ফলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এভাবে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। ফলে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণের পথ হয় প্রশস্ত। এভাবে মসজিদ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে Al-Idarah Al-Diniyah বর্তমানে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

উজবেকিস্তান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। কিন্তু রুশ শাসনামলে কমিউনিস্টদের তথাকথিত মুখরোচক শ্লোগান 'Equal distribution of wealth.' কার্যকর থাকায় লোকেরা তাদের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দৃষ্টিনন্দন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে দেশটি অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ থেকে যায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে Free trade system চালু হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা সৃষ্টি হলেও নতুন bribery প্রথা এ গতিশীলতাকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। ফলে অর্থনীতিতে যে প্রাণচাঞ্চল্য আসার কথা ছিল তা লক্ষ করা যাচ্ছে না। উজবেকিস্তানে Bribe ও ঘুষ বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। ঘুষ ছাড়া কোনো বিভাগেই ফাইল নড়ে না। ফলে শিল্পদ্যোক্তা ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা আশানুরূপ-ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ঘুষ প্রথার কারণে একটি সম্ভাবনাময় দেশ কিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বন্ধাত্বের শিকার হয় বর্তমান উজবেকিস্তান তার জীবন্ত উদাহরণ। ঘুষ প্রথার ন্যায় একটি মারাত্মক সামাজিক ক্যান্সার দ্বারা উজবেক মুসলমানরা আক্রান্ত হলেও অতিথি আপ্যায়নের মত একটি মহৎ গুণ বিশ্বব্যাপী তাদের খ্যাতি অর্জনে সহায়তা করছে। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে

www.pathagar.com

কোনো মেহমান উজবেক মুসলমানদের বাড়ীতে গেলে তাদেরকে চা ও বিশেষ ধরনের বিস্কুট দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। বিস্কুট ও চা পান ছাড়া কোনো মেহমান উজবেক মুসলমানদের বাড়ী ত্যাগ করতে পারে না। তাদের এ মেহমানদারি সত্যিই প্রশংসনীয়। দেশে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য বর্তমানে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এগুলো হলো-(১) নাকুস রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, (২) সমরখন্দ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) তাশখন্দ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে উজবেকিস্তানে সাক্ষরতার হার ৯৭%।

দেশে দ্রুত ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে ইসলামকে একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দ কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের এ প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য মসজিদ সংস্কার, পুনর্নির্মাণ এবং দেশের সর্বত্র ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষে আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠন ও মুসলিম দেশ থেকে সাহায্য কামনা করেছেন। মুসলিম দেশ ও সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা পেলে ইমাম বুখারীর বুখারা, সমরখন্দ ও তাশখন্দের দেশ উজবেকিস্তান আবার শুধু মধ্য এশিয়ায়ই নয় বরং মুসলিম বিশ্বে ইসলাম চর্চার জীবন্ত প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়। আমরা উজবেক মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল, সউদী আরব, নভেম্বর, ২০০২।

২. মুসলিম জাহান, সোহরাব উদ্দীন আহমদ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান

মধ্য এশিয়ার ছয়টি মুসলিম জনপদ দীর্ঘ পৌনে এক শতাব্দী পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের শৃংখলে আবদ্ধ ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে এ জনপদগুলোর মানুষের হৃদয়কে ইসলাম কিভাবে নাড়া দিয়েছে তা মুক্ত পৃথিবীর মানুষের জানা ছিল না। সমাজতন্ত্রের অন্তসারশূন্যতার কারণে এর স্বাভাবিক মৃত্যুর পর নব্বই দশকে এসে বিশ্ববাসী মধ্য এশিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

তুর্কমেনিস্তান প্রজাতন্ত্র

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর দেশটিতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্বাধীনতার লক্ষে ১৯৯১ সালের ২৭ অক্টোবর ঐতিহাসিক রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়। এ রেফারেন্ডামের ফলে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই রুশ ফেডারেশনের নতুন সরকার দেশটির স্বাধীনতা ঘোষণাকে মেনে নেয় এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে তুর্কমেনিস্তানের অভ্যুদয় ঘটে।

তুর্কমেনিস্তানের বর্তমান আয়তন ৪,৮৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এর দক্ষিণে ইরান, উত্তর-পূর্ব প্রান্তে উজবেকিস্তান, উত্তরে কাজাখস্তান এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে আফগানিস্তান অবস্থিত।

দেশটির মোট লোকসংখ্যা ৮ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৪.৫ মিলিয়ন স্বদেশে বসবাস করছে। বাকী ৩.৫ মিলিয়ন রুশ শাসনামলে নির্যাতনের শিকার হয়ে আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্কে হিজরত করে। বলশেভিক শাসনামলে নির্মম নির্যাতনের এটি একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ যে, তাদের দমননীতির ফলে একটি জনপদের প্রায় অর্ধেক জনশক্তি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। দেশটির মোট জনসংখ্যার ৭২% তুর্কমেন, ৯% উজবেক, ১০% রাশিয়ান এবং ৯% অন্যান্য। এর মধ্যে ৯০% মুসলমান। বাকীরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

দেশটির রাষ্ট্রভাষা তুর্কমেন। কিন্তু রাশিয়ান ভাষা এখন রাষ্ট্রের সাধারণ ভাষা হিসেবে প্রশাসনিক কার্যক্রম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজধানী আশগাবাদ (Ashgabad) -এ বর্তমানে ৫,৩৬,০০০ লোক বসবাস করছে।

www.pathagar.com

দেশটিতে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে তুর্কমেনিস্তানে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা রয়েছে। উচ্চ কক্ষের (The peoples Council) সদস্য সংখ্যা ১০০ জন এবং নিম্ন কক্ষের (Majlis) সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। Mr.Saparmurat Niyazov দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৯৯০ সালে ক্ষমতারোহণ করেন।

দেশটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গ্যাস উত্তোলনকারী দেশগুলোর একটি হলো তুর্কমেনিস্তান। বর্তমানে দেশে ৫৩৫ ট্রিলিয়ন গ্যাস মওজুদ রয়েছে। বিদেশে গ্যাস বিক্রির জন্য ইতোমধ্যেই ইরান, তুরস্ক, চীন ও ইউরোপের সাথে ৬১,০০০ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসানো হয়েছে। বিদেশে গ্যাস রফতানীর মাধ্যমে দেশটি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে যা দেশের অর্থনীতিকে আরো বেগবান করতে সক্ষম হবে। দেশের কৃষি পণ্যের মধ্যে রয়েছে তুলা, শাকসব্জি, ফলমূল, গম ও অন্যান্য শস্য। দেশের মোট জনসংখ্যার দু'পঞ্চমাংশ লোক কৃষি জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। ১৯৯৫ সালে দেশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯%।

১৯৯৫ সালে দেশে Macro-economic reform programme ঘোষণা করা হয়। ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা দ্রুত ছুটে আসছে বিনিয়োগের আশায়। অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো ঃ

ক. শিল্প বেসরকারীকরণ

খ. উদার মূল্যনীতি

গ. ব্যাংকিং পদ্ধতির আধুনিকীকরণ এবং

ঘ. বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টকরণ।

অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে World Bank ও IMF এগিয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির সফলতা দেখে ১৯৯৬ সালে সরকার গ্যাস, বিদ্যুৎ ও বেসামরিক বিমান সার্ভিস ছাড়া সকল বাণিজ্যিক সেক্টরগুলো ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৯৩ সালে দেশে নিজস্ব মুদ্রা চালু করা হয়। মুদ্রার নাম Manat।

www.pathagar.com

কিরঘিজ প্রজাতন্ত্র

পর্বত ঘেরা একটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র হলো কিরঘিজিস্তান প্রজাতন্ত্র। এর উত্তরে কাজাখস্তান, পশ্চিমে উজবেকিস্তান, দক্ষিণে তাজাকিস্তান এবং দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে সমাজতান্ত্রিক চীন অবস্থিত। দেশটির মোট আয়তন ১,৯৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এখানে শীতকালে প্রচণ্ড শীত এবং গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজমান।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের লৌহ প্রাচীর ভেঙে যাবার পর ১৯৯১ সালের ৩১ আগস্ট দেশটি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় স্বাধীনতা অর্জন করে। কিরঘিজ প্রজাতন্ত্র আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র।

১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, দেশের মোট জনসংখ্যা ৪,৪৫,০০০। এর মধ্যে ৩৫% শহরে বাকীরা গ্রামে বসবাস করে। দেশটি ক্ষুদ্র হলেও বিভিন্ন জাতির লোকদের এখানে সহাবস্থান রয়েছে। জাতিগত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দেশটির মোট জনসংখ্যার ৮০% মুসলমান। বাকীরা রাশিয়ান, উজবেক, জার্মানী, ইউক্রেনিয়ান, কাজাক, কোরিয়ান, তাজিক ও তাতার সম্প্রদায়ভুক্ত।

১৯৯৩ সালে সাংবিধানিকভাবে দেশটিকে একটি সেকুলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েম হয়। Mr. M. Aslan Akaev দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। একজন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনজন উপ-প্রধানমন্ত্রী শাসন কার্য পরিচালনায় প্রেসিডেন্টকে সহায়তা করে। এছাড়াও দেশে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট একটি আইনসভা রয়েছে। Bishkek কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রের রাজধানী।

এটি একটি কৃষিপ্রধান দেশ। ১৯৯১ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, জাতীয় মোট আয়ের ৪০% আসে কৃষিখাত থেকে। ১৯৯৫ সালের অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, কৃষি সেক্টরে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১% কর্মরত রয়েছে। অপরদিকে শিল্পখাত থেকে জাতীয় আয়ের ২৫% অংশ অর্জিত হয়। জিডিপির অবশিষ্ট অংশ আসে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে। দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইতোমধ্যেই স্বর্ণ, রৌপ্য, ইউরেনিয়াম ও মার্কারীর ১০০০টি খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সমস্ত সম্পদ উত্তোলন করা সম্ভব হলে দেশটি দ্রুত একটি সম্পদশালী দেশে পরিণত হবে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা লাভের পরপরই দেশটিতে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। বর্তমানে দেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু রয়েছে। বাজার অর্থনীতি চালু হওয়ায় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা দ্রুত অর্থ বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে। বাজার অর্থনীতির ফলে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে ভরপুর দেশটি দ্রুত সম্পদশালী দেশে পরিণত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্র

মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে কাজাখস্তান সর্ববৃহৎ প্রজ াতন্ত্র। এর আয়তন ২.৭ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশটি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্গলমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। সীমানার দিক থেকে এর উত্তরে রাশিয়া, পূর্বে চীন, দক্ষিণে কিরঘিস্তান, উজবেকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর অবস্থিত। দেশটি হাজার হাজার নদী ও হ্রদে ভরপুর। পশু সম্পদ ও উদ্ভিদ সম্পদে দেশটি সমৃদ্ধ।

কাজাখস্তানের বর্তমান জনসংখ্যা ১৬.৯ মিলিয়ন। এর মধ্যে ৫৭% শহরে বসবাস করে। বাকীরা গ্রামে বাস করে। মোট জনসংখ্যার ৪৬% কাজাক মুসলমান, ৩৫% রুশ এবং বাকীরা ইউক্রেনিয়ান, জার্মান, কোরিয়ান ও উইগুর তাতার।

১৯৯৫ সালে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে স্বাধীতা উত্তর দেশের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধান অনুযায়ী দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করছে। Mr. Nur Sultan Nazarbayev দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। দেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট একটি আইনসভা রয়েছে। উচ্চ কক্ষের (সিনেট) আসন সংখ্যা ৪৭ এবং নিম্নকক্ষের আসন সংখ্যা ৬৭।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খনিজ সম্পদশালী দেশ হলো কাজাখস্তান। উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ হলো, গ্যাস, তেল, শক্ত ধাতু (Chrome), কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, দস্তা ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কাঁচামালে দেশটি সমৃদ্ধ। দেশে পর্যাপ্ত কাঁচামাল থাকার কারণে ইতোমধ্যেই বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান হলো ঃ

www.pathagar.com

a. Metallurgy

b. Heavy machine building

c. Petrochemicals

d. Ago-processing

e. Textile ইত্যাদি।

দেশটিতে প্রচুর কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রফতানী করা হয়। এতে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ প্রশস্ত হয়। বর্তমানে দেশের মোট ভূমির ৭৮% কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৯৯৩ সালে দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হয়। ফলে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কাজাখস্তানেই অর্থবিনিয়োগের সবচেয়ে বেশি উদার পরিবেশ বিরাজ করছে। নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কর্মসূচির পরিবর্তে উদারনৈতিক অর্থনীতি কায়েম করায় ১৯৯৪ সালে আইএমএফ (IMF) ও বিশ্বব্যাংক (Word Bank) অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। উদার অর্থনৈতিক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকার তিনটি প্রধান নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো ঃ

১. Macro-Economic Stabilization

২. Liberalization of domestic and foreign activities এবং

৩. Privatization।

গৃহীত অর্থনৈতিক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে আগামী দিনের কাজাখস্তান একটি সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র

আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রই হলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত মধ্য এশিয়ার প্রথম মুসলিম প্রজাতন্ত্র, যে দেশটি সোভিয়েত শৃংখল মুক্ত হবার জন্য সর্বপ্রথম স্বাধীনতার ডাক দেয়। ১৯৮৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আজারবাইজান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এর আয়তন ৮৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার। ট্রান্সককেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে এবং কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে

www.pathagar.com

দেশটি অবস্থিত। এর দক্ষিণ দিকে ইরান ও তুরস্ক, উত্তর দিকে রাশিয়া ও জর্জিয়া এবং পশ্চিম দিকে আর্মেনিয়া অবস্থিত। এখানে শীতকালে প্রচণ্ড শীত এবং গরমকালে প্রচণ্ড গরম আবহাওয়া বিরাজ করে। তবে বছরের অধিকাংশ সময়ই Subtropical Climate বিদ্যমান থাকে। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ৭.৫ মিলিয়ন। এটি হলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ৬ষ্ঠ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। দেশের ৫৪% লোক পৌর এলাকায় বসবাস করে। জনসংখ্যার ৩৩%-এর বয়স হলো ১৫ বছরের নীচে। দেশের মোট জনসংখ্যার ৮২% মুসলমান, ৫.৬% রাশিয়ান, ৫.৬% আর্মেনিয়ান, ২.৪% লেজিন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা হলো ৩.৭%। দেশটির শিক্ষার হার সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। দেশটিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম হায়দার আলীয়ভ। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। দেশের আইন প্রণয়নের জন্য রয়েছে ৩০০ আসন বিশিষ্ট একটি পার্লামেন্ট। বাকু দেশের রাজধানী। রাজধানীর লোকসংখ্যা ১.৮ মিলিয়ন।

দেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষি ও শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। দেশের মোট জিডিপির ৪৬% আসে শিল্প এবং ৩৭% আসে কৃষি ও বনায়ন থেকে। দেশের প্রধান অর্থকরী সম্পদ হলো জ্বালানী তেল। ১৯৮৮ সালে ১৩.৭ মিলিয়ন টন এবং ১৯৯৩ সালে ১০.৫ মিলিয়ন টন তেল উৎপাদন করা হয়। চাহিদানুযায়ী অর্ধেক গ্যাস দেশেই উৎপাদিত হয়। বাকী গ্যাস আমদানী করতে হয়। এছাড়াও যেসব সম্পদ দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী অবস্থানে উন্নীত হতে সহায়তা করছে সেগুলো হলো জিংক, লোহা, রৌপ্য, মার্বেল পাথর, চুনা, মিনারেল ওয়াটার এবং লবণ। দেশের চাহিদানুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন সন্তোষজনক। দেশের প্রধান প্রধান শিল্পের মধ্যে রয়েছে–

১. তেল শিল্প
২. টেক্সটাইল
৩. খাবার প্রক্রিয়াজাত করণ
৪. কাঠ ও ইমারত নির্মাণসামগ্রী তৈরী
৫. বিদ্যুৎ ও গ্যাস

www.pathagar.com

দেশের মোট ভূমির অর্ধেক কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যগুলো হলো তুলা, আঙুর, শাকসব্জি, তামাক ইত্যাদি। দেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করার লক্ষে ১৯৯২ সালে অনেকগুলো জরীপ চালানো হয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ব্যক্তি মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, প্রাইভেট সেক্টরকে ক্রমান্বয়ে আরো উন্নত করা এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। এদতসত্ত্বেও দেশের মোট উৎপাদনের ৮০% সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং দেশের মোট চাকরিজীবীদের মধ্যে ৭৫% সরকারী কর্মচারী।

১৯৯২ সালে সরকার দেশে নতুন ব্যাংকিং নীতিমালা চালু করে। এর ফলে বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ফলে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ লাভ করেছে। দেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি কায়েম হওয়ায় বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়। ফলে দেশটি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্র

উজবেকিস্তান মধ্য এশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এর আয়তন ৪,৪৭,৭০০ বর্গ কিলোমিটার। এর সীমান্ত কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান ও আফগানিস্তান দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১৯৯১ সালের ১ সেপ্টেম্বর দেশটি রাশিয়ার শৃংখল মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। উজবেকিস্তান একটি বহুজাতিক দেশ। দেশটিতে ১২৯টি জাতির লোক বসবাস করে। এর লোক সংখ্যা ২১ মিলিয়ন। জনসংখ্যার ৭১.৪% উজবেক, ৮.৩% রাশিয়ান, ৪.৭% তাজিক, ৪.১% কাজাক, ২.১% তাতার এবং বাকীরা অন্যান্য জাতিভুক্ত।

১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জনগণ দেশের স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। এ রায়ের ওপর ভিত্তি করেই দেশটি পরবর্তী মাসে স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৮৬% ভোট পেয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভ জয়লাভ করেন। প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভ উজবেক জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি ইতিহাসের গৌরবোজ্জল অধ্যায়গুলোর সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করার লক্ষে হারিয়ে যাওয়া গৌরব গাঁথার সন্ধানে ব্যপৃত রয়েছেন। অবশ্য ইসলামপূর্ব ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

উদ্যোগ নেয়া হলে বর্তমানে মধ্য এশিয়ার বিকাশমান ধর্ম ইসলামের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে বলে আমাদের ধারণা যা আগামী দিনের উজবেকিস্তানের অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে দিতে পারে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এটি একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এর প্রধান অর্থকরী ফসল হলো তুলা। বিশ্বের তুলা উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে উজবেকিস্তানের স্থান শীর্ষে। অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে রয়েছে ভাইটি কালচার (viticulture/দ্রাক্ষা-উৎপাদন), শাকসব্জি, বাগান ও ভেড়া উৎপাদন করা। দেশের মোট সক্ষম জনশক্তির অর্ধেকই কৃষি কাজে নিয়োজিত এবং জাতীয় বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ কৃষি কাজে ব্যয় করা হয়।

এছাড়াও দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ রয়েছে। এ সমস্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-স্বর্ণ, রৌপ্য, দস্তা, গ্যাস এবং ইস্পাত তৈরীর ধাতু ইত্যাদি। পৃথিবীর স্বর্ণ উত্তোলনকারী দেশগুলোর মধ্যে উজবেকিস্তানের স্থান সপ্তম এবং মওজুদের দিক থেকে পঞ্চম। দেশে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানী তেল ও কয়লা মওজুদ রয়েছে যা ভবিষ্যতে বিদেশে রফতানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র এবং উজবেকিস্তানের সাথে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন আর্থিক সংস্থাগুলো উজবেকিস্তানে তেল ও গ্যাস খাতে একশত কোটি ডলারের বেশি অর্থ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এছাড়াও উজবেক সরকার স্বর্ণ রফতানীর জন্য একটি মার্কিন কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে দেশটি দ্রুত অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যেই সরকার অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির সুফল পেতে শুরু করেছে।

তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্র

এ মুসলিম জনপদটি রুশ শ্বেত ভল্লুকদের শৃংখল মুক্ত হবার জন্য ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু রুশ শাসকরা তাজিকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণাকে মেনে নিতে পারেনি। ফলে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধে প্রচুর প্রাণহানী ঘটে। যুদ্ধবন্ধের উদ্যোগ নেয় জাতিসংঘ। জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল বুট্রোস ঘালি গৃহযুদ্ধ অবসানের লক্ষে রুশ ও তাজিক সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য পিরিজ ব্যালোনকে প্রেরণ করেন। কিন্তু জাতিসংঘের এ উদ্যোগ সফল হয়নি। দেশটির

www.pathagar.com

স্বাধীনতা অর্জন এবং গৃহযুদ্ধের অবসান কল্পে জাতিসংঘ যুদ্ধবিধস্ত দেশটিতে একটি পর্যবেক্ষক মিশন প্রেরণ করে। রুশ সমর্থিত ও রুশ বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটির মধ্যে গৃহযুদ্ধের অবসান না হলে আগামী দিনের তাজিকিস্তান আর একটি 'রক্তাক্ত আফগানিস্তান'–এ পরিণত হবার আশংকা রয়েছে।

তাজিকিস্তানের সীমান্ত উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান, কিরঘিজিস্তান এবং চীন দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী দেশের বর্তমান লোকসংখ্যা ৫.৪ মিলিয়ন এর মধ্যে ৬২% লোকই মুসলমান।

১৯৯৪ সালে দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ইমাম আলী রখমোনভ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশটিতে বর্তমানে অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজ করছে। দেশের প্রধান কৃষিপণ্য হলো তুলা। এছাড়াও দেশে বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ রয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য দেশের অর্থনীতিকে উদারীকীকরণ করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে আশা করা যায় আগামী দিনের তাজিকিস্তান একটি সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হবে।

রুশ সমর্থিত বর্তমান তাজিক সরকার মৌলবাদ ঠেকানোর নামে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের পথকে রুদ্ধ করার লক্ষে নতুন নতুন আইন জারী করছে। ফলে মধ্য এশিয়ার বিকাশমান ধর্ম ইসলাম আপন মহিমায় উজ্জীবিত হবার জন্য তাজিকিস্তানের ভূমিতে অব্যাহত সংঘর্ষ আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। রক্তাক্ত সংগ্রামের পিচ্ছিল পথ বেয়েই আগামী দিনের তাজিকিস্তানে ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

রুশ শ্বেত ভল্লুকদের শৃংখল মুক্ত হয়ে মধ্যএশিয়ার ছয়টি রাষ্ট্রের স্বাধীন অভ্যুদয় গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি সুখকর সংবাদ। ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষে গোটা মধ্যএশিয়ায় নতুন নতুন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ এবং ইসলামী সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। অপরদিকে সমাজতন্ত্রের অন্তসারশূন্যতা ও ইসলামের শাশ্বত বাণীকে জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে তুলে ধরার জন্য মক্কাভিত্তিক আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা রাবেতা আলমে ইসলামীসহ অনেক

২৮—

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ও বিতরণের ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এ সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের মধ্য এশিয়ায় ইসলাম একটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা মধ্য এশিয়ার মুসলিম জনগণের সেই সোনালী দিনের প্রত্যাশায় রইলাম।

সূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), জুন, ১৯৯৭।

www.pathagar.com

কমোরো দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম ও মুসলমান

কালো মানুষদের মহাদেশ আফ্রিকা। এ আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে দ্বীপরাষ্ট্র কমোরোর অবস্থান। এর উত্তরে রয়েছে মোজাম্বিক ও তানজানিয়া। চারটি দ্বীপ নিয়ে এ দ্বীপ রাষ্ট্রটি গঠিত। দ্বীপগুলো হলো-(ক) গ্রান্ড কমোরো (খ) আনজোয়ান দ্বীপ (গ) সোহেলী দ্বীপ (ঘ) মায়োতী দ্বীপ।

এ দ্বীপগুলোর আয়তন ও লোকসংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

গ্রান্ড কমোরো

এটি সর্ববৃহৎ এবং সর্বোচ্চ দ্বীপ। এর আয়তন ১১৪৭ কিলোমিটার এবং লোক সংখ্যা ৩,০০,০০০। জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। দ্বীপটিতে মোট ২০৩ টি গ্রাম রয়েছে। এ দ্বীপে দুটি প্রধান শহর রয়েছে। শহর দুটি হলো-(ক) মরোনী ও (খ) মিটশামিউলী। মরোনী দ্বীপটির রাজধানী। এর জনসংখ্যা ৪০,০০০।

আনজোয়ান দ্বীপ

এ দ্বীপটির আয়তন ৪২৪ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ২,৫০,০০০। জনসংখ্যার ৯১% গ্রামে বাস করে। মুটশমুডু এ দ্বীপের প্রধান শহর। এ দ্বীপটিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ দ্বীপে বেশ কটি দৃষ্টিনন্দন জলপ্রপাত রয়েছে।

সোহেলী দ্বীপ

এ দ্বীপটির আয়তন ২৯০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৩,৫০,০০০। দ্বীপটির প্রধান প্রধান শহর হলো—ফসবোনী ও ইকিনি। জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। দ্বীপটিতে মোট ২৬টি গ্রাম রয়েছে। গবাদি পশু ও কৃষি পণ্যের জন্য এ দ্বীপটি খুব পরিচিত।

মায়োত্তী দ্বীপ

এ দ্বীপটি এখনো ফ্রান্সের অধীনে রয়েছে। কমোরো দ্বীপটি দাবী করা সত্ত্বেও এখনও কামোরোর নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। এর আয়তন ৩৭৪

www.pathagar.com

বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১,২৫,০০০। এখানে ফ্রান্সের একটি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে।

জাতিগত বিশ্লেষণে এ দ্বীপ রাষ্ট্রের জনসংখ্যাকে চারটি এথনিক গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। এ গ্রুপগুলো হলো ঃ ১। আরব ভাষাভাষী মুসলমান। এরা মূলতঃ ওমান ও সংযুক্ত আরব আমীরাত থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। মোট জনসংখ্যার ২০%-২৫% আরব মুসলমান।

দ্বিতীয় গ্রুপ হলো পারসিক গ্রুপ ঃ এরা মূলতঃ ইরানের সিরাজ অঞ্চল থেকে বিগত চারশত বছর পূর্বে এখানে এসে বসবাস শুরু করে। মোট জনসংখ্যার ২০%-২৫% পারসিক।

তৃতীয় গ্রুপ ঃ এরা মূলত আফ্রিকান। এরা সাধারণত আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করে। এদের অধিকাংশই আফ্রিকার বানতু উপজাতির লোক। এরা মোট জনসংখ্যার ৪০%-৫০%।

৪র্থ গ্রুপ ঃ এদেরকে ম্যালিয়ান গ্রুপ বলা হয়। মোট জনসংখ্যার ১০%-১৫% এ গ্রুপের সদস্য।

এ গ্রুপগুলোর মধ্যে জাতিগত কোনো বিরোধ নেই বরং বৈবাহিক সূত্রে এরা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে এদের মধ্যে সুন্দর সহঅবস্থান বিরাজ করছে যা একটি কাঙ্ক্ষিত শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণের জন্য সহায়ক।

এ দীপ রাষ্ট্রটি দীর্ঘ ১৫০ বছর পর্যন্ত ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার বহু উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের ধর্মীয় নীতিমালা আকড়ে ধরে রেখেছে। ফলে হায়েনারা মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা লুট করতে ব্যর্থ হয়। মুসলমানদের ১০০% শাফেয়ী মাযহাবের লোক।

ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দীর্ঘ ১৫০ বছর যাবত দেশটি ফ্রান্সের উপনিবেশ থাকার কারণে স্বাধীনতা উত্তরকালে ও দেশটির রাষ্ট্রভাষা ফারসীই থেকে গেছে। তবে সাধারণভাবে লোকেরা আরবীকে লেখার কাজে ব্যবহার করে থাকে। প্রতিটি গ্রুপই পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে নিজস্ব ভাষা চর্চা করে থাকে।

www.pathagar.com

ফরাসী ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কারণে দেশটিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ফারসী ভাষাই ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে মুসলিম শিক্ষার্থীরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা আরবী ভাষায়ই চর্চা করছে। দীর্ঘ ১৫০ বছর পর্যন্ত দেশটি ফ্রান্সের উপনিবেশ থাকার কারণে কমোরোবাসী এখনও নিজেদেরকে ফ্রান্সের নাগরিক হিসেবেও মনে করে। ফলে ফরাসী এখনও তাদের দ্বিতীয় জাতীয়তা হিসেবেই থেকে গেছে। এখনও প্রায় ১,৫০,০০০ কমোরোবাসী ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশটির অবস্থা খুবই খারাপ। এর কারণ প্রধানত দুটি (ক) প্রচুর বৃষ্টিপাত ও (খ) রাজনৈতিক অস্থিরতা। প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে যেমন দেশে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে ঠিক তেমনি রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগও প্রায় শূন্যের কোটায়। ফলে দেশটিতে দ্রব্যমূল্যের হার খুবই বেশি। যেমন একটি রুটির মূল্য ১ সউদী রিয়াল এবং ১ লিটার পেট্রোলের মূল্য ৪ সউদী রিয়াল। এতে জনগণের জীবনযাত্রার মান শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হলেও লেখাপড়ার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক রয়েছে জনগণের। তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও পাঠাচ্ছে।

বর্তমানে নিম্নোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে দেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

১. **কুরআনিক স্কুল ঃ** ছেলেমেয়েদেরকে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা দানের লক্ষে কমোরোর মুসলমানরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব ও প্রাথমিক কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে থাকে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োজিত শিক্ষকরা বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করে থাকেন। কমোরোর প্রতিটি শহর ও গ্রামে এ ধরনের প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

২. **ইসলামিক ইনস্টিটিউট ঃ** কমোরো দ্বীপপুঞ্জে এ ধরনের ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মক্কাভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী' ২০ বছর পূর্বে এ ইনস্টিটিউটগুলো প্রতিষ্ঠা করে। ইনস্টিটিউটের সমস্ত ব্যয়ভার রাবেতা বহন করছে। এ সমস্ত

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউটগুলোতে আরবী ভাষা ও ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞানসহ সাধারণ শিক্ষাও দেয়া হয়।

৩. **সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** ঃ সরকারী স্কুলগুলোতে বিনা বেতনে শিক্ষার্থীদেরকে পড়ানো হয়। এ সমস্ত স্কুলগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হলো ফরাসী ভাষা। তবে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য আরবী ভাষায় ইসলামী শিক্ষাদানের জন্য সউদী সরকার ও কমোরো সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে সউদী আরব থেকে আরবী শিক্ষক প্রেরণ করা হয়েছে। সউদী সরকার এ সমস্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান করে থাকে।

৪. **স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্কুল** ঃ কমোরো দ্বীপপুঞ্জে বেশ কটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করছে। তারা প্রধানত সাধারণ শিক্ষা, ইসলামী শিক্ষা এবং আরবী ভাষা শিক্ষা দিয়ে থাকে। এ সমস্ত চ্যারিটেবল সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রমে সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষে শহর ও শহরতলীতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলেছে। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ভার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোই বহন করে থাকে।

৫. **বেসরকারী স্কুল** ঃ বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণত সরকারী সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা দান করা হয়। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামী শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ইসলামী শিক্ষা কর্মসূচির আওতা বহির্ভূতই থেকে যাচ্ছে। এ সমস্ত শিক্ষার্থীরা তাদের পারিবারিক পরিবেশেই ইসলামী শিক্ষা লাভ করে থাকে। কমোরোবাসীদের একটি অন্যতম প্রধান সামাজিক প্রথা হলো অত্যন্ত জাকজমকের সাথে বিয়ে অনুষ্ঠান ও বিয়ে বার্ষিকী পালন করা। বর যদি সচ্ছল পরিবারের সদস্য হয় তাহলে বিয়ে বার্ষিকী উপলক্ষে তিন থেকে সাত দিনের একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। প্রোগ্রামে বরের পক্ষ থেকে কনেকে কমপক্ষে তিন কিলোগ্রাম ওজনের স্বর্ণালঙ্কার উপহার দেয়া হয় এবং এ অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার লোককে উন্নতমানের সুস্বাদু খাবার দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে অবস্থাভেদে ৫০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০ সউদী রিয়াল খরচ হয়। এ ধরনের অনুষ্ঠান করার জন্য বর প্রয়োজন হলে ২০–২৫ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে। যখনই অনুষ্ঠান করার মত অর্থ তার হাতে আসে তখনই সে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য বিদেশে কর্মরত বরের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরাও

www.pathagar.com

দলে দলে দেশে ফিরে আসে এবং তাদের উপস্থিতির ফলে অনুষ্ঠান আরো জমকালো আকার ধারণ করে। বিয়ে বার্ষিকীতে কনের আত্মীয় স্বজনরা বিশেষ করে কনের ভাইয়েরা তার বোনের সুখের জন্য বিলাসবহুল বাড়ী ও ফার্নিচার উপহার দিয়ে থাকে। যারা এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারে তাদেরকে কমোরো দ্বীপপুঞ্জে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদেরকে প্রথম কাতারে বসার সুযোগ দেয়া হয়। এমনকি মসজিদের প্রথম কাতারেও তাদের জন্য জায়গা সংরক্ষিত থাকে।

ছোট বড় সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় যদিও তারা বিচার-বুদ্ধিহীন মানুষ হয়ে থাকেন। এখানে সম্মানের মাপকাঠি হলো অর্থ। এটি একটি সামাজিক কুপ্রথা। এতে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ব্যাপকহারে অর্থের অপচয় হয়। এ সামাজিক কুপ্রথা বন্ধ করা না গেলে ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপকভাবে নৈতিক পদস্খলন ঘটার আশংকা রয়েছে।

প্রতি বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এ ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। Grand marrage ceremonies উদযাপন করার জন্য কমোরোর সচ্ছল পরিবারগুলো প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ঋণ করে ব্যয় করে থাকে। অথচ এ ধরনের জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের পাশেই দেখা যায় অনাহারক্লিষ্ট কংকালসার বুনি আদমদের মিছিল। এতে সামাজিক ভারসাম্য দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অথচ সরকার ইচ্ছে করলেই আইনের বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে এ অপচয় রোধ করতে পারে। কিন্তু সরকারের সেদিকে কোনো নজর নেই। বিত্তশালী ব্যক্তিদেরকে এ ধরনের অপচয় করা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হলে Marrage ceremony-র জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা অসহায় ও দরিদ্র জ নগণের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে। এতে কপর্দকহীন ব্যক্তিদের জীবনে সচ্ছলতা ফিরে আসবে এবং দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হবে বলে আশা করা যায়।

কমোরো দ্বীপপুঞ্জের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে ইসলামের পথে টিকিয়ে রাখা। যুবকরা সচ্ছল জীবনের আশায় বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থ উপার্জনের জন্য ফ্রান্সে পাড়ি জমায়। সেখানে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে তারা ফ্রান্সের চলমান উগ্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং দেশে এসে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করে। তারা অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়ায় তাদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেয়ার সাহস স্থানীয় লোকদের নেই। ফলে কমোরোর মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য শংকিত হয়ে পড়েছেন।

কমোরোবাসীদের এ সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য শহর, গ্রাম ও শহরতলীতে মসজিদ ও ইসলামিক স্কুল নির্মাণের ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তব চালু করা হয়েছে। বৃদ্ধ ও বয়োজ্যেষ্ঠরা মনে করেন, তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় বেড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে ব্যাপকহারে ইসলামিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবী।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আরবী ভাষা, ফিকাহ্ শাস্ত্রসহ অন্যান্য ইসলামী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

দেশটিতে ভবিষ্যতে ইসলামী শাসন কায়েমের লক্ষে এখনো কোনো কার্যকর ইসলামী আন্দোলনের সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে একটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে যে, কমোরা দ্বীপপুঞ্জে ইসলামী আন্দোলনের কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হয়েছে। এ আন্দোলনকে আরো বেগবান করার জন্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনগুলোকে অর্থ ও ইসলামী সাহিত্য নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন। ইসলামী আন্দোলনের আজকের এ ক্ষীণ আলোকরশ্মিটি আগামী দিনের কমোরো দ্বীপে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দ্বীপ রাষ্ট্রটিকে ইসলামের আলোয় ব্যাপকভাবে আলোকিত করে তুলুক এটাই আজকের দিনে আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), সেপ্টেম্বর, ২০০৩।

www.pathagar.com

থাইল্যান্ডে ইসলাম ও মুসলমান

থাইল্যান্ড বৌদ্ধ প্রধান একটি দেশ। দেশটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র পাড়ে অবস্থিত। পূর্বে এ দেশটি শ্যাম দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৮২ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী দেশটির মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৪৩ লাখ। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১১.৯%। কিন্তু থাই সরকার ও বৌদ্ধ জনগণের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক থাই মুসলমান দেশত্যাগ করে মালয়েশিয়াসহ প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে আশ্রয় নেয়। অনেক মুসলমান সরকারী বাহিনী ও স্থানীয় বৌদ্ধদের নির্মম নির্যাতনে প্রাণ হারায়। ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা ৩.৮%। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৫০ লাখ। অথচ ১৯৮২ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৫২, ৫০,০০০। সরকারী ও বেসরকারী নির্যাতন ও দমননীতি চালানো না হলে, মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে প্রায় এক কোটিতে এসে দাঁড়াত। এ পরিসংখ্যান থেকেই জানা যায় যে, থাই মুসলমানরা এক বৈরি পরিবেশে নির্মম নির্যাতনের মধ্য দিয়েই তাদের পথ চলা অব্যাহত রেখেছে। অর্থাৎ শত নির্যাতন ও নিপীড়ন সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের স্বাতন্ত্র ভুলে যায়নি বরং সটান আলিফের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয় বরং মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য থাই সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র সংগ্রামও অব্যাহত রেখেছে।

থাই মুসলমানরা সাধারণত দক্ষিণ থাইল্যান্ডের সাতুন, ইয়ালা, সঙ্গলা, বারাথিউয়াত ও পাত্তানী অঞ্চলে বসবাস করে। এ অঞ্চলগুলোকে এক কথায় পাত্তানী অঞ্চল নামে অভিহিত করা হয়। ১৬ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পাত্তানী একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু ১৬ শতকের শেষার্ধে থাই রাজারা পাত্তানী দখল করে থাইল্যান্ডের সাথে একীভূত করে নেয়। ফলে মুসলমানদের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং তারা নতুনভাবে থাই মুসলমান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অপর এক তথ্যে জানা যায় যে, ১৭৪৬ সালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থাই সরকার পাত্তানী দখল করে নেয়। দেশটি দখল করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং পরিকল্পিতভাবে তারা মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও ধ্বংস করে দেয়।

www.pathagar.com

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এ দেশটি মায়ানমারের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। এর একদিকে রয়েছে আন্দামান সাগর এবং অপর দিকে রয়েছে থাই উপসাগর। দেশটির মোট আয়তন ৫,১৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং বর্তমান জনসংখ্যা ৬,৪২,৬৫,২৭৬ জন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে থাই ৭৫%, চীনা ১৪%, মুসলমান ৩.৮% এবং অন্যান্য ৭.২%। দেশটি মোট ৭৬টি প্রদেশে বিভক্ত।

থাইল্যান্ডে ইসলামের আগমন সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা না গেলেও ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মালাবারের মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই থাইল্যান্ডে ইসলামের আগমন ঘটে। একই সময় আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায়ও ইসলামের প্রসার ঘটে। এছাড়াও এ সময় বাংলাদেশ, চীন ও ইন্দোনেশিয়ায়ও ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব ও অবস্থানের তারতম্য সত্ত্বেও এসব দেশের মুসলমানদের মধ্যে একটি গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়, যার ফলে ইসলাম এ অঞ্চলে দ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং মুসলমানরা একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

অপর একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে থাইল্যান্ডে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। এ সময় ইয়েমেন, পারস্য, ভারত, বাংলাদেশ, চীন এবং কম্বোডিয়া থেকে মুসলমানরা ইন্দোনেশিয়া ও মালয় দীপপুঞ্জে আসতে থাকে এবং মালাকার সুলতান ইস্কান্দারের আমলে পাত্তানীতে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। ষোড়শ শতকে পাত্তানীর যুবরাজের ইসলাম গ্রহণের ফলে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার ঘটে। থাইল্যান্ডে ইসলাম দ্রুত বিকাশ লাভ করায় ইসলামের মূল শিক্ষা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইতিহাস সাক্ষী মুসলমানরা যখনই কোনো নতুন জনপদে বসতি স্থাপন করেছে তখনই সেখানে সর্বপ্রথম তারা মসজিদ নির্মাণ করেছে। এ মসজিদের মিনার থেকেই দৈনিক পাঁচ বার আযানের মাধ্যমে একদিকে যেমন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা দেয়া হয় অপরদিকে আযানের সুমধুর আওয়াজ অমুসলিমদেরকেও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবেই ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যই প্রতিটি নতুন জনপদে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সহায়তা করে আসছে।

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে মুসলিম নেতৃবৃন্দ পনডক পদ্ধতির (মাদরাসা ভিত্তিক) শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। এ শিক্ষা পদ্ধতি চালুর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত আহমদ বিন মুহাম্মদ জৈন আল-কাতানী ও দাউদ আল-কাতানী। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য এ অঞ্চলের মুসলমানরা আজো তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

গোটা পাত্তানী অঞ্চলে মুসলমানরা অনেক মসজিদ, মাদরাসা এবং ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ করেছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে থাইল্যান্ডে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইসলাম তার স্বকীয় মর্যাদায় সমুজ্জল। অপকর্ম ও অশ্লীলতার প্রধান ঘাটি বলে বিশ্ব খ্যাত ব্যাংকক নগরীর প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত 'মসজিদুল ইহসান' ইসলামী স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব নিদর্শন নিয়ে আজো সগৌরবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। এ মসজিদে একই সময় দেড় হাজার মুসলমান একত্রে জামায়াতে নামায আদায় করতে পারেন। এ মসজিদের দু' ধারে রয়েছে হাজারো রঙের ফুল আর সবুজের সমারোহ। সবুজ শ্যামল বৃক্ষরাজি মসজিদের শোভা বর্ধন করেছে। একটি সুপ্রশস্ত এলাকা জুড়ে মসজিদটি অবস্থিত। এটি একটি কমপ্লেক্স। এর নীচ তলায় সভা-সমাবেশ এবং দু'তলায় নামাযের ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দু'তলাটি সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদে মহিলাদেরও নামাযের ব্যবস্থা আছে। মসজিদের উপরে রয়েছে মনোমুগ্ধকর গম্বুজ ও সুউচ্চ মিনার। মসজিদ সংলগ্ন 'দারুল ইহসান' নামে একটি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটিকে ব্যাংককে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে আবাসিক সুবিধাও রয়েছে। এছাড়াও মসজিদ এলাকায় 'রাওদাতুল আতফাল' নামে একটি ইসলামী কিন্ডার গার্টেন রয়েছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এখানে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষা লাভ করছে। সারা ব্যাংককে এ ধরনের প্রায় দেড় শতাধিক মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

প্রায় আশি-নব্বই বছর পূর্বে থাই মুসলমানদের জীবনে সবচেয়ে কঠিন সময় অতিবাহিত হয়। এ সময় থাই সরকার মুসলমানদেরকে ইসলামী জীবন যাপনে বাধা দেয়। এমনকি ইসলামী নাম রাখা হলে তাদেরকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। শাসকদের ধারণা ছিল মুসলমানদেরকে এভাবে নির্যাতন করে ইসলামী অনুশাসন মানা থেকে বিরত রাখা যাবে এবং এক পর্যায়ে তারা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ভুলে গিয়ে বৃহত্তর বৌদ্ধ সমাজে একীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু থাইল্যান্ডের মুসলমানরা প্রমাণ করেছে

www.pathagar.com

যে, শত নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও ইসলামের পথে টিকে থাকাই ঈমানের দাবী। নির্যাতন যতই তীব্র হয়েছে ততই তাদের ঈমানও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। এ যেন হযরত বেলালের নির্যাতনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও মুসলমানরা পারিবারিক পরিবেশে ইসলামী নামের চর্চা এবং ইসলামী নিয়ম-কানুন অব্যাহত রেখেছে। মুসলমানরা শত বাধা বিপত্তির মুখেও বিরাট বৌদ্ধ সমাজে লীন হয়ে না গিয়ে কঠোর সংগ্রাম আর সাধনার মধ্যদিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। এ নির্মম নির্যাতনের মধ্য দিয়েই মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। এমনি এক কঠিন মুহূর্তে ১৯০২ সালে পাত্তানীসহ ৬টি সুলতান শাসিত মুসলিম প্রদেশ থাই সরকার সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেয়। ফলে ৫টি প্রদেশের ৫ জন সুলতান ও তাদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ মালয়েশিয়ায় স্বেচ্ছায় নির্বাসনে চলে যায়। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন সুলতান আবদুল কাদির কামাল উদ্দিন। তিনি থাইল্যান্ডে থেকে যান এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু থাই সরকার তাঁর আন্দোলন নির্মমভাবে দমিয়ে দেয় এবং তাঁকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। তিন বছর কারারুদ্ধ থাকার পর তাদানিন্তন মালয়েশিয়া সরকারের চাপের মুখে থাই সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

সুলতান আবদুল কাদির কামাল উদ্দিন সূচিত এ প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার করার লক্ষে সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র টেঙ্কু আবদুল কাদের এর নেতৃত্বে 'পাত্তানী মালয় মুভমেন্ট' নামে একটি সশস্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে পাত্তানীর স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষে টেঙ্কু আবদুল কাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'বি. এন. পি. পি' নামে একটি রাজনৈতিক দলও গঠন করেন। এটিই পাত্তানী মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল গঠন করার পর পাত্তানী তথা থাইল্যান্ডের মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে থাই মুসলমানরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। মূলত টেঙ্কু আবদুর কাদের-এর এ রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যদিয়েই কার্যত থাইল্যান্ডে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়। ফলে দ্রুত তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি নিজেকে পাত্তানীর শাসক ঘোষণা করেন। তাঁর এ ঘোষণার ফলে থাই সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে এবং তাঁর আন্দোলনকে

www.pathagar.com

কঠোর হস্তে দমন করার পাশাপাশি মালয়েশিয়ার সীমান্ত এলাকার প্রদেশগুলোর স্থানীয় শাসকদের সকল ক্ষমতা এক ডিক্রি জারীর মাধ্যমে থাই রাজা কেড়ে নেয়। থাই সরকারের এ দমননীতি সত্ত্বেও পাত্তানী অঞ্চলের মুসলমানরা থাই সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। এমনকি তারা কখনোই নিজেদেরকে থাই জাতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করেনি।

প্রকাশ্যে মুসলমানদের রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হলেও গোপনে লোক তৈরির আন্দোলন অব্যাহত থাকে। কারণ ভবিষ্যতে কখনো অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে পুনরায় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হলে যাতে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি না হয় সেজন্য এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

ফিল্ড মার্শাল সারিত থানরাতের শাসনামলে ১৯৬০ সালে মুসলমানদের ওপর আবার নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। এ সময় সরকার মুসলমানদের আর্থিক সহযোগিতায় বেসরকারীভাবে পরিচালিত ৩৫৫টি মাদরাসার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এরমধ্যে ১৫০টি মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে থাইল্যান্ডে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম কার্যত রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এতে মুসলমানরা থাই সরকারের বিরুদ্ধে আরো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

মুসলমানরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষে এ সময় অনেকগুলো রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এ সংগঠনগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. বারাসি রেভোলুসি নাসিওনাল (বি. আর. এন)−১৯৬০ ইং

২. পাত্তানী ইউনাইটেড লিবারেশন অরগানাইজেশন (পি. ইউ. এল. ও)−১৯৬৮ইং

৩. মুজাহিদীন পাত্তানী মুভমেন্ট (বি. এন. পি)−১৯৮৫ ইং

মুজাহিদীন পাত্তানী মুভমেন্ট একটি ইসলামী আন্দোলন। থাই মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এ সংগঠনটি বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ অন্যান্য মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে একটি সম্মিলিত ইসলামী ফ্রন্ট গঠন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হলে থাইল্যান্ডে চলমান ইসলামী আন্দোলন আরো জোরদার হবে এবং আগামী দিনে পাত্তানী একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে ও সেখানে কুরআনী আইন চালু হবে বলে থাই মুসলমানরা বিশ্বাস করেন।

www.pathagar.com

থাই মুসলমানদের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। কোনো জনপদের মানুষ যখন অধিকার বঞ্চিত হয় তখন তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন যখন বাধাগ্রস্ত হয় এবং আন্দোলনকারীদের ওপর নির্মম নির্যাতন নেমে আসে তখনই তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ পরিহার করে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। থাই মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

থাই মুসলমানদেরকে যেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলো ঃ

১. আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর পূর্বে থাই মুসলমানদেরকে ইসলামী নামের পরিবর্তে বৌদ্ধ (থাই) নাম রাখতে চাপ সৃষ্টি করা।

২. দক্ষিণ থাইল্যান্ডের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল পাত্তানীকে উন্নয়ন কর্মসূচির আওতা বহির্ভূত রাখা।

৩. মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা।

৪. শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা না দেয়া।

৫. স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

৬. মুসলমানদের ভাষা, সংস্কৃতি ও মালয় জাতীয়তাকে স্বীকৃতি না দেয়া।

৭. মুসলিম অধ্যুষিত পাত্তানী অঞ্চল একটি উত্তম পর্যটন এলাকা হওয়া সত্ত্বেও পর্যটন শিল্পে মুসলমানদের চাকরির কোনো সুযোগ না রাখা।

৮. পর্যটন খাত থেকে অর্জিত সমস্ত অর্থ থাইল্যান্ডের অন্যত্র উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা।

৯. মুসলমানদের চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে সরকারের গুরুত্ব না দেয়া।

১০. শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানরা চরম বৈষম্যের শিকার। দেশটিতে সাক্ষরতার হার ৮৫% হলেও মুসলমানদের সাক্ষরতার হার মাত্র ১০%। ফলে মুসলমানরা অধিকাংশই অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

১১. শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়ার কারণে মর্যাদাসম্পন্ন সরকারী চাকরি থেকে বঞ্চিত হওয়া।

www.pathagar.com

১২. ১৯৮২ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০০টি মসজিদ ধ্বংস করা (এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ১৯৮২ সালে থাইল্যান্ডে মোট ২৫০০টি মসজিদ ছিল। বর্তমানে এ সংখ্যা ২০৭টিতে এসে দাঁড়িয়েছে।)

১৩. নবাগত শিশুর নাম সরকারী খাতায় নিবন্ধন করার সময় বৌদ্ধ নাম রাখতে বাধ্য করা।

১৪. মুসলমানদের জাতিসত্ত্বা বিকাশের লক্ষে চলমান ইসলামী আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার লক্ষে থাই সরকার কর্তৃক মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বৌদ্ধ চরমপন্থীদেরকে বসতি গড়তে পরিকল্পিতভাবে সহযোগিতা দেয়া।

১৫. থাই সংবিধানে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের কথা স্বীকৃত না হওয়া।

১৬. সরকারী নীতির বিরুদ্ধে যাতে মুসলমানরা কার্যকর কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে সেজন্য থাই সরকার দীর্ঘদিন যাবত মুসলিম অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলে সামরিক শাসন জারী করে রেখেছে। এছাড়াও আরো অসংখ্য কারণ রয়েছে যা মুসলিম তরুণদেরকে থাই সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তুলে এবং এর পরিণতিতে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। '৬০ এর দশকে মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলেও ১৯৬৪ সালে 'ইয়াং মুসলিম এসোসিয়েশন অব থাইল্যান্ড' গঠনের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ সালে (১) পাত্তানী ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (২) বারিসান রেভ্যুলুসি ন্যাশনাল এবং (৩) জেরাকান মুজাহিদীন ইসলামী পাত্তানী নামক গেরিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গেরিলা সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারী স্থাপনার ওপর আক্রমণ জোরদার করা হয়। ফলে থাই মুসলমানদের ওপর 'সরকারী নির্যাতনের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারী নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে মুসলিম গেরিলারা দক্ষিণ থাইল্যান্ডের একটি সেনাক্যাম্পে সশস্ত্র হামলা চালায়। এ হামলায় ৪ জন থাই সৈন্য নিহত হয় এবং মুসলিম গেরিলারা ৩০০টি অস্ত্র থাই সেনাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। এতে থাই প্রধানমন্ত্রী মি. থাকসিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেনা

www.pathagar.com

অভিযান জোরদার করার নির্দেশ দেন। মুসলিম গেরিলারাও পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উভয় পক্ষের এ রণপ্রস্তুতির বহিপ্রকাশ ঘটে ২০০৪ সালের ২৮ এপ্রিল এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।

২৮ এপ্রিল খুব ভোরে মুসলিম মুজাহিদরা দক্ষিণ থাইল্যান্ডের পাত্তানী, ইয়ালা ও সঙ্খলা প্রদেশের ১০টি পুলিশ ফাঁড়ি ও নিরাপত্তা পোস্টে এক যোগে আক্রমণ করে। দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত এই হামলা অব্যাহত থাকে। মুসলিম মুজাহিদরা খুব হালকা অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। ফলে থাই সুসজ্জিত সেনা আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তারা স্থানীয় পাত্তানী মসজিদে আশ্রয় নেয়। সেনাবাহিনী মসজিদটি ঘিরে ফেলে এবং নির্বিচারে ব্রাশ ফায়ার করে মসজিদের অভ্যন্তরে ৪০ জন মুজাহিদকে হত্যা করে। এ সংঘর্ষে মসজিদের ভিতরে ও বাইরে মোট ১০৭ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করে। এতো বড় ধরনের রক্তাক্ত ঘটনা দক্ষিণ থাইল্যান্ডে আর কখনো ঘটেনি। ফলে থাই মুসলমানদের মনে দারুণ ক্ষোভ ও ভীতির সঞ্চার হয়। সেনাবাহিনীর আক্রমণের ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত মসজিদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ১৫৭৮ সালে এক চীনা মুসলিম মহিলার আর্থিক সহযোগিতায় মসজিদটি নির্মিত হয়। ২৮ এপ্রিলের রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতেই ২৫ অক্টোবর ২০০৪ মুসলমানদের এক বিক্ষোভ মিছিল থেকে তেরশ' লোককে গ্রেফতার করে হাত বেঁধে ট্রাকে তোলা হয়। এতে শ্বাস বন্ধ হয়ে ৮৭জন রোযাদার মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এ হত্যাকাণ্ড ইতিহাসে 'ট্রাক চেম্বার হত্যাকাণ্ড' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকলো। শুধু তাই নয়, ২০০৪ সালে সহিংসতায় মুসলিম প্রধান দক্ষিণাঞ্চলে ৫৫০জন লোক নিহত হয়।

২৮ এপ্রিল ও ২৫ অক্টোবরের রক্তাক্ত গণহত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন মুসলিম পাত্তানী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আবার আকৃষ্ট হয়।

থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা গত ৮ মে, ২০০৪ ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদ পরিদর্শন করেন এবং সরকারী স্থাপত্য বিভাগের মাধ্যমে মসজিদটি সংস্কারের আশ্বাস দেন। এছাড়াও সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও সরকারী অর্থে পুনর্গঠন করার আশ্বাস দেয়া হয়। পাত্তানী অঞ্চলের মুসলিম তরুণ মুজাহিদরা নিজেদের জীবন দিয়ে ত্যাগ আর সাহসিকতার যে নজির রেখে গেলেন তার রক্তাক্ত পথ ধরেই আগামী দিনের মুক্তি সংগ্রাম আরো বেগবান হবে এবং স্বাধীন মুসলিম পাত্তানী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে বলে থাই মুসলিম নেতৃবৃন্দ মনে করেন।

www.pathagar.com

আমরাও বিশ্বাস করি, থাই মুসলমানরা শত বাধাবিপত্তি আর নির্যাতন সত্ত্বেও যখন নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং ২৮ এপ্রিল ও ২৫ অক্টোবরের ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে যে নব-জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আশা করা যায় যে, আগামী দিনে স্বাধীন মুসলিম পাত্তানী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখানে কুরআনী শাসন কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ্।

সূত্র ঃ ১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর–ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

২. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপ্রিল ও ১৪ মে, ২০০৪।

৩. দৈনিক সংগ্রাম, ৮ মে, ২০০৪।

৪. সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৪ মে, ২০০৪।

৫. দ্য বাংলাদেশ টু ডে, ২৯ ও ৩০ এপ্রিল ২০০৪।

৬. দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ নভেম্বর, ২০০৪।

www.pathagar.com

অস্ট্রেলিয়ায় ইসলাম ও মুসলমান ঃ শিক্ষা বিস্তারে তাদের ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে অস্ট্রেলিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষে মুসলিম নেতৃবৃন্দ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC), Sydney-তে King Fahad Islamic School নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। সউদী বাদশাহ্ ফাহ্দ এ স্কুল প্রতিষ্ঠায় অর্থ যোগান দেন। বর্তমানে এ স্কুলে ২০০০ ছাত্র-ছাত্রী, ১০০ শিক্ষক এবং ২৫ জন আরবী ভাষা ও ধর্মীয় শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। স্কুলটির পড়াশোনার মান অত্যন্ত উন্নত। সিউনীতে প্রতিষ্ঠিত শতবর্ষের পুরনো স্কুলের সাথে প্রতিযোগিতায় এ স্কুলটি প্রথম শ্রেণীর স্কুলের মর্যাদা লাভ করেছে। এ বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের যে কোনো সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। অবশ্য ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেই তারা এ সুযোগ অর্জন করছে। AFIC-এর সভাপতি Mr. Abbas Ahmed এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে স্কুলের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ভবন নির্মাণের লক্ষে জমি ক্রয় করা এবং ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বাদশাহ্ ফাহ্দ বরাদ্দ করেন। সিডনীতে দ্বিতীয় ইসলামিক স্কুল নির্মাণের লক্ষে ইতোমধ্যেই ৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে জমি ক্রয় করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরেও AFIC-র উদ্যোগে ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মধ্যে Melbourne, Adelaide এবং Brisbane-এ প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলো সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। AFIC-এর পাশাপাশি Australian Islamic Cultural Centre ও Sydney, Melbourne এবং Perth এ Islamic School প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সংস্থার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হলে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক উম্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি এ দুটি সংস্থা ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে দাওয়াহ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। দাওয়াহ কাজের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করছে। দাওয়াহ কর্মসূচি বাস্তবায়নে মক্কাভিত্তিক আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ সংস্থা রাবেতা আলমে ইসলামী প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করছে। শিক্ষা ও দাওয়াহ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় যে, আগামী দিনের অস্ট্রেলিয়ায় ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। আমরা অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানদের সেই সোনালী ভবিষ্যতের প্রতিক্ষায় রইলাম।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড (সাপ্তাহিক), মক্কা, নভেম্বর ২৩, ২০০১।

www.pathagar.com

সিঙ্গাপুরে ইসলাম ঃ জামেয়া সিঙ্গাপুরের ভূমিকা

সিঙ্গাপুর এশিয়ার অন্যতম একটি অর্থনৈতিক শক্তি। ১৯৬৫ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের সময় সিঙ্গাপুর ছিল হতদরিদ্র একটি দেশ। এটি একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ-র নেতৃত্বে ১৯৬৩ সালে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার সাথে একীভূত হয়েছিল। কিন্তু মালয়েশিয়ার তদানিন্তন সরকার সিঙ্গাপুরকে দেশটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রাখার কোনো যৌক্তিকতা না পেয়ে জোর করে সিঙ্গাপুরকে স্বাধীনতা প্রদান করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একটি হতদরিদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র কিভাবে তার স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখবে সে সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ বলেন, "It became a heart without body." অর্থাৎ "এ যেন শরীর বিহীন একটি হৃদয়।" অথচ এ হতদরিদ্র রাষ্ট্রটিই সঠিক নেতৃত্বের ফলে তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত রাষ্ট্র হতে উন্নত বিশ্বের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ৪২ লাখ এবং আয়তন মাত্র ২৪৭ বর্গমাইল। বর্তমানে দেশটির মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। স্বাধীনতা লাভের স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশটি শীর্ষস্থানীয় অর্থনৈতিক শক্তির একটি দেশে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক শক্তি-সামর্থ ও প্রভাব বলয়ের ক্ষেত্রে দেশটি তাইওয়ান, হংকং ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে চলছে। ফলে সিঙ্গাপুর বিদেশী দক্ষ জনশক্তির এক আকর্ষণীয় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আর এ দক্ষ জনশক্তির সার্বিক পদচারণার ফলেই সিঙ্গাপুর আজ একটি অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে। অথচ ৪০ বছর পূর্বে সিঙ্গাপুর ছিল হতদরিদ্র একটি দেশ। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছে। সব ধর্মের লোকেরাই সকল প্রকার নাগরিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। 'পিপলস অ্যাকশন কমিটি'-র প্রধান গো কে তং ১৯৯০ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। আগস্ট ২০০৪ মাসে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রীর ছেলে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি দেশটির তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

www.pathagar.com

আলাদা সিঙ্গাপুরে কখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এ ব্যাপারে সঠিক কোনো তথ্য জানা না গেলেও ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরব বণিকদের মাধ্যমেই সিঙ্গাপুরে ইসলামের আগমন ঘটে। একই সময়ে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও চীনেও ইসলামের আগমন ঘটে।

সিঙ্গাপুরে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষে ১৯৩২ সালে 'জামেয়া সিঙ্গাপুর' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিগত ৭০ বছর যাবত এ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সিঙ্গাপুরে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শেখ আবু বকর জামেয়ার প্রধান হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন। জামেয়া শুধু শিক্ষা কার্যক্রমই বাস্তবায়ন করছে না বরং ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে বিভিন্নমুখী সামাজিক কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করছে। জামেয়ার বর্তমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো ঃ

১. শিক্ষা কার্যক্রম

শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিম্নোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম–

ক. জামেয়া প্রাইমারী স্কুল
খ. জামেয়া শিশু কেয়ার সেন্টার
গ. জামেয়া এডুকেশন সেন্টার
ঘ. জামেয়া বিজনেস স্কুল
ঙ. বৃত্তি ও অনুদান প্রকল্প
চ. জামেয়া তথ্য ও প্রকৌশল ইনস্টিটিউট।

২. সমাজকল্যাণ কার্যক্রম

এ কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহ ঃ

ক. জামেয়া শিশু নিবাস (দারুল মা'ওয়া)
খ. জামেয়া বয়স্ক নিবাস (দারুল তাকরীম)
গ. জামেয়া দিবা নিবাস (দারুল ইসলাহ)
ঘ. জামেয়া নার্সিং হোম (দারুস শিফা)
ঙ. জামেয়া খাদ্য কর্মসূচি
চ. জামেয়া দাতব্য চিকিৎসালয়
ছ. জামেয়া আইনী পরামর্শ কেন্দ্র (অবৈতনিক)

www.pathagar.com

৩. দাওয়াহ কার্যক্রম

এ কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রমসমূহ

ক. জামেয়া মহিলা দাওয়াহ কেন্দ্র

খ. জামেয়া যুব দাওয়াহ কেন্দ্র

গ. জামেয়া প্রকাশনা ও জনসংযোগ কেন্দ্র

জামেয়ার চলমান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে নিম্নে উল্লেখযোগ্য কটি কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

জামেয়া শিশু নিবাস

১৯৯৩ সালে শিশু নিবাসটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ নিবাসে ইয়াতীম শিশুদের লালন পালন ও তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে শিশু নিবাসে ৫৫জন ছেলে ও ২৫জন মেয়েসহ মোট ৮০জন ইয়াতীম ও পথশিশু বসবাস করছে। এ সমস্ত শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়া হয়। তাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের লক্ষে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধূলা ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। শিশু নিবাসের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা মেধাবী তাদেরকে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে দেয়া হয় এবং তাদের উচ্চশিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার জামেয়া বহন করে থাকে। এছাড়াও যারা কমপিউটার প্রোগ্রামার হতে চায় তাদেরকেও সে ধরনের পড়াশোনার সুযোগ দেয়া হয়।

বর্তমানে শিশু নিবাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জন্য জামেয়া কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে ৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট প্রণয়ন করেছে। দেশী বিদেশী মুসলিম সংস্থা ও দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ অর্থ সংগ্রহ করা হবে বলে জামেয়া সূত্রে জানা গেছে।

বয়স্ক নিবাস কেন্দ্র

সমাজের অসহায় বয়স্ক লোকদের থাকা খাওয়া ও চিকিৎসা সুবিধাসহ জীবন ধারণের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষে ১৯৯৬ সালে

www.pathagar.com

বয়স্ক নিবাস কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে শুধু মুসলমানরাই নয় বরং অন্যান্য ধর্ম ও বর্ণের অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও আশ্রয় পেয়ে থাকে। ফলে বৃদ্ধ নিবাসটি সব ধর্মের লোকদের একটি মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের নিবাস যতবেশি করা যাবে সমাজের জন্য ততবেশি কল্যাণকর হবে। কারণ একত্রে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের বসবাসের কারণে পরস্পর পরস্পরকে জানার সুযোগ পাবে এবং এতে তাদের মধ্যে একটি সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে যা একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের পথকে আরো প্রশস্ত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সম্প্রতি ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে বৃদ্ধ নিবাসটিকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

জামেয়া বিজনেস স্কুল

১৯৯৯ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি সিঙ্গাপুর সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধনকৃত এবং বৃটেনের ক্যামব্রীজ ইউনিভার্সিটির এফিলিয়েটেড একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে ছাত্রছাত্রীদেরকে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি করানো হয়। আগামী এক বছরের মধ্যে স্কুলে নিম্নোক্ত কোর্সসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জামেয়া কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে।

কোর্সসমূহ

ক. অফিস ব্যবস্থাপনা
খ. বুক কিপিং
গ. বিজনেস ইংরেজী
ঘ. তথ্য প্রযুক্তি
ঙ. হিসাব ব্যবস্থাপনা
চ. আরবী ভাষা কোর্স
ছ. মার্কেটিং ও দূর শিক্ষণ প্রোগ্রাম

স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি আগামী বছর থেকে স্কুলটিতে স্নাতক কোর্স চালুর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে। এছাড়াও স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের Toledo University (ohio)-র সাথে অন লাইনে Business Management Technology ডিগ্রী চালুর ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। জামেয়া বিজনেস স্কুলে বিদেশী শিক্ষার্থীদেরও পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। যদি কোনো বিদেশী শিক্ষার্থী জামেয়ায় পড়াশোনা করতে চায়

www.pathagar.com

তাহলে জামেয়া তাদের ভিসা প্রাপ্তির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও করে থাকে।

ইসলামিক সেন্টার

ইসলামিক সেন্টারটি জামেয়ার কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি Geylang region এ অবস্থিত। সারা দেশ থেকে এই সেন্টারের সাথে যোগাযোগের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। তাই বলা হয় জামেয়ার সকল শাখা থেকে যোগাযোগের এটি একটি নার্ভ সেন্টার। ইসলামিক সেন্টারটি একটি বহুতল ভবন। এ ভবনে রয়েছে জামেয়া প্রি-স্কুল (১৯৮৪)। এখানে তিন থেকে ছয় বছর বয়েসী ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে থাকে। বর্তমানে এ স্কুলে ১৫০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এছাড়াও এ ভবনে একটি ফ্রি মেডিকেল ইউনিট চালু করা হয়েছে। এ ইউনিট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকে। এ সেন্টারে ইমুনাইজেশন প্রোগ্রামও চালু রয়েছে। হজ্জ ও ওমরাহ পালনের জন্য সউদী আরব গমনকারী মুসলমানদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করা হয়। এটি একটি উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবা ইউনিট।

ইসলামিক সেন্টারে জামেয়ার একটি অবৈতনিক পরামর্শ কেন্দ্র রয়েছে। জনগণের প্রয়োজনানুযায়ী এখান থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কালামে পাকে বলা হয়েছে ঃ

> "The Believers ore but a single brotherhood, so make reconciliation between your two (Contending) brothers and fear Allah, that you may receive Mercy."-Qur'an : 49 : 10)

> অর্থাৎ "মু'মিনরা তো (একে অপরের) ভাই, অতএব, (বিরোধি দেখা দিলে) তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করা হবে।"–কুরআন ঃ ৪৯-১০

কালামে পাকের এ নির্দেশের আলোকেই ১৯৭৬ সালে পরামর্শ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুধু '৯০ সালেই এ সেন্টারের মাধ্যমে ৪ হাজার লোককে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। এটি একটি সামাজিক কাজ। এ ধরনের পরামর্শ সেন্টারের মাধ্যমে খুব সহজেই মানুষের প্রয়োজনে সহযোগিতা করা যায়। এ কেন্দ্রে যারা কর্মরত রয়েছেন তারা সবাই

www.pathagar.com

অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবক। শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থেই তারা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাদের এ নেক কাজসমূহ কবুল করুন এবং জান্নাতে এর বিনিময় দান করুন।

প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম শব্দ 'ইকরা' (Read)-এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই জামেয়া প্রকাশনা বিভাগ চালু করেছে। জামেয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো প্রকাশনা বিভাগ। পড়ার সাথে লেখা এবং প্রকাশনার সম্পর্ক রয়েছে। পড়তে হলে বই বা কিতাব প্রয়োজন। আর বই বা কিতাবের জন্য প্রয়োজন প্রকাশনার। সুতরাং পড়া, লেখা এবং প্রকাশনা এ তিনটি শব্দ পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "Read in the Name of Your Lord Who has created (all that exists)"- Quran, 96 : 1. অর্থ ঃ "(হে মুহাম্মাদ) তুমি পড়ো, (পড়ো) তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"–কুরআন, ৯৬ ঃ ১। জামেয়া প্রকাশনা বিভাগ ১৯৭০ সাল থেকে 'ভয়েস অব ইসলাম' নামে একটি ম্যাগাজিন নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। ম্যাগাজিনটি মালয় ইংরেজী ও আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। জামেয়া প্রকাশনা বিভাগ থেকে ইসলামী পুস্তক, পত্রিকা, পোস্টার, লিফলেট ও কুরআন-হাদীস গ্রন্থ ছাপানো ও বিলি করা হয়।

জামেয়া জনসংযোগ বিভাগের প্রধান কাজ হলো প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং এর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা পালন করা।

সিঙ্গাপুরে ইসলামকে একটি বিকশিত ধর্মে উন্নীত করার ক্ষেত্রে জামেয়া গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জামেয়ার এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আগামী দিনের সিঙ্গাপুরের রাজনীতিতে ইসলাম ও মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র ঃ ১. দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা), এপ্রিল, ২০০২।
২. দৈনিক ইত্তেফাক, উপসম্পাদকীয়, ১০ অক্টোবর, ২০০৪।

www.pathagar.com

এক নজরে মুসলিম বিশ্বের পরিসংখ্যানগত তথ্য

মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। থাইল্যান্ড, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, কাশ্মীর, মিন্দানাও, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, চেচনিয়া, মেসিডোনিয়াসহ বিশ্বের দিকে দিকে মুসলিম জনপদগুলো আজ হায়েনাদের হিংস্র নখরাঘাতে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। এক একটি জনপদ যেনো জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরীর লাভায় আচ্ছন্ন। এমনি এক প্রেক্ষাপটে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. আয়তন ঃ

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান মোট আয়তন ৩২ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার।

২. জনসংখ্যা ঃ

বিশ্ব জনসংখ্যার ২২% মুসলমান। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ১.৩ বিলিয়ন। এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় ২২৫ মিলিয়ন, পাকিস্তানে ১৪২ মিলিয়ন এবং বাংলাদেশে ১২৯ মিলিয়ন।

৩. দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে ঃ

১.৫ মিলিয়ন লোক দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। এ সুযোগে খৃস্টান সাহায্য সংস্থাগুলো সাহায্যের নামে অসহায় মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। এর মুকাবিলায় মুসলিম সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

৪. আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ঃ

কাজাখিস্তান, সুদান ও আলজেরিয়া।

৫. আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্রতম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ

মালদ্বীপ, বাহরাইন ও কসোভো দ্বীপপুঞ্জ।

৬. আফ্রিকা মহাদেশে মুসলিম দেশের সংখ্যা ঃ

অফ্রিকা মহাদেশে মুসলিম দেশের সংখ্যা মোট ২৬টি।

৭. এশিয়া মহাদেশে মুসলিম দেশের সংখ্যা ঃ

এশিয়া মহাদেশে মুসলিম দেশের সংখ্যা মোট ২৭টি।

www.pathagar.com

৮. বৃহত্তম দ্বীপ ঃ

ক. মালয়েশিয়ার বর্নিও দ্বীপ। এ দ্বীপের মোট আয়তন ৭,৪৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

খ. ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের আয়তন ৪৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটার।

৯. জনসংখ্যার ভিত্তিতে ছোট রাষ্ট্রসমূহ ঃ

মালদ্বীপ - ৩,০১,০০০ জন।

ব্রুনাই- ৩,৩৬,০০০ জন এবং

সুরিনাম -৪,৩১,০০০ জন।

১০. মহাদেশ ভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যা ঃ

এশিয়ায় ৮৫২ মিলিয়ন এবং আফ্রিকায় ৪৩৮ মিলিয়ন।

১১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি ঃ

ফিলিস্তিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি-৮%।

১২. অস্ত্র খাতে ব্যয় ঃ

মুসলিম দেশসমূহ অস্ত্র ক্রয় খাতে ১৯৯৭ সালে মোট ৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে।

১৩. শিশু মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি ঃ

আফগানিস্তান, আফ্রিকা, সিয়েরা লিয়ন ও মোজাম্বিক।

১৪. দীর্ঘজীবী ঃ

জর্দান ৭৭ বছর, কুয়েত ৭৩ বছর এবং লিবিয়ায় ৭৫ বছর পর্যন্ত লোকেরা বেঁচে থাকে।

১৫. সর্বোচ্চ জিএনপি দেশসমূহ ঃ

ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্ক।

১৬. সর্বোচ্চ পি. সি. আই ঃ

কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতার।

১৭. দরিদ্রতম দেশসমূহ ঃ

সিয়েরা লিয়ন, গাম্বিয়া ও উগান্ডা।

১৮. ক্রয়ক্ষমতা সর্ব নিম্নপর্যায়ের দেশসমূহ ঃ

সুরিনাম, ইরাক ও তুরস্ক।

www.pathagar.com

১৯. মুদ্রাস্ফীতি সবচেয়ে কম ঃ

আজারবাইজান, সউদী আরব ও ওমান।

২০. মুসলিম দেশসমূহের আমদানীর পরিমাণ ঃ

১৯৯৯ সালে মুসলিম দেশসমূহের আমদানীর পরিমাণ ৪৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২১. রফতানীর পরিমাণ ঃ

১৯৯৯ সালে মুসলিম দেশসমূহের মোট রফতানীর পরিমাণ ৩৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২২. মুসলিম দেশসমূহের প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ ঃ

ক. দরিদ্রতা

খ. প্রশাসনিক দুর্নীতি অর্থাৎ সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুষ গ্রহণ করা

গ. গৃহযুদ্ধ এবং

ঘ. উদ্বাস্তু সমস্যা।

২৩. কম দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মকর্তা ঃ

যে সকল দেশের সরকারী কর্মকর্তারা কম দুর্নীতিপরায়ণ সেসব দেশের মধ্যে অন্যতম হলো—মালয়েশিয়া, তিউনিস ও জর্দান।

২৪. অধিক দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মকর্তা ঃ

নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের সরকারী কর্মকর্তারা তুলনামূলকভাবে বেশি দুর্নীতিপরায়ণ।

২৫. যেসব দেশে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বেশি ঃ

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—আফগানিস্তান, আলজেরিয়া ও সুদান।

মুসলিম দেশসমূহ বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূর করে পর্যায়ক্রমে উন্নত বিশ্বের কাতারে শামিল হোক এবং আগামী দিনের মুসলিম বিশ্ব একটি একক নেতৃত্বের অধীনে এসে আবার বিশ্বকে শাসন করুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সূত্র ঃ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড (সাপ্তাহিক), সউদী আরব, জুলাই, ২৭-২০০১।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন (১-২০ খণ্ড)**
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)**
  – আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র)
- **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)**
  – ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- **শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)**
  – ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)**
  – মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)**
  – মতিউর রহমান খান
- **ইসলামে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা**
  – ডঃ মোঃ আতাউর রহমান
- **গোঁড়ামী অসহনশীলতা ও ইসলাম**
  – অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ
- **জোসনা মাখা চাঁদ**
  – সাজ্জাদ হোসাইন খান
- **কালো পঁচিশের আগে ও পরে**
  – আবুল আসাদ
- **অভিশপ্ত ইহুদী জাতির বেঈমানীর ইতিহাস**
  – এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
- **ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য**
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **বক্তৃতামালা**
  – মতিউর রহমান নিজামী

www.pathagar.com